নীল ঘূর্ণি

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

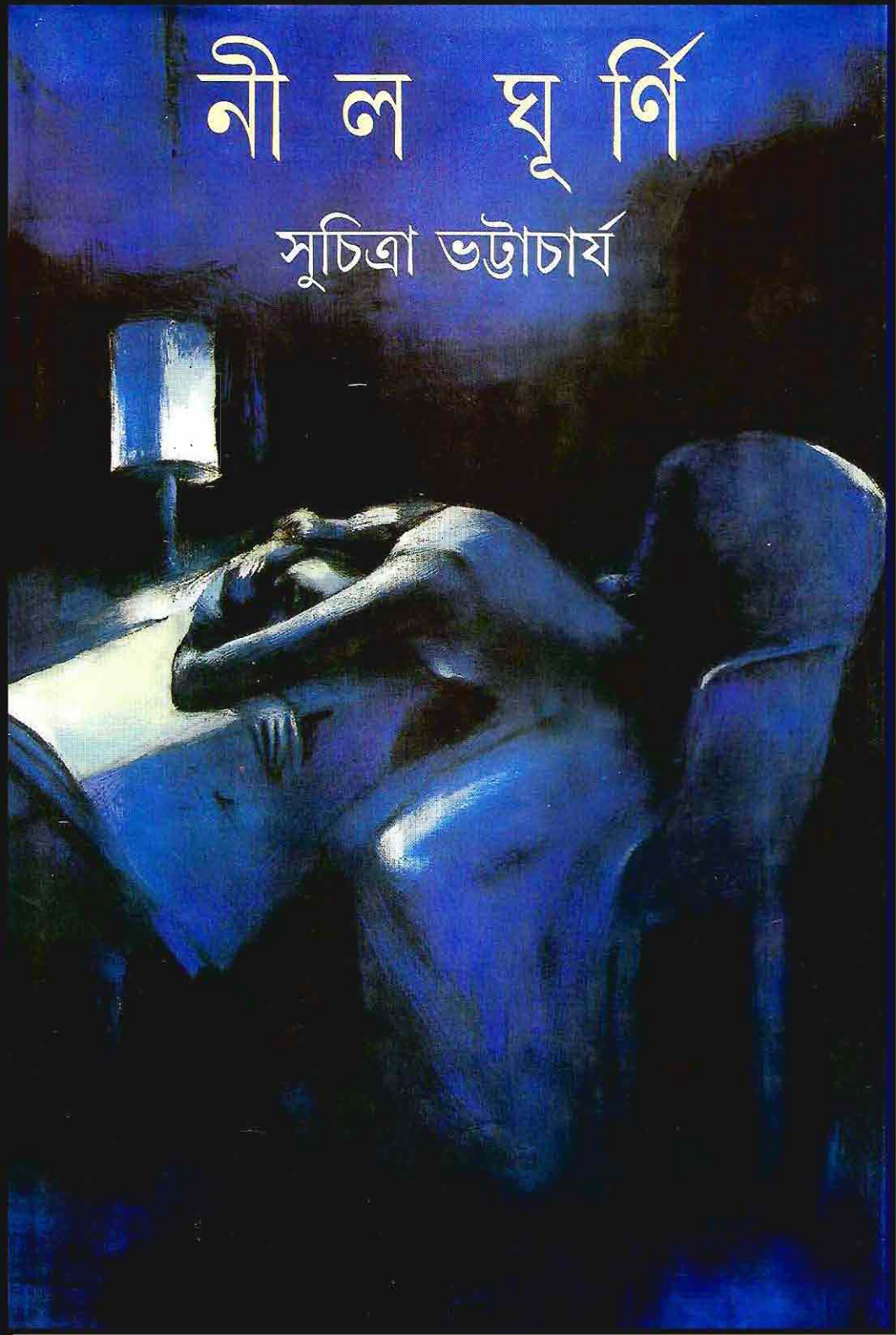

ঝকঝকে তরুণ সৌমিক বসুরায়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে দয়িতার। কিন্তু দয়িতা প্রেমে পড়েছে এক বিচিত্র মানুষের। তিনি তার শিক্ষক, বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী বোধিসত্ত্ব মজুমদার। দয়িতার এই প্রেম যেন এক দুরন্ত ঘূর্ণিঝড় যা বয়সের বাধানিষেধ মানে না, আত্মীয়-পরিজনের তোয়াক্কা করে না, সমাজ সংসারের নীতি-নিয়মকে কুটোর মতো ভাসিয়ে দেয়। মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য জানার গবেষণায় বিভোর প্রৌঢ় বোধিসত্ত্ব মজুমদারও শেষ পর্যন্ত উপেক্ষা করতে পারেন না দয়িতার অমোঘ আকর্ষণকে, স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করে দয়িতার সঙ্গে ঘর বাঁধেন তিনি।

দয়িতা-বোধিসত্ত্বর মিলিত জীবন কি সুখের হয়েছিল? প্রত্যাখ্যাত সৌমিক কি ভুলতে পেরেছিল দয়িতাকে? স্বামী পরিত্যক্তা রাখীর হৃদয়েই বা বোধিসত্ত্বর জন্য কতটুকু শ্রদ্ধা ভালবাসা অবশিষ্ট ছিল?

নীল ঘূর্ণি এক জটিল প্রেমের উপন্যাস। তবে এ নিছকই ত্রিভুজ প্রেমের উপাখ্যান নয়, নারী পুরুষের সম্পর্কের টানাপোড়েনের মাধ্যমে লেখিকা এখানে অন্বেষণ করেছেন অনন্য প্রতিভাধর মানুষের জীবনে নারীর অবস্থান কোথায়! সব মিলিয়ে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ঝরঝরে কলমে উন্মোচিত হয়েছে আধুনিক যুগের জীবন যন্ত্রণা।

নীল ঘূর্ণি এই সময়েরই এক ঘূর্ণাবর্ত, যা সমকালীন হয়েও চিরকালীন।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের জন্ম মামার বাড়ি ভাগলপুরে, ২৫ পৌষ ১৩৫৬।
পিত্রালয় : বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।
স্কুল ও কলেজ জীবন কেটেছে দক্ষিণ কলকাতায়। এখনও দক্ষিণ কলকাতারই বাসিন্দা। কলেজে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে বিবাহিত জীবনের শুরু, কলেজে পড়তে-পড়তেই চাকরি-জীবনে প্রবেশ। বহু ধরনের বিচিত্র চাকরির পর এখন সরকারি অফিসার।
প্রকাশিত উপন্যাস : 'আমি রাইকিশোরী', 'যখন যুদ্ধ', 'কাচের দেওয়াল', 'দহন', 'ভাঙনকাল', 'হেমন্তের পাখি'। গল্পগ্রন্থ : 'রূপকথার জন্ম', 'খাঁচা', 'ময়না তদন্ত', 'এই মায়া'।
ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি গভীর আকর্ষণ। অবশ্য লেখালেখি শুরু করেছেন সত্তর দশকের শেষ ভাগ থেকে।
মেয়েদের হয়ে মেয়েদের নিজস্ব জগতের কথা, তাদের নিজস্ব যন্ত্রণা, সমস্যা আর উপলব্ধির কথাই লিখতে আগ্রহী। লেখাতে বারবারই ঘুরে ফিরে আসে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক, নানান জটিলতা।

.....

প্রচ্ছদ সুব্রত চৌধুরী

নীল ঘূর্ণি

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

আনন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝড়ের গতিতে ডিনার সারছিল দয়িতা। খাওয়া নয়, গলাধঃকরণ। রুটি ছিঁড়ছে, মুখে তুলছে, জল খাচ্ছে ঢকঢক। বিষম লাগল হঠাৎ, সামলাতে গিয়ে বুক আবার ধড়াস। বোধিসত্ত্ব আজ তাড়াতাড়ি চলে যাবেন না তো?

ডাইনিং হল এখন টইটম্বুর। হোস্টেলে ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় দুশো। ইঞ্জিনিয়ারিং, রিসার্চ স্কলার, পিওর সায়েন্স সব মিলিয়ে-জুলিয়ে। তাদের অন্তত জনা সত্তর হলে মজুত এখন, নৈশ আহারের এটাই পিক টাইম। ডজন খানেক টেবিলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে মেয়েরা, গড়ে উঠেছে ছোট ছোট জোট। ইয়ার মাফিক। সাবজেক্ট মাফিক। কোথাও বা নিছক বন্ধুদের জটলা।

দয়িতার বাঁয়ে সুপর্ণা, ডাইনে মৈত্রেয়ী। ক্লাসমেট। এম.এসসি সেকেন্ড ইয়ার, ফিজিক্স। উলটো দিকে ঋতা, এক বছরের জুনিয়র।

সুপর্ণা ক্যান্টিন-ডিশের খোপ থেকে একটা ডিম তুলে নিয়ে লোফালুফি করছে,—এটা কিসের ডিম বল তো?

-গোলাপায়রা অফকোর্স। আমাদের কারনিসে যেগুলো দিনরাত বকম বকম করে। মৈত্রেয়ী হি হি হেসে উঠল।

ঋতা বিজ্ঞের মতো বলল,—পায়রার ডিম খুব টেস্টফুল হয় কিন্তু।

—তুই খেয়েছিস?

—আমি কেন খাব! বেড়ালগুলো খুব রেলিশ করে খায়, দেখেছি।

—পয়জনাস নয় তো? সুপর্ণার চোখে ছদ্ম ত্রাস,—খেলে পেট খারাপ হবে না?

—কাম অন্ সুপু, নাথিং উইল হ্যাপেন। বেড়ালগুলো তো দিব্যি হজম করছে।

—বেড়াল আর মানুষের মেটাবলিক সিস্টেম কি এক?

পাশের টেবিলে বসা দিল্লির মেয়ে অনুশা চেয়ার হেলিয়ে তাকাল,—ইয়ে আণ্ডা থোড়ি কববুকা হ্যায়। মাস্ট বি অফ ছিপকলি, আই বেট।

ব্যস, বিচিত্র সব গবেষণা শুরু হয়ে গেল। রাতের মেনু আজ অতি যাচ্ছেতাই। ওই ছুন্নি গুলি সাইজের ডিমের কারি, যার মশলা এক দিকে, ঝোলের নদী এক দিকে। সঙ্গে ঘাঁটা ঘাঁটা সবজি, সম্ভবত তাতে ফুলকপি আলু আছে। আর এক অজ্ঞাত বস্তুর চাটনি। বস্তুটা তেঁতুলও হতে পারে, আমসত্ত্ব হওয়াও অসম্ভব নয়। সব কটা পদই সমান বিস্বাদ। এই ক্যাম্পাস টাউনশিপের প্রতিটি পাচকই খারাপ রান্নায় ডক্টরেট। তবে মেয়েদের এ সব মোটামুটি জিভে সয়ে গেছে। গুলতানি করতে করতে খেয়ে যায়, কী খায় খেয়াল থাকে না। ডিম নিয়ে গবেষণাও এই ভুলে থাকার এক অঙ্গ।

গোটা হলেই জোর গজল্লা চলছে। কোনও টেবিলে ডিম-মেটাবলিজম-রিলেটিভিটি, কোথাও বা ঐশ্বরিয়া রাই, ক্লিন্টন, মনিকা লিউইনস্কি। কোথাও বা শচীন আজহার সৌরভ, কোথাও সলমন আমির শাহরুখ। এই টেবিলে ঝরনার কলকল, তো ওই টেবিলে ভাঙা রেকর্ডের ঝনঝন। শব্দ বাজছে, বেজেই চলেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দয়িতা এসব কিছুই শুনছিল না। সে এখন এক প্রায়-বধির নারী, যার আনমনা চোখ ঘুরছে ঘরে, কিন্তু দেখছে না কিছুই। হৃৎপিণ্ডে তার এখন এক অবিরাম লাবডুব। হে ঈশ্বর, যেন দেখা পাই, যেন দেখা পাই।

কোনওক্রমে খাওয়া সেরে চেয়ার ছাড়ল দয়িতা। টেবিল-কেতা মেনে সঙ্গীদের উদ্দেশে ঠোঁট নাড়ল,—এক্সকিউজ মি...বাই...

সুপর্ণা টেরিয়ে তাকাল, —ওমা, তুই ছিলি নাকি এতক্ষণ?

মৈত্রেয়ীর মুখে বজ্জাতি হাসি, স্বর নিরীহ, —তোর টাইম হয়ে গেছে, না রে?

দয়িতা কথা বাড়াল না, চোয়াল ফাঁক করল সামান্য। থালা হাতে এগোল সিঙ্কের দিকে। এখানে নিজের থালা নিজেকে তুলতে হয়। নিয়ম।

ডাইনিং হল থেকে দয়িতার ঘর বেশ খানিকটা পথ, হোস্টেলের একেবারে অন্য প্রান্তের দোতলায়। দু শয্যার কামরা। পরিমিত আসবাব। মাথা-পিছু একটা করে খাট চেয়ার টেবিল। লোহার। এর বাইরে কিছু লাগলে নিজেরাই ব্যবস্থা করে মেয়েরা। দয়িতার একটা বেঁটে মতন ওয়ার্ড্রোব আছে, রুমমেট চিরশ্রী সে ব্যাপারেও বিনদাস। দেয়ালে সে কটা অস্থায়ী হুক লাগিয়ে নিয়েছে, ছাড়া পোশাক সেখানেই অবলীলায় ঝুলিয়ে রাখে। ঘরে দুটো আয়নাও আছে, যার যার নিজস্ব। মেয়েরা অন্য মেয়ের আয়নায় নিজের মুখ দেখা পছন্দ করে না।

চিরশ্রী এখনও বিছানায় উপুড়, থ্রিলার গিলছে। মেয়েটা রীতিমতো গ্রন্থকীট। সারাক্ষণ তার হাতে হয় শিফ-কিটেল-ফেইনম্যান, নয় লুডলাম-জন লেকার-ফ্রেডরিক ফরসাইথ। ডাইনিং হল, কমনরুম, ক্যান্টিন, কোথথাও কেউ কখনও তাকে বই ছাড়া দেখেনি। দয়িতাদের ক্লাসে সেই ফার্স্ট গার্ল।

ঘরে ঢুকেই দয়িতা সোজা আয়নার সামনে। খচাখচ চিরুনি চালাচ্ছে কাঁধছোঁয়া স্টেপকাট চুলে, মুখে ক্রিম থুপল, গালে নড়াচড়া করছে অস্থির আঙুল। সময় নেই, সময় নেই...

আয়না দিয়েই চিরশ্রীকে দেখতে দেখতে বলল, খেতে গেলি না?

চিরশ্রী বই থেকে মুখ তুলল না। ছোট দুটো শব্দ এল,—উঁ? হুঁ।

—যা, যা, এর পর আর কিচ্ছু জুটবে না।

—হুম।

—আমি একটু আসছি। তুই থাকবি তো রুমে?

চিরশ্রী পড়াং করে ঘাড় ঘোরাল। ভুরুতে ভাঁজ,—আজও চললি?

দয়িতা ফিক করে হাসল,—আজ দেরি করব না, দেখিস।

চিরশ্রীর গোলগাল চশমা পরা মুখে একটা জন্মগত দিদি দিদি ভাব আছে। বই উলটে রেখে ভাবটাকে মুখে প্রকট করল চিরশ্রী। গিরজার পাদরির স্বরে বলল, —ইউ আর গোয়িং টুউ ফার, দয়ি।

—কদ্দুর আর গেছি! টুক করে ঠোঁটে ন্যাচারাল শাইন লিপস্টিক বুলিয়ে নিল দয়িতা, —মাত্র তো লাইব্রেরি থেকে মেন গেট। বড় জোর গেট থেকে বাড়ি।

—তাই বা যাবি কেন?

—ভাল লাগে, তাই। ইচ্ছে করে, তাই।

—ইচ্ছেটাকে রেজিস্ট কর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—পারি না রে।

—যত সব নেকু নেকু কথা! চিরশ্রী বাবু হয়ে বসল, —জানিস, তোকে নিয়ে সবাই হাসাহাসি করে?

—আই কেয়ার এ ফিগ। আমি কি বি-এম-এর সঙ্গে প্রেম করছি নাকি? আই ডু অ্যাডমায়ার হিম। ওঁর সঙ্গে আমার কথা বলতে ভাল লাগে। ঝটপট ওয়ার্ড্রোব খুলল, বন্ধ করল দয়িতা। দুধ-সাদা স্বচ্ছ ওড়না বিছিয়ে দিল দু কাঁধে। লঘু স্বরে বলল,—আর যদি কারুর মনে মনে ইচ্ছে থাকে, সেও যেতে পারে। আমি জানি, অনেকেই বি-এম-এর জন্য ফিদা। আমাদের ক্লাসেরই। পরপর নাম করে যাব?

—হতে পারে। তবে তোর মতো খুকিপনা কেউ করবে না। চিরশ্রী অভিভাবকের মতো গম্ভীর,—দ্যাখ দয়ি, মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়েছে, এই বয়সে আর আইডল ওয়রশিপ মানায় না। এগুলো হল টিনএজ সিন্ড্রোম।

দয়িতা আর তর্কে গেল না। পরনের মেরুন কামিজ ঝটপট ঝাড়ল আলগা হাতে, টেবিল থেকে ছোঁ মেরে একটা বই তুলে নিল, আরেক বার ঘাড় এলিয়ে ঘাড় সোজা করে দেখে নিল নিজের পানপাতা মুখ। এক লহমায়। আলোর গতিতে। ভেজানো দরজা হাট করে বেরতে বেরতে কথা ছুড়ল,—আমি কিন্তু রুম-কি নিয়ে বেরোলাম না।

হরিণ-পায়ে হাঁটছে দয়িতা। সুছন্দ গতিতে পার হয়ে গেল থার্ড ইয়ার কেমিক্যালের তিন তর্করত যুবতীকে, করিডোরে সুতনুকা আর রাগিণী মৌজ করে সিগারেট খাচ্ছে, জোরে জোরে নিঃশ্বাস টেনে পোড়া তামাকের পুরুষগন্ধটা বুকে ভরে নিল। কমন রুম থেকে ভেসে আসা চাকভাঙা মৌমাছির ধ্বনি ক্ষীণ ক্রমশ, দয়িতা এখন খোলা আকাশের নীচে।

গেটের সামনে চওড়া পিচরাস্তা। আইনস্টাইন সরণি। রাস্তাটা ভারী সুন্দর। দু ধারের বৃক্ষরাজি চাঁদোয়ার মতো ঢেকে রেখেছে পথ, ফাঁক দিয়ে আকাশ এখানে দেখা যায় কি যায় না। এ রাস্তা শুরু হয়েছে ইউনিভার্সিটির মেন গেট থেকে, এ পথেই সার সার ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেল। মেয়েদের হোস্টেল সবার আগে, মেন গেট থেকে বড় জোর শ'-তিনেক গজ দূর।

সবে নভেম্বর পড়েছে। এর মধ্যেই এ দিকে বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। দয়িতার মুহূর্তের জন্য মনে হল একটা চাদর নিয়ে নিল ভাল হত। পথ প্রায় নির্জন, বোধ হয় ঠাণ্ডার জন্যই। একটা-দুটো সাইকেল হঠাৎ হঠাৎ হুসহাস চলে যাচ্ছে পাশ দিয়ে, হোস্টেলের ছেলেরা চলেছে এ দিক সে দিক। অনেকটা দূরে দূরে পথবাতি জ্বলছে। নিওনের দ্যুতিতে আলোছায়ার মতো। কুয়াশা নামছিল।

মেন গেটের মুখে এসে দয়িতা ক্ষণিক দাঁড়াল। রোজই দাঁড়ায়। মুখে যাই বলুক, প্রতি দিন ঠিক এই সময়ে কোথথেকে এক দ্বিধা এসে আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে ধরে তাকে, ভারী হয়ে যায় পা। তার এই হ্যাংলার মতো ছুটে যাওয়া দেখে বোধিসত্ত্ব কিছু মনে করেন না তো? দ্যুৎ, লাইব্রেরিতে তো দয়িতা যেতেই পারে, যে কোনও সময়ে। বোধিসত্ত্ব তার শিক্ষক, তাঁর সঙ্গে দুটো কথা বলতে বলতে ফিরতেই পারে দয়িতা, এর মধ্যে এত কিন্তু কিসের? আর বোধিসত্ত্ব মজুমদারের মতো একজন বিশ্ববিশ্রুত অধ্যাপকের দয়িতাকে নিয়ে ভাবতে ভারী বয়েই গেছে। লতাকে নিয়ে মহীরুহ মাথা ঘামায় না। অস্তিত্বই কি টের পায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্চর্য মানুষের মন! স্বপক্ষে সাজানো একের পর এক যুক্তি যতই অকাট্য হয়ে উঠতে থাকে, ততই এক গোপন কষ্টে ছেয়ে যায় বুক। ওই কষ্টটাই তাড়িয়ে নিয়ে চলে দয়িতাকে, মেন গেট পেরিয়ে বৃত্তাকার লন, তা পেরিয়ে ক্যান্টিন, তারপর লাইব্রেরি, নিশিতে পাওয়া মানবীর মতো দয়িতা ঢুকে পড়ে বিশাল রিডিংরুমে, অজস্র চোখ উপেক্ষা করে ম্যাজেনাইন ফ্লোরে উঠে যায়। সেখানে সার সার কিউবিকল। কাচঘেরা। বাঁ দিকের একদম শেষের খোপটি প্রফেসর বোধিসত্ত্ব মজুমদারের জন্য চিহ্নিত। মহাজগতের জন্মরহস্য নিয়ে জটিল এক অঙ্কের সমুদ্রে ডুবে থাকেন বোধিসত্ত্ব, ওই ছোট্ট ছয় বাই ছয় খোপটায়। সামনে বইয়ের স্তূপ, কাগজের পাহাড়, ইন্টারনেটে সংযুক্ত কম্পিউটার, আর মাথার পিছনে এক জোরালো আলো। দয়িতা কাচের এপারে দাঁড়ায়, মুগ্ধ চোখে একটুক্ষণ দেখে ধ্যানমগ্ন তপস্বীকে। আলোটাকে মনে হয় দিব্যজ্যোতি, বোধিসত্ত্বর শরীর থেকেই যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তার পর ধীর পায়ে নেমে আসে হলে, শুরু হয় প্রতীক্ষা...

আজ দয়িতার কপাল ভাল। লন পেরিয়ে ক্যান্টিনের দিকে যেতেই অদূরে বোধিসত্ত্ব।

দয়িতা স্থাণু। ভাগ্যিস চিরশ্রীর সঙ্গে তর্ক বাড়ায়নি। আর দু মিনিট হলেই...।

বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে আসছেন বোধিসত্ত্ব মজুমদার। দীর্ঘ ঋজু কাঠামো, গড়ন খানিকটা রোগার দিকেই, মাজা গায়ের রং, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। ছাপ্পান্ন বছর বয়স। দেখে অবশ্য একটু বেশিই মনে হয়। চুলের জন্য। বোধিসত্ত্বর একমাথা চুল, একদম ধবধবে সাদা। মুখে তেমন লালিত্য নেই, বরং বেশ রুক্ষই। কাটা কাটা। শুধু চোখ দুটি ভারী উজ্জ্বল। কুচকুচে কালো চোখের মণি মোটা লেন্সের আড়ালেও অদ্ভুত দীপ্তিময়।

সামনে এসে গেছে বোধিসত্ত্ব। দয়িতার পাঁজরের নীচে গমকল চালু হয়ে গেল। তালু হঠাৎ শুকিয়ে কাঠ. নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

রাস্তা ছেড়ে একটু সরে দাঁড়াল দয়িতা। অস্ফুটে বলল,—ফিরছেন স্যার?

ক্যান্টিনের বাইরের আলোটা জ্বলছে না, অন্ধকার সামান্য ঘন হয়ে আছে জায়গাটায়। বোধিসত্ত্ব থেমে চোখ কুঁচকোলেন,—ও তুমি... এখন লাইব্রেরি যাচ্ছ?

—হ্যাঁ...মানে...না। লাইব্রেরি থেকেই ফিরছিলাম স্যার, আপনাকে দেখে...আপনি স্যার আজ একটু তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন না?

—আর বোলো না। কী যেন একটা অকেশান আছে বাড়িতে। তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছে। বোধিসত্ত্বর কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল,—বাই দ্য বাই, ঠিক কটা বাজে বলু তো?

—আটটা দশ। কবজি চোখের একদম কাছে নিয়ে এল দয়িতা, —না না, আটটা বারো।

—তা হলে খুব বেশি দেরি হয়নি, কি বলো? হা হা। আপন মনে হাসলেন বোধিসত্ত্ব। হাতে হাত ঘষছেন। চকোলেট রঙের হাফস্লিভ সোয়েটার পরে আছেন, শার্টও হাফহাতা, সম্ভবত ঠাণ্ডা লাগছে। বুকপকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরালেন। দেশলাই কাঠি ফেলতে গিয়ে চোখ দয়িতার ডান হাতে, —ওটা কী বই?

দয়িতা ফাঁপরে পড়ল। ইশ, টেবিল থেকে তোলার সময়ে মলাটের রং পর্যন্ত দেখা হয়নি। বই ছাড়া হাতটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে, তাই না...

চোখ বুজে বলে দিল, —অ্যাটমিক স্পেকট্রার বই স্যার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কার?

—লাইব্রেরির।

—সে তো বুঝেছি। অথর কে?

সর্বনাশ, কোনও নাম মনে আসছে না। দয়িতা ঢোঁক গিলল,—দেখিনি স্যার নামটা। এমনিই উলটোচ্ছিলাম, মনে হল ইস্যু করে নিয়ে যাই...

—ইস্যু কাউন্টার তো ছটায় বন্ধ হয়ে গেছে। বোধিসত্ত্ব হাঁটা শুরু করল, —তুমি তা হলে অনেকক্ষণ এসেছ?

দয়িতা ঢক করে ঘাড় নেড়ে দিল।

—তোমাদের ডিনার টাইম হয়ে গেছে না? না খেয়ে লাইব্রেরিতে বসে ছিলে?

এই সব অতি তুচ্ছ জিজ্ঞাসাও বোধিসত্ত্ব মজুমদারের মাথায় আসে! মুগ্ধ দয়িতা তড়িঘড়ি মিথ্যে বলে দিল,—বিকেলে এক বন্ধু খুব খাইয়েছে। খিদে হয়নি।

—ও।

প্রশ্ন শেষ। চুপচাপ হাঁটছেন বোধিসত্ত্ব, নিঃশব্দে ছড়িয়ে দিচ্ছেন সিগারেটের ধোঁয়া। তামাক পোড়ার প্রিয় গন্ধটা নিঃশ্বাসে মিশিয়ে নিচ্ছিল দয়িতা। বোধিসত্ত্বর ওই লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটা, বচ্চন-ভয়েস, হঠাৎ হঠাৎ দমকা হাসি, হঠাৎ হঠাৎ আত্মমগ্ন হয়ে যাওয়া—সবই দয়িতার কেন যে এত ভাল লাগে। এমনকি ওই সিগারেট টানার উদাস ভঙ্গিটাও।

অধ্যাপকদের বাংলো আইনস্টাইন সরণির দিকে নয়। মেন গেটের সামনে দিয়ে একটা আড়াআড়ি রাস্তা ক্যাম্পাস পেরিয়ে চলে গেছে শহরের অভিমুখে, ওই পথে আধ কিলোমিটারটাক এগোলে পর পর শিক্ষকদের বাসস্থান। প্রথমে লেকচারারদের ফ্ল্যাট, তার পরে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসারদের কটেজ, তারও পরে প্রফেসরদের বাংলো। প্রফেসরদের প্রায় সকলেরই নিজস্ব বাহন আছে, দূরত্বের জন্য কারুর তেমন অসুবিধে হয় না। বোধিসত্ত্বই শুধু হেঁটে যাতায়াত করেন, গাড়ি থাকা সত্ত্বেও।

মেন গেট পেরিয়ে ডান দিকে ঘুরল বোধিসত্ত্ব,—ঠিক আছে দয়িতা, তা হলে চলি?

দয়িতার মন আনচান করে উঠল। এত তাড়াতাড়ি সঙ্গচ্যুত হবে সে! হোস্টেল যে ভারী বিবর্ণ লাগবে এখন। বেশিরভাগ দিন এখান থেকেই বিদায় নিতে হয় তাকে, বোধিসত্ত্বর বাড়ি পর্যন্ত গেছে সে কালেভদ্রে। আজও তো বাড়ি পর্যন্ত যেতে পারে, এখনও তেমন কিছু রাত হয়নি। অন্য দিন বোধিসত্ত্ব ওঠেনই নটার পর।

দয়িতা মরিয়া স্বরে বলল,—কাল স্যার আপনি ডিসকাশানটা কিন্তু শেষ করেননি।

—কী ব্যাপারে বলো তো?

—ওই যে স্যার আপনি বলছিলেন এই সৌরজগৎ ক্রমশ এক গ্রেটার ডিসঅর্ডারের দিকে এগোচ্ছে...এনট্রপি বাড়ছে, ইউনিভার্সটা ক্রমশ এক্সপ্যান্ড করছে...

—ও হ্যাঁ। বোধিসত্ত্বকে মুহূর্তের জন্য চিন্তিত দেখাল,—কিন্তু ও নিয়ে কথা বলতে গেলে অনেকটা টাইম লেগে যাবে। তোমার দেরি হবে, আমারও তাড়া আছে...

—চলুন না স্যার, হাঁটতে হাঁটতেই শুনি।

—যাবে এখন ও দিকে? একা একা অনেকটা পথ ফিরতে হবে কিন্তু।

—ক্যাম্পাসের মধ্যে তো স্যার, অসুবিধের কী আছে? আমরা তো কত দিন রাত বারোটা একটার সময়েও হাঁটতে বেরই।

—তাই বুঝি? হা হা হা...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদাত্ত হাসিতে অঘ্রানের রাত দুলে দুলে উঠছে। একটু দূরের ছায়া ছায়া কুয়াশা সহসা যেন ফিকে হয়ে গেল। চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে লাইব্রেরি থেকে কথা বলতে বলতে ফিরছে, গতি মন্থর করে ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে এ দিকে। বোধিসত্ত্বকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলেই চেনে, ছাত্রছাত্রীদের মুখে সম্ভ্রম আর বিস্ময়।

এক ঝলক ছেলেমেয়েগুলোকে দেখে নিয়েই দয়িতা মুখ ঘুরিয়ে নিল। দেখুক, দেখুক যত খুশি।

বোধিসত্ত্ব স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে পা ফেলছেন। দ্রুতগতিতে। তাল মিলিয়ে চলতে অসুবিধে হচ্ছিল দয়িতার। প্রায় ছুটতে হচ্ছে তাকে, হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প।

বোধিসত্ত্বর খেয়ালই নেই। যেতে যেতে বললেন,—হ্যাঁ, কাল যেন কোথায় শেষ করেছিলাম?

—জগৎসৃষ্টিতে বিশৃঙ্খলার ভূমিকা। আবার সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যেও কীভাবে নিয়ম লুকিয়ে থাকে...

—হ্যাঁ, কারেক্ট, কারেক্ট। বোধিসত্ত্ব মাথা ঝাঁকাল। ওপরে মেঘহীন আকাশ, তারায় তারায় খচিত, সে দিকে একবার চোখ তুলে দেখে নিল। তারপর হঠাৎই বলল,—তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো?

—ঈশ্বর! প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারল না দয়িতা।

—হ্যাঁ, ঈশ্বর। ভগবান। আল্লাহ। গড। জিহোভা। যাকে আমরা ইমাজিন করি অ্যাজ ক্রিয়েটার অব দিস ইউনিভার্স। উপনিষদের ভাষায় যাকে বলে ব্রহ্ম।...বাই দ্য বাই, তুমি উপনিষদ পড়েছ?

—না স্যার।

—মানে তুমি ঈশ্বর বিশ্বাসী নও?

কী বললে বোধিসত্ত্ব মজুমদার খুশি হবে বুঝতে পারছিল না দয়িতা। এ সব প্রশ্নের মাথামুণ্ডুই বা কী?

আমতা আমতা করে বলল,—তা ঠিক নয় স্যার। বিশ্বাস করি...

—আমি পরীক্ষার আগে থানে পয়সা ছোড়ায় বিশ্বাসের কথা বলছি না। বোধিসত্ত্বর গলা দুন্দুভির মতো বেজে উঠল,—আর ইউ আ বিলিভার? তোমার কি মনে হয় সমস্ত সৃষ্টির পেছনে এক আদিম মহাশক্তি কাজ করছে? এজলেস, টাইমলেস, লিমিটলেস এক এনার্জি? কোনও একটা পয়েন্ট থেকে সে একটা সুইচ অন করে ফেলেছে, অ্যান্ড আফটার দ্যাট এভরিথিং ইজ গোয়িং অন অ্যান্ড অন অ্যান্ড অন...?

শব্দগুলো দয়িতার কানে অনুরণিত হচ্ছিল। আবিষ্টের মতো বলল,—হ্যাঁ, মাঝে মাঝে এরকমটা মনে হয় বটে।

—হয়? বোধিসত্ত্ব শিশুর মতো খুশি,—মনে হয় তোমার? হয়? বাহ বাহ। তুমি তা হলে ব্যাপারটা ফিল করতে পারবে।

বলেই সহসা চুপ। যেন নীরবতা দিয়েই অনুভব করাতে চাইছেন কিছু। উদ্দাম গতিতে একসঙ্গে দশ-বারোটা সাইকেল চলে গেল পাশ দিয়ে। উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছে আরোহীরা। পরের সিমেস্টারের মাস দেড়েক বাকি আছে, ইউনিভার্সিটির ছেলেরা এখন কিছুটা ঝাড়া হাত-পা, সিনেমা রেস্টুরেন্টে বিনোদন খুঁজতে খুঁজতে ছুটছে শহরে। তাদের তুরীয়ান কনভয়টা নৈঃশব্দের সুর কেটে দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধিসত্ত্ব যেন ঈষৎ বিরক্ত। আবার সিগারেট ধরিয়েছেন।

দয়িতা মৃদু স্বরে বলল,—তারপর স্যার?

—হ্যাঁ, যা বলছিলাম। বিলীয়মান ছাত্রদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন বোধিসত্ত্ব,—তুমি রিলিজিয়াস গডকে ভেবো না, ক্রিয়েটার গডকে ভাবো। সৃষ্টির নিয়মটা কী অদ্ভুত! সূর্য যদি একটু দূরে থাকে, পৃথিবী বরফ হয়ে যাবে। একটু সামনে থাকলে দাউ দাউ জ্বলে যাবে। অর্থাৎ সূর্য ইজ প্লেসড ইন আ প্রপার পজিশন। সেই সূর্যের আবার ক্ষয় হচ্ছে, কিন্তু ক্ষয়ের রেটটা এমনই মাপা যে পৃথিবী-টৃথিবি মিলিয়ে গ্রহদের এই পরিবারটা মোটামুটি ঠিকই আছে। এই ব্যালান্সটা যে করেছে সে কি একজন ম্যাজিশিয়ান নয়? আর আমার প্রশ্ন ঠিক ওইখানেই। জাদুকর এমনভাবে গড়ল কেন? অন্য আর কী কী ভাবে সে এই জগৎটা তৈরি করতে পারত? আদৌ কি অন্য কোনওভাবে গড়া যেত? আকাশপানে তর্জনী তুললেন বোধিসত্ত্ব,—উঁহু, পারত না। এই মহাজগতে কোনও চান্স ফ্যাক্টর নেই। যা ঘটেছে সবই অবভিয়াস। ঈশ্বর বা ওই ম্যাজিশিয়ানটা একটা হাত-পা বাঁধা পুতুল মাত্র। গোটা সৃষ্টি এমন এক অঙ্ক, যার একটাই মাত্র সলিউশন ছিল...

কথাগুলো দয়িতার পুরোপুরি বোধগম্য হচ্ছিল না। সে রিলেটিভিটির তত্ত্ব পড়েছে, মহাশূন্যে দূরত্ব আর সময়ের হ্রাস-বৃদ্ধির কথাও তার অজানা নয়, সৃষ্টিরহস্যের সঙ্গে কাল আর মহাশূন্য যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, এও তার জ্ঞানের পরিধির মধ্যে পড়ে, কিন্তু স্যার যেন তার থেকেও দুরূহ কিছু বোঝাতে চান। তবে মাথায় ঢুকুক আর নাই ঢুকুক, মোহাবিষ্টের মতো শুনছিল দয়িতা। হঠাৎই আবিষ্কার করল বোধিসত্ত্বর বাংলো এসে গেছে।

এত তাড়াতাড়ি পথ ফুরিয়ে গেল!

বোধিসত্ত্বর বাংলোর সামনে অনেকটা বাগান। ঢোকার মুখে লোহার গেট। মহাজাগতিক ঘোর নিয়েই গেটের দিকে এগোলেন বোধিসত্ত্ব, ঘোরের মধ্যেই হাত রেখেছেন গেটে।

দয়িতা দাঁড়িয়ে পড়ল,—এবার আমি যাই স্যার?

—যাবে?...ও। এসো। গেটের আংটা খুলে কয়েক পা এগিয়েও বোধিসত্ত্ব ঘুরে এলেন। হালকাভাবে বললেন,—তোমাদের মেয়েদের কি ঠাণ্ডা লাগে না?

—কেন স্যার?

—সন্ধেবেলা বেরলে গায়ে একটা গরম কিছু দিও। এ সময়ে ঠাণ্ডা লেগে গেলে অসুখে পড়ে যাবে।

নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না দয়িতার। যে মানুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে অঙ্ক কষতে ভালবাসে, তার চোখে এই সামান্য কিছুও ধরা পড়ে?

বোধিসত্ত্ব আবার বলল,—সাবধানে যেও। রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গেছে।

দয়িতা তবু দাঁড়িয়ে রইল দু-চার সেকেন্ড। সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠে গেলেন বোধিসত্ত্ব, এবার পায়ে পায়ে ফিরছে দয়িতা। শরীর জুড়ে এক অদ্ভুত শিহরণ, রোমে রোমে হর্ষ জাগছে। বোধিসত্ত্ব কোনও দিন তার সঙ্গে এত কথা বলেননি।

হোস্টেলে ফিরেই আচ্ছন্ন ভাব কেটে গেল। করিডরে ঋতা। তাকে দেখে ঋতা ত্বরিত পায়ে এগিয়ে এল,—কোথায় কোথায় চরে বেড়াচ্ছিস, অ্যাঁ! তোর একটা ফোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছিল।

দয়িতা অবাক গলায় বলল,—আমার?

—হ্যাঁ, কলকাতা থেকে। রঘুদা ধরেছিল। খুঁজছিল তোকে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফেরা হল না দয়িতার। পা চালিয়ে ওয়ার্ডেন অফিসে এল। রঘুনাথ দত্ত এই অফিসের ক্লার্ক, আসে সন্ধেয়, থাকে নটা সাড়ে ন'টা অবধি। অজস্র টুকটাক কাজ থাকে হোস্টেলের, সারে সেগুলো। আজ খটাখট টাইপ করছে। সম্ভবত কারও কোনও রিসার্চ পেপার। এই কাজে রঘু দত্তর কিছু উপরি ইনকাম হয়।

দয়িতাকে দেখেই রঘু বলল,—তোমার বাবা এক্ষুনি তোমাকে একবার ফোন করতে বলেছেন।

তুৎ, কোনও মানে হয়? নির্ঘাত নাইরোবি থেকে কাকা এসে গেছে, শনিবার বাড়ি যেতে বলবে বাবা। কত কী করবে ভেবেছিল এই শনি-রোববারে, সব এখন মাথায় উঠল।

বেজার মুখে খাতায় ফোন নাম্বারটা এন্ট্রি করে ডায়াল ঘোরাল দয়িতা। বাবা নয়, মা ফোন ধরেছে। উচ্ছ্বাসভরা গলা, কলকল করছে।

দয়িতাও হেসে কথা শুরু করল। রিসিভার যখন রাখল, মুখ ছাই-এর মতো সাদা।

কাকা আসেনি। বিয়ে ঠিক হয়েছে দয়িতার। দামী লোভনীয় সুপাত্র।

দুই

ডোরবেলের আওয়াজে পলকের জন্য চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল রাখীর। পলকে ভুল ভাঙল। শব্দটা পরিচিত বটে, কিন্তু সে নয়। বাবুয়া কক্ষনও এক বারের বেশি বেল বাজায় না। সেই ধ্বনির রেশও অনেকক্ষণ লেগে থাকে বাতাসে। এ ঘণ্টি গৃহস্বামীর।

ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে রাখী বারান্দার আলো জ্বালল। দরজা খুলল অভ্যস্ত নিয়মে। বোধিসত্ত্ব ঢুকে যাওয়ার পরও একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল দরজায়। তারপর ছিটকিনি তুলে ফিরেছে ঘরে। মন্থর পায়ে।

বোধিসত্ত্ব সোজা স্টাডিরুমে গেছে। বইপত্র টেবিলে রেখে বাইরে এল। সোয়েটার খুলতে খুলতে বলল,—আজ কিন্তু আমি দেরি করিনি। তোমার কথা মতো তাড়াতাড়ি ফিরেছি।

রাখী সোয়েটারটা হাতে নিল। আনমনে বলল,—হুঁ।

—কিন্তু অকেশানটা কী আজ?

স্বামীর চোখের দিকে তাকাল রাখী,—তোমার মনে নেই?

—কী বলো তো?

—আজ কত তারিখ?

—আজ? আজ সিক্সথ নভেম্বর! বলেই ভুরু কোঁচকাল বোধিসত্ত্ব। পরক্ষণে ঠোঁটের কোণে একচিলতে হাসি,—ও, আজ তো বাবুয়ার জন্মদিন! তাই তো, তাই তো...কই, বাবুয়া কোথায়? এসেছে?

—না। রাখী দু দিকে মাথা নাড়ল,—কাল অত করে ফোনে বলে দিলাম এক বার আসতে...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—দ্যাখো হয়তো কোনও কাজে আটকা পড়েছে। মিড উইক, ক্লাসটাস থাকে...কিংবা হয়তো দ্যাখো ওখানেই বন্ধুবান্ধব নিয়ে বার্থডে পার্টি করছে।

বন্ধুবান্ধব নিয়ে হইহই করবে বাবুয়া? অসম্ভব। বাবুয়া অমন ধারার হলে রাখীর কি ভাবনা ছিল? ছেলেকে হাতের তালুর মতো চেনে রাখী। ছেলে তার ঘোরতর অমিশুক, ঘরকুনো। সেই ছোট্টটি থেকেই। হয় বইয়ে মুখ গুঁজে আছে, নয় ঘরেই খুটুর খাটুর করছে, বড় জোর বাগানে গাছপালা নাড়াচাড়া। তাও এখানে স্কুলে পড়ার সময়ে এক-আধটা সঙ্গীসাথী ছিল। এই ক্যাম্পাসের প্রফেসার লেকচারারদের ছেলে নয়, টাউনের। ছোটকু, পার্থ আরও যেন কী সব নাম। কালেভদ্রে তারা আসতও বাড়িতে। মাধ্যমিকের পর তারাও যেন ক্রমশ উবে গেল। আশা ছিল, কলকাতায় পড়তে গিয়ে হয়তো বা বদলাবে ছেলে। হা হতোস্মি! আরও গুটিয়ে গেল বাবুয়া, আরও। শ্বশুর শাশুড়ির অনবরত এক অভিযোগ, ছেলেকে কী মানুষ করেছ বড় বউমা, দিনান্তে বুড়োবুড়ির সঙ্গে যেচে দুটো কথা বলতেও ছেলের প্রাণ চায় না! শান্ত আর দীপালি তো শুধুই হাত উলটোয়। স্ট্রেঞ্জ ক্রিচার! স্ট্রেঞ্জ ক্রিচার! অ্যাদ্দিন কলকাতায় রইল, রোজ সেম রুটিন! বাড়ি আর কলেজ, কলেজ আর বাড়ি। নো সিনেমা, নো কফি হাউস, নো এন্টারটেনমেন্ট, কী করে এই বয়সের একটা ছেলে সারভাইভ করে আছে বউদি! আর জুলি-মিলি তো হেসেই সারা। দাদাভাই সারাক্ষণ অমন ঘুম ঘুম গলায় কথা বলে কেন গো জেম্মা! সাতবার ডাকলে একবার সাড়া পাওয়া যায়...!

সে কিনা আজ পার্টি দিচ্ছে। কী আকাশকুসুম কল্পনা!

কলকাতায় কি একটাও বন্ধু হয়েছে বাবুয়ার?

রাখীর বুকটা চিনচিন করে উঠল। বোধিসত্ত্ব কত কম চেনে ছেলেকে! হয়তো এটাই স্বাভাবিক। যে মানুষ লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ দূরের গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান গণনায় মগ্ন, দু বিঘৎ দূরের প্রাণীকে কি চোখে পড়ে তার?

রাখী আর মুখ ফুটে কিছু বলল না। বেডরুম থেকে ধোপদুরস্ত পাজামা পাঞ্জাবি এনে রাখল বাথরুমে। সেখান থেকেই গলা ওঠাল,—গিজার কি অন্ করে দেব?

বোধিসত্ত্ব সোফায়, চিঠিপত্র ঘাঁটতে বসে গেছে। তার বেশিরভাগ চিঠিই ইউনিভার্সিটির ঠিকানায় আসে, বাড়িরগুলো সবই প্রায় ব্যক্তিগত। হয় কোনও প্রিয় ছাত্রছাত্রীর, নয় কোনও বন্ধু সতীর্থ বা আত্মীয়স্বজনের।

একটা এয়ারমেল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বোধিসত্ত্ব অন্যমনস্ক স্বরে বলল,—গিজার কেন?

—জল বেশ কনকন করছে। গরম জলে হাতমুখ ধোওয়াই তো ভাল।

—দাও চালিয়ে। তবে দু-তিন মিনিটের বেশি নয়. জল একটু উষ্ণ হলেই বন্ধ করে দেবে।

বাথরুম থেকে বেরতে গিয়েও থমকাল রাখী। সোপকেসে সাবান নেই, এক্ষুনি এসে হাঁকডাক শুরু করবে বোধিসত্ত্ব, কাবার্ড খুলে গ্লিসারিন সাবান বার করে রাখল একটা। বাথরুমের দরজার সামনে রবারের চটিটি সাজাল, শাল এনে ভাঁজ করে ঝুলিয়ে দিল সোফার কাঁধে, সেন্টার টেবিলে এগিয়ে দিল পরিচ্ছন্ন ছাইদান।

বোধিসত্ত্বর সব কিছুই ঠিক ঠিক সময়ে ঠিক ঠিক জায়গায় জুগিয়ে যেতে হয় না হলে বিরক্ত হয় মানুষটা। সে দাড়ি কামানোর ব্রাশই হোক, কি চিরুনি, কিংবা রুমাল মোজা। আরও কত যে ফরমায়েশ আছে। কোনওটা নীরব, কোনওটা উচ্চকিত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কফি, খাবার টেবিলে মাপ মতো গরম তরিতরকারি, পড়ার টেবিলে লাইটার সিগারেট, পায়ের কাছে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট, শরীরের চাহিদা মতো রাখীর জেগে থাকা বা ঘুমিয়ে পড়া।

তা সব কাজেই রাখী অতি নিপুণা। কিছুটা অভ্যাসে, কিছুটা ভালবাসায়, আর অনেকটাই শ্রদ্ধায়। তার দীর্ঘ চব্বিশ বছরের সুখী বিবাহিত জীবন তাকে অনেক কিছুই শিখিয়েছে। সে জানে সে একটা হেঁজিপেঁজি লোকের বউ নয়, রাখী মজুমদার এক বিশাল মাপের মানুষ বোধিসত্ত্ব মজুমদারের সৌভাগ্যবতী স্ত্রী। এই মানুষটার সেবা করা মানে ধন্য হয়ে যাওয়া। দুনিয়ার কটা মেয়ের এমন কপাল হয়!

তবে হ্যাঁ, সেও এখন আর কচি খুকিটি নেই, মেঘে মেঘে তারও বেলা বেড়েছে। সামনের মার্চে সে হবে পুরো পঞ্চাশ। শরীরে নিয়মমাফিক আধিব্যাধি দেখা দিয়েছে। মাথা জ্বালা করে, কোমর হাঁটুতে ব্যথা, অল্পতেই হাঁপ ধরে, ক্লান্তি আসে...। তাও ভাগ্যিস প্রেশার সুগার নেই। তার তন্বীশ্যামাশিখরদশনা চেহারাও এখন বেশ ভারীর দিকে। বোধিসত্ত্বর মতো পুরো চুল সাদা না হলেও তার মাথায় এলোমেলো রুপোলি দাগ।

কিছুকাল আগেও সংসারের কাজকর্ম একা হাতে সারত রাখী। ঠিকে লোক ছিল, ঘর মুছত, বাসন মাজত, কাপড় কাচত, ব্যস ওইটুকুই। ইদানীং রাখী একটা সব সময়ের লোক রেখেছে। রূপচাঁদ। স্থানীয় আদিবাসী। বছর পনেরো বয়স। ঘরদোরও ঝাড়ে, রান্নাবান্নায়ও সাহায্য করে, আবার দরকার হলে বাগানে গিয়েও নিড়েন দেয়। ছেলেটার সব থেকে বড় গুণ, কথা বলে কম। এ বাড়ির মানুষরা স্বল্পভাষী, সে এখানে দিব্যি খাপ খেয়ে গেছে।

বোধিসত্ত্ব বেরিয়েছে বাথরুম থেকে। রূপচাঁদকে খাবার দাঁবার গরম করতে বলে রাখী ডাইনিং টেবিলে এসে বসল। রাতে বোধিসত্ত্ব খুব বেশি কিছু খায় না। রূপচাঁদের হাতে তৈরি গরম রুটি খান তিনেক, সবজি, স্যালাড আর মুরগি মাটন থাকলে এক-আধ টুকরো। আজ অনেক পদ। টাউন থেকে বড় বড় গলদা চিংড়ি এনেছিল রূপচাঁদ, তার মালাইকারি, কষা মাটন, কপির রোস্ট, ফ্রায়েড রাইস। এ ছাড়াও আছে পায়েস পুডিং। রূপচাঁদ সবই সাজিয়ে দিয়ে গেল টেবিলে।

খেতে বসে আবার বুঝি ছেলের কথা একবার মনে পড়ল বোধিসত্ত্বর। কোলে ন্যাপকিন বিছোতে বিছোতে বলল,—এত কিছু রাঁধলে, বাবুয়া এল না কেন খবর নিয়েছ?

ঠিক এই মুহূর্তে বাবুয়ার প্রসঙ্গ আর ভাল লাগছিল না রাখীর। আলগাভাবে বলল, নেব।

—খেয়ে উঠেই ফোন কর। একটা উইশ করে দাও।

রাখীর গলায় সামান্য ঝাঁঝ এসে গেল,—সে তো তুমিও করতে পারো।

—ঠিক তো। আমিও তো পারি। বলেই উঠে পড়েছে বোধিসত্ত্ব,—এক্ষুনি করছি।

এই মানুষের ওপর রাগ করা যায়? ঝাঁঝ ভুলে হেসে ফেলল রাখী। যেভাবে ফোনের দিকে দৌড়চ্ছে, কে বলবে ওই মানুষটাই এক মহাপণ্ডিত? শিশু, শিশু, একেবারে আলাভোলা শিশু।

মিনিট দু-তিনের মধ্যে ঘুরে এল বোধিসত্ত্ব। মুখ বেজার,—তুৎ, কলকাতার লাইনই পাওয়া যাচ্ছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখীর মুখে হাসি,—তোমার উঠল বাই তো কটক যাই। একটু পরে কোরো। আগে ধীরেসুস্থে খেয়ে নাও তো।

—তখন যদি বাবুয়া ঘুমিয়ে পড়ে?

—বাবুয়া আর অত ছোটটি নেই। নটা বাজলেই আর ঘুমিয়ে পড়ে না মশাই। রাখী রঙ্গ করার মতো করে বলল,—সে এখন অনেক রাত অবধি জেগে পড়ে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবা বলছিল বটে, বোধিসত্ত্ব মাথা দোলাল,—পড়ে তো ইংরিজি, ওতে আবার রাত জাগার কী আছে?

—ও, তোমার ফিজিক্সই বুঝি একমাত্র সাবজেক্ট? ইংলিশ অনার্স কি তুড়ি মেরে পাশ করা যায়? ওকেও কাঁড়ি কাঁড়ি নোটস তৈরি করতে হয়, মেমরাইজ করতে হয়...

—তা হবে। আমি তো জানি লিটারেচার লোকে প্রাণের আনন্দে পড়ে। বলতে বলতে হা হা হেসে উঠল বোধিসত্ত্ব,—তোমার ছেলেকে বোলো, শেক্সপিয়রটা আমার তার থেকে ভাল পড়া আছে। এলিয়টও। চাইলে ছুটিছাটায় এসে আমার কাছে পড়ে যেতে পারে। মোটামুটি কাজ চালানো গোছের নোটও তৈরি করে দিতে পারি। পরীক্ষায় পাশ করে যাবে।

রাখী জানে কথাগুলো বর্ণে বর্ণে সত্যি। ফিজিক্সের নীরস তত্ত্ব আলোচনার মাঝে কী অবলীলায় না সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি দেয় বোধিসত্ত্ব। যেন উদ্ধৃতিও নয়, ঠোঁটের ডগায় চলে আসা শব্দগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরোচ্ছে। শেলি, কিটস, বায়রন, শেক্সপিয়র, হুইটম্যান, এলিয়ট, রিল্‌কে, রবীন্দ্রনাথ, বেদ, উপনিষদ কী না গুলে খেয়েছে মানুষটা। যখন ক্লাসেও লেকচার দেয় বোধিসত্ত্ব, ছেলেমেয়েরা নাকি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকে।

তবে রাখী এও জানে, বাবুয়া মরে গেলেও বাবার কাছে পড়বে না। যদি কণামাত্র সে ইচ্ছে থাকত, তা হলে মাধ্যমিকে অত ভাল রেজাল্ট করার পর হায়ার সেকেন্ডারিতে আর্টস নিত না ছেলে।

প্রসঙ্গটা ঘোরাতে চাইল রাখী। স্বামীর প্লেটে এক চামচ ফ্রায়েড রাইস তুলে দিয়ে বলল,—তোমার ছাত্রছাত্রীরা তোমার কাছে পড়ার জন্য পাগল হতে পারে। কিন্তু তোমার ছেলের পছন্দ নাও হতে পারে তোমার পড়ানো।

—ঠিক। বোধিসত্ত্ব আবার শব্দ করে হেসে উঠল,—বাবারা ইউজুয়ালি ভাল টিচার হয় না। ছেলের সামান্য ভুলভ্রান্তি দেখলে বাবারা তাড়াতাড়ি পেশেন্স লুজ করে। সেটা ছেলের পক্ষেও ভাল নয়, বাবার পক্ষেও না।

বোধিসত্ত্বর হাসিতে কি ছেলের প্রতি কোনও অভিমান লুকিয়ে আছে? নাকি এ শুধু আত্মাভিমান? অহংবোধ? রাখীর মনে আছে, বাবুয়া যখন একদম নিচু ক্লাসে, ছেলেকে নিয়ে মাঝে মাঝে অঙ্ক কষাতে বসত বোধিসত্ত্ব। খেয়াল। একই অঙ্ক দু ভাবে করে দেখাচ্ছে ছেলেকে, তিন ভাবে, চার ভাবে, পাঁচ ভাবে...। ছেলেকে বলছে, এ বার তুই কর দেখি? ছেলে হয়তো দু ভাবে করল, কি মেরেকেটে তিন ভাবে, এই রকমই হা হা হেসে উঠত বোধিসত্ত্ব। তারপর থেকেই ছেলে বাবার থেকে শত হস্ত দূরে, অন্তত অঙ্ক কষার সময়ে। নিজেও তো আর ছেলের দিকে এগোয়নি বোধিসত্ত্ব। হয়তো উৎসাহটাই মরে গিয়েছিল।

তখন থেকেই কি বাপ-ছেলের দ্বন্দ্বের শুরু? কে জানে। হয়তো বাবুয়া ছেলে না হয়ে মেয়ে হলে এত সব সূক্ষ্ম মান-অভিমানের খেলা চলত না!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবতে গিয়ে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল কথাটা,—তোমার একটা মেয়ে থাকলে ভাল হত।

বোধিসত্ত্ব মুখে এক টুকরো চিংড়ি ফেলে চিবতে চিবতে বলল,—কেন?

—এমনিই। মনে হল। রাখী হাসার চেষ্টা করল,—আচ্ছা, ওই মেয়েটা কে গো?

—কোন মেয়েটা?

—ওই যে, যে মেয়েটা তোমার সঙ্গে গেট পর্যন্ত এল...

—ও দয়িতা? এম-এসসি ফাইনাল ইয়ার।

—দয়িতা...দয়িতা...। নামটা বার কয়েক উচ্চারণ করল রাখী,—ভারী সুন্দর নাম তো!

—হ্যাঁ, একটু আনকমন।

—মেয়েটা আরও এক দিন তোমার সঙ্গে এসেছিল না?

—ও তো রোজই আসে।

—রোজ? কই, দেখি না তো!

—অ্যাদ্দূর আসে না। লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে ওই দু-চার পা হয়তো সঙ্গে এল, হোস্টেলে ফিরে গেল...। আমার কাজের ব্যাপারে খুব কৌতূহল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানতে চায়।

—ও।...তোমার আন্ডারে রিসার্চ করতে চায় বুঝি?

—না না, ওর তো স্পেশাল পেপার সলিড স্টেট। এমনিই খুব ইনকুইজিটিভ। থাকে না এক ধরনের স্টুডেন্ট!

রাখী মুচকি হাসল,—তোমায় খুব ভালবাসে বুঝি?

—নিশ্চয়ই লাইক করে। নইলে কি আর সন্ধেবেলা আড্ডাফাড্ডা ছেড়ে আমার বাণী শোনার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে? হা হা হা।

—অত হেসো না। মেয়েদের ওই বয়সটা ভাল নয়।

—কেন?

—কেন আবার কী! ওই বয়সে মেয়েরা খুব ইম্‌পালসে চলে। অনেক উলটোপালটা কাণ্ড করে বসে।

—আমার প্রেমে পড়ে যেতে পারে বলছ?

—শুধু ঠাট্টা, শুধু ঠাট্টা।...এনো তো একদিন মেয়েটাকে, পাগলি কিনা বুঝে নেব!

—আমাকে নিয়ে এখনও তা হলে তোমার ভয় আছে? বোধিসত্ত্ব বিচিত্র মুখভঙ্গি করল,—শুনে বেশ প্রাউড লাগছে। ফিলিং ইয়ংগার।

—ফের ঠাট্টা?...পায়েসটা শেষ করো।

বোধিসত্ত্ব কথা কানেই তুলল না। স্বভাববিরুদ্ধ চটুল ভঙ্গিতে চোখ টিপল,—নাহ, জোয়ান আছি কি না আরেক বার পরীক্ষা করে নিতে হয়। তুমি যুবতী হতে পারবে তো?

হঠাৎই যেন বোধিসত্ত্বর চোখে কামনা চিকচিক। দেখছে রাখীকে, দৃষ্টির ভাষা বদলে গেছে। স্বামীর এই রূপ রাখীর ভীষণ চেনা। ছাপ্পান্ন বছর বয়সেও বোধিসত্ত্ব মজুমদার এক প্রবল পুরুষ। প্রায়শই গভীর রাতে রাখীকে তীব্র রিরংসায় ছিন্নভিন্ন করে বোধিসত্ত্ব। এখনও। এত বিদ্বান মানুষের মধ্যেও কোথথেকে যে এত আদিম খিদে লুকিয়ে থাকে! পেরে ওঠে না রাখী, এই পঞ্চাশ বছর বয়সে শরীর আর সাড়া দিতে চায় না, কষ্ট হয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু তাকে নামতে হয় গোপন খেলায়।

খেলা, না সেবা?

যাক গে যাক, মানুষটার মস্তিষ্কের কোষগুলো যদি এতে তাজা থাকে, রাখী নয় কষ্ট একটু করলই।

অবশ্য এই মুহূর্তে রাখী সামান্য অস্বস্তি বোধ করছিল। চাপা স্বরে বলল,—হচ্ছেটা কী? রূপচাঁদ শুনলে কী ভাববে?

বোধিসত্ত্ব হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই উঠে দাঁড়িয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে কুলকুচি করল বেসিনে। সোফায় বসে সিগারেট ধরাল একটা। টিভি চালিয়ে পাঁচ-সাত মিনিট খবর শুনল বি বি সি-র, রিমোট টিপে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল ধরল। আগ্নেয়গিরির ওপর প্রোগ্রাম হচ্ছে। গলন্ত লাভার স্রোত দেখতে দেখতে দূরমনস্ক হয়ে গেল বোধিসত্ত্ব, টিভি বন্ধ না করে চলে গেল স্টাডিরুমে।

রূপচাঁদ টেবিল মুছছে। রাখী টুকটাক কাজ সারছিল। রূপচাঁদকে খাবার বেড়ে দিল, মাছ মাংস সব তুলে রাখল ফ্রিজে। পুডিংটা একেবারে না-ছোঁয়া পড়ে আছে, বোধিসত্ত্ব ভালবাসে না বলেই বোধ হয় বাবুয়া ভীষণ পুডিং ভালবাসে! পুডিং-এর বাটি হাতে নিয়ে রাখীর বুকটা আবার টনটন করে উঠল। কাল এটা বার করবে না, পরশুও না। যদি শনি-রোববারে আসে ছেলে!

বোধিসত্ত্বর বাংলোটি বেশ প্রকাণ্ডই। বেডরুম স্টাডিরুম ছাড়াও বড় বড় দুটো ঘর, বিশাল বিশাল খাবার জায়গা, বসার জায়গা, এ ধারে ও ধারে বারান্দা, তিন তিনটে বাথরুম। কাজের লোকদের থাকার জন্য বাগানে সারভেন্টস্ কোয়ার্টারও আছে। এত বড় বাড়ির ঝঞ্ঝাট অনেক, অজস্র দরজা-জানলা বন্ধ করতে হয়। কাচের পাল্লাওলা জায়েন্ট সাইজ দরজা-জানলাগুলো টেনে টেনে বন্ধ করল রাখী, ছিটকিনি তুলে দিল। ক্যাম্পাসে চোর-ডাকাতের উপদ্রব কম, সারা রাত সিকিউরিটি গার্ড এ তল্লাটে পাহারা দেয়। তবু কোথাও একটু ফাঁক থাকলেই সর্বনাশ, ইয়া ইয়া মেঠো ইঁদুর ঢুকে পড়বে, বোধিসত্ত্বর স্টাডি-রুমের একেবারে ভুট্টিনাশ করে ছাড়বে।

চারদিক গুছিয়ে রাখী শোওয়ার ঘরে এল। রূপচাঁদ বিছানা করে মশারি টাঙিয়ে দিয়ে গেছে, ইচ্ছে করলে এখনই শুয়ে পড়া যায়। শুল না, আলগা একটা চাদর জড়িয়ে দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় এল। বেতের চেয়ার টেনে বসেছে।

বাইরেটা আরও শীতল এখন। আজ কুয়াশাও পড়েছে বেশ। একটু দূরের অন্ধকারে, বাগানে, পাঁচিলের ধারের ঝাঁকড়া গাছগুলোয়, দূরের লাইটপোস্টের গায়ে চাপ চাপ কুয়াশা। কুয়াশা মেখে সামনের সরু পিচরাস্তাও ভারী রহস্যময় এখন। একদম সুনসান পথটা যেন আবছায়া থেকে ক্রমশ গাঢ় অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

রাখী পথটাকে দেখছিল। অথবা দেখছিল না, পথ বেয়ে তার দুচোখ চলে যাচ্ছে অনেক দূর। সেই কলকাতায়। লেক টেরেসের বাড়ির দোতলার কোণের ঘরখানায় ওই তো এখন উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বাবুয়া। বুকের নীচে পাশবালিশ না? হ্যাঁ, ওভাবেই তো পড়াশুনো করে বাবুয়া! বই সরিয়ে রেখে বাবুয়া চিত হল, হাত আড়াআড়ি চোখের ওপর। কী ভাবছে বাবুয়া? মার কথা?

সহসা রাখীর চোখ জলে ভরে গেল। বাবুয়া আজকাল একদমই এখানে আসতে চায় না। দশ বার ডাকলে যদি বা এল, রাত পোহালেই পালাই পালাই। কেন রে বাবুয়া এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিস! কোথায় তোর বাবার সঙ্গে কী হয়েছে, কোন মান অভিমানের পালা চলছে, তা তোরাই বোঝ, এই মা-টাকে কেন কষ্ট দিস তুই? এত করে মা ডাকল, তবুও এলি না?

কেউ বোঝে না, একা একা রাখীর যে কী করে দিন কাটে বাবা ছেলে কেউ বোঝে না। সারাটা দিন কথা বলার মতোও একটা লোক নেই।

—মা?

রাখী চমকে তাকাল। রূপচাঁদ।

আঙুলে দ্রুত চোখের কোল মুছে নাক টানল রাখী,—যাচ্ছিস?

—আজ্ঞা।

—ফ্লাস্কে বাবুর কফি করে রেখেছিস?

—আজ্ঞা।

—আর গরম জল? বাবু কিন্তু এখন ঠাণ্ডা জল খাবে না।

—জানি, জল গরম করে জগে ঢেলে দিয়েছি।

—যা তা হলে। সকালে গোলাপের গোড়াগুলো খুঁড়ে দিস।

—দিব আজ্ঞা।

তরতরিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল রূপচাঁদ। রাখীও আর বসল না, দরজা লাগিয়ে স্টাডিরুমে এসেছে। বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলে মোটা মোটা বই ছত্রাকার, মাথা নিচু করে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় কী একটা জার্নাল পড়ছে বোধিসত্ত্ব।

রাখী স্বামীর পিঠে হাত রাখল,—কী গো, বাবুয়াকে তো ফোন করলে না?

বোধিসত্ত্বর চোখ নড়ল না। ঠোঁটও না।

—শুনছ? রাখী আবার ডাকল, এর পর বাবুয়া কিন্তু সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়বে।

—আহ্, বিরক্ত করছ কেন? বোধিসত্ত্ব তাকিয়েই ঘাড় ঘুরিয়ে নিল,—একটা ইম্পর্ট্যান্ট আর্টিকল পড়ছি।

—ফোনটা করে এসে পড়ো।

—মহা জ্বালাতন। নিজে করো না।

—তুমি উইশ করলে বাবুয়া বেশি খুশি হবে।

—উইল ইউ প্লিজ লিভ দিস রুম? ঠাণ্ডা রাতটাকে চিরে হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল বোধিসত্ত্ব,—এক কথা বার বার ঘ্যানাচ্ছ কেন? দেখছ না, আমি ব্যস্ত আছি?

রাখীর মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। পায়ে পায়ে বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। টেলিফোনের কাছে যেতে গিয়েও গেল না, দাঁড়িয়ে আছে স্থির।

হিম হিম বিষণ্ণতা ছড়িয়ে গেছে চরাচরে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকছে নিঝুম বাংলোটায়। রাত বাড়ছিল।

তিন

সকালে আজ কুয়াশা পড়েছিল খুব। রোদ তেমন চড়া না হলেও সূর্য উঠেছে অনেকক্ষণ, ঘড়ির ছোট কাঁটা দশ ছুঁই ছুঁই, তবু হিমেল বাষ্পের রেশ এখনও রয়ে গেছে ময়দানে। গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে ঝাপসা ঝাপসা পেঁজা তুলোর চাক, সবুজ মাঠে লেপে আছে ফিকে ধোঁয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৌমিক ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ময়দানটা দেখছিল। এইমাত্র সে শেয়ার ট্যাক্সি থেকে নেমেছে, সঙ্গে সঙ্গেই অফিসে ঢুকে পড়া তার রুটিন, কিন্তু ওই দৃশ্যটা তাকে গেঁথে ফেলেছে সহসা। মাঠের ওপারটা তেমন স্পষ্ট নয়, মনে হয় ও দিকে একটা অন্য পৃথিবী আছে। মনে হয় কেন, আছে নিশ্চয়ই। কেমন সেই পৃথিবীটা? একটু কি কম কেজো? কম নিষ্প্রাণ, কম ডাল, কম বোরিং...

ভাবনাটা এগোতে পারল না। ঘাড়ের পিছনে বুলডগটার হুঙ্কার শুনতে পেল সৌমিক। ঘাঁউ ঘাঁউ ঘাঁউ...তীক্ষ্ণ হাড় ঠাণ্ডা করে দেওয়া আওয়াজ।

সৌমিক ঝটাকসে মুখ ফেরাল। নেই, জন্তুটা নিমেষে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে সৌমিক অফিসের দিকে পা বাড়াল। যখনই সে একটু একা হতে চায়, তখনই কুত্তাটা শালা ঠিক টুঁটির পিছনে এসে হানা দেয়। চব্বিশটা বছর ধরে এই হয়ে আসছে। আশ্চর্য, একটি বারের জন্যও জানোয়ারটাকে দেখা গেল না! একবার, ফর ওয়ানস, যদি কুত্তাটা গর্জন করার আগেই সৌমিক ঘাড় ঘোরাতে পারে..।!

লিফ্‌টের সামনে লম্বা লাইন। সার সার নিরেট মুখ। এক ছাঁচে ঢালা। মনে মনে বিষণ্ণ হাসল সৌমিক। সেও তো ওই ছাঁচেরই। উদ্বিগ্ন মুখে সৌমিক কবজি উলটোল। দশটা বাজতে চার মিনিট আটাশ সেকেন্ড... ছাব্বিশ...চব্বিশ। সচরাচর সে লেট করে না, আজ কি নিয়ম ভেঙে যাবে?

না, খুব দেরি হল না। দশটা বাজার এক মিনিট তেরো সেকেন্ড আগে সৌমিক চলন্ত খাঁচায় পা রাখল। খাঁচায় আরও গোটা সাতেক চিড়িয়া। তিনজন তাদের অফিসের। ডেপুটি ম্যানেজার-টু, পদ্মনাভন। আর ক্যাশ কাউন্টারের প্রতীক-অনীতা। কিউতে দাঁড়িয়ে চোখে পড়েনি, পড়লেও কেউ কারুর দিকে তাকায়নি। রীতি। এখন তিনজনকেই একটা মাপা হাসি বেঁটে দিল সৌমিক।...হাই!...হ্যালো!...মর্নিং!...ব্যস, আবার যে যার অচেনা।

সৌমিকদের অফিস দশতলায়। সাধারণ অফিস নয়, বিদেশি ব্যাংক। সাইজ বিশাল, কয়েক হাজার বর্গফুট তো হবেই। অফিসের এক দিকে গোটা কয়েক বড় বড় চেম্বার আছে বটে, বাকি গোটা জায়গাটাই খোলামেলা। সেখানে অজস্র বেঁটে বেঁটে সুদৃশ্য কিউবিক্‌ল। এক রঙা। বাদামি। প্রায় সব কিউবিক্‌লই কম্পিউটার শোভিত। সৌমিকের খোপটি একেবারে কোণার দিকে, একটু বড়সড়ই। সে এই ব্যাংকের হাফ ডজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারদের একজন।

রিসেপশন থেকেই সৌমিক দেখতে পেল তার খোপে লোক বসে আছে। দ্রুত পায়ে প্যাসেজ পেরোল সৌমিক। জায়গায় বসতে বসতে বলল,—ইয়েস প্লিজ।

লোকটা শশব্যস্ত ভঙ্গিতে সোজা হল,—এই তো...আপনি এসে গেছেন স্যার?

স্যার শোনার বেশি অভ্যেস নেই সৌমিকের। এই অফিসে পরস্পরকে নাম ধরে ডাকাটাই রেওয়াজ, বড় জোর টাইটেল। সে সিনিয়ারই হোক, কি জুনিয়ার। ক্লায়েন্টরাই বা কজন আর স্যার বলে। বরং উলটোটাই তাকে বলতে হয়। অফিস ডেকোরামের অঙ্গ।

স্বভাবসিদ্ধ বিনীত ভঙ্গিতে সৌমিক আবার বলল,—ইয়েস স্যার। বলুন, হাউ ক্যান আই হেলপ্ ইউ?

লোকটা কাঠ কাঠ ভঙ্গিতে বলল,—আমাকে মনে পড়ছে না স্যার? লাস্ট মান্থে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছিলাম...। লোন রিপেমেন্ট নিয়ে একটা গণ্ডগোল ছিল...

কাস্টমাররাও ফেসলেস্। তবু মুখটা মনে পড়ল সৌমিকের। সমস্যাটাও। পর পর তিনটে পোস্ট ডেটেড চেক বাউন্স করেছিল লোকটার, ল'ইয়ারের নোটিস যেতেই সুড়সুড়িয়ে দুটো পেমেন্ট মিটিয়েছে। এক্সট্রা ইন্টারেস্ট ছাড়ের অ্যাপিল করেছিল, ব্যাংক আমল দেয়নি।

রুক্ষ না হয়েও সামান্য কঠিন হল সৌমিক,—ইয়েস, আই রিমেমবার।

—স্যার, ওই ইন্টারেস্টের ব্যাপারে প্রেয়ারটা আপনি নেগেট করেছেন...

—সরি স্যার। আই কান্ট হেলপ। ইটস্ রুল। হায়ার পারচেজে গাড়ি কেনার সময়ে আমি তো ডিটেলে আপনাকে ক্লজগুলো বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। এখন যা হবে, ব্যাংকের আইনেই হবে।

—ক্লজ তো স্যার অনেক কিছুই থাকে। তা বলে ডিসক্রিশান বলে একটা কথা থাকবে না? আপনি স্যার এত বড় একটা পোস্টে আছেন...

চাকরিতে প্রথম ঢোকার পর পর এমন ভাষায় অনুরোধ শুনলে প্রীত হত সৌমিক। তবে দু' বছরেই তার চামড়া মোটা হয়ে গেছে। সে জানে তার পোস্টটার যতই গালভরা নাম থাক, সে একটা ডিগ্‌নিফায়েড্ কেরানি ছাড়া কিছু নয়। মাইনে সে পায় অনেক, কেটেকুটেও বাইশ হাজার ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু ব্যাংক তাকে একটা কারণেই দেয় মাইনেটা। ব্যাংক জানে একটা সৌমিক বসুরায়কে দিয়ে অন্তত আটটা দশহাজারি ক্লার্কের কাজ ওঠানো যাবে।

তবে এই মুহূর্তে নিজের অবস্থানটা কাস্টমারকে বুঝতে দিল না সৌমিক। এটাও অফিস ডেকোরাম। ঠোঁটে একটা আলগা হাসি ঝুলিয়ে বলল,—সরি স্যার। এটা ডিসক্রিশানের কেস নয়। হলে এটা হবে একটা ব্যাড প্রিসিডেন্স। যার জন্য হয়তো আমাদের গাদা গাদা ল-স্যুট ফেস করতে হবে।...বাই দা বাই, হোয়াট অ্যাবাউট ইওর থার্ড পেমেন্ট?

—এই তো স্যার, এই তো চেক এনেছি। বলতে বলতে পকেটে হাত ঢোকাল লোকটা,—স্যার, কেন আর ফ্যাকড়া রাখছেন? আমার সব পেমেন্টই তো ক্লিয়ার হয়ে গেল। একটা ক্লিন চিট দিয়ে দিন, ব্লু বুকটা ট্রান্সফার করে নিই।...কটা তো মাত্র ইন্টারেস্টের টাকা, তিন হাজার সাতশো সামথিং...

—ওইটুকুও বা দেবেন না কেন?

—এটা কিন্তু আপনাদের অবস্টিনেসি। চব্বিশটা পেমেন্টের মধ্যে মাত্র তিনটেয় গণ্ডগোল...লোকটা চোখ ছোট করল। ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে হাসল ধূর্তের মতো,—ধরুন যদি না-ই দিই, কী করবেন আপনারা? কেস করে ওই কটা টাকা উদ্ধার করবেন? ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাবে।

ঠাণ্ডা হাসল সৌমিক। লোকটাকে এতক্ষণ পরে দেখল ভাল করে। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স, চকচকে কামানো গাল, পোশাক আশাক দেখে প্রাইভেট কোম্পানির মাঝারি অফিসার বলে মনে হয়। মুখে চোখে বেশ একটা সফিস্টিকেশনও আছে লোকটার। সম্ভবত রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনে, গ্রুপ থিয়েটার দেখে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে রেগুলার মদ খায়, এবং কালেভদ্রে নীল ছবিও গেলে। এদের মেরুদণ্ড মোটেই খুব শক্ত হয় না। এদের থেকে ভেড়ুয়া মার্কা আলু পটল ব্যবসায়ীরাও অনেক বেশি তাকতদার। লোকটা জানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না ওই তিন হাজার সাতশো সামথিং টাকাই কীভাবে সৌমিকদের ব্যাংক উসুল করতে পারে। কোর্ট ফোর্টে যেতে হবে না, ক্লেম আদায় সেকশনে খবর দিলেই সভ্য-ভব্য পোশাক পরা পেশাদার লোক মাসল্ দেখিয়ে আসবে। প্রয়োজন হলে গাড়িটাও তুলে নেওয়া হবে।

বৃথা বাক্যব্যয় করল না সৌমিক। কম্পিউটার অন্ করে বলল,—ও কে। অ্যাজ ইউ প্লিজ। আমরা কিন্তু স্যার আমাদের কাস্টমারের সঙ্গে সুসম্পর্কই রাখতে চাই।

কী বুঝল কে জানে, লোকটা একটুক্ষণ বসে থেকে চলে গেল। সৌমিক ডুবে গেল কাজে। এই হায়ার পারচেজের চার্জে আসার পর থেকে ওয়ার্ক লোড বেড়েছে খুব। এই শুরু হল, বাড়ি ফিরতে আটটা-নটা বাজবে। আজকাল এত কেনার ঝোঁক বেড়েছে মানুষের, বাপস্। বিশেষত গাড়ি।

অবিরাম ডাটা ফিডিং চলছে। ধূসর পরদায় টিক টিক নাচছে সংখ্যা আর শব্দ। মাঝে মাঝে আসছে লোক, কথা বলছে সৌমিক, আবার মস্তিষ্কের সিগনালে চালু হয়ে যাচ্ছে আঙুল। এখন সৌমিককে দেখে বোঝা দায় কোনটা যন্ত্র? সৌমিক, না ওই যন্ত্রগণক? কে কাকে চালায়?

ঠিক বারোটায় কফি এল। পাতলা গদি আঁটা অস্বচ্ছন্দ চেয়ারে হেলান দিয়ে প্লাস্টিক কাপে চুমুক মারছে সৌমিক, নিবেদিতার প্রবেশ। সালোয়ার কামিজের ওড়না কাঁধে গোছাতে গোছাতে সামনের চেয়ারে বসল,—এই সৌমিক, নিউজ শুনেছিস?

মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে একটু অসহজ বোধ করে সৌমিক। তার চোখে মেয়েরা এখনও দূরের প্রাণী, অন্য গ্রহের বাসিন্দা। না মেশার ফল। সুযোগও হয়নি বিশেষ। সেই ছোটবেলা থেকে সে পড়েছে ছেলেদের স্কুলে, কলকাতার এক নামী ইংলিশ মিডিয়ামে। কলেজও তার কো-এড ছিল না। হ্যাঁ, ক্লাস ইলেভেনে পড়ার সময়ে টিউটোরিয়ালে দু-তিনটে মেয়ের সঙ্গে একটু একটু ভাব হয়েছিল, তবে টেঁকেনি। গল্প করতে করতে একদিন তারা যেই বাড়ি অবধি এল, ব্যস্ পরদিন থেকে শ্রীমতী কবিতা বসুরায় টিউটোরিয়ালের দরজায় খাড়া। একেবারে পক্ষিমাতার মতো ডানায় আগলে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন ছেলেকে। যদি মেয়েদের পাল্লায় পড়ে ছেলের রেজাল্ট খারাপ হয়ে যায়। এম কমে কয়েকজন সহপাঠিনী ছিল বটে, কিন্তু কদিনই বা সৌমিক গেছে ইউনিভার্সিটি? তখন তো কস্টিং পরীক্ষার জন্য...।

তবে নিবেদিতার ব্যাপারটা আলাদা। সেই অর্থে নিবেদিতা ঠিক মেয়ে নয়। সে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, কার্ডস। পোস্টের মতোই লিঙ্গহীন। যদিও সে শরীরে পোশাকে টিপে চুড়িতে যথেষ্ট পরিমাণ রমণী, তেল কাজলে মোটামুটি সুন্দরীও। বয়সে সে সৌমিকের চেয়ে বছর দুয়েকের বড়, ম্যারেড, সময়াভাবে এখনও গর্ভধারণ করেনি। নিবেদিতার সঙ্গে বাক্যালাপে সৌমিকের অসুবিধে নেই।

কফির কাপ ওয়েস্ট পেপার ব্যাস্কেটে ফেলে সোজা হল সৌমিক,—কী নিউজ রে?

—একটা বড়সড় রিশাফল্ হচ্ছে অফিসে। অনেকগুলো হেড এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে।

—কোথায়?

—মুম্বই অফকোর্স।

—কে কে যাচ্ছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—সন্দীপের নাম শুনলাম, রাজন...এখনও অবশ্য কনফার্মড নয়। নিবেদিতা দুলছে বসে বসে,—আমি তো বাবা পাঠালেই চলে যাব।

—কেন, এখানে ভাল লাগছে না?

—তা নয়। কলকাতা...চলতা হ্যায়। কিন্তু প্রসপেক্ট নেই। নখ খুঁটছে নিবেদিতা। নাক কুঁচকোল, পলকে চোখ উজ্জ্বল,—মুম্বই পাঠালে ডেফিনিটলি ভাল লিফট হবে।

—চলে যাবি? হোয়াট অ্যাবাউট ইওর রোহিত?

—বর আঁকড়ে পড়ে থাকলে চলবে? আর রোহিত তো শীতের পরেই স্টেটসে দৌড়চ্ছে। ওয়াই টু কের চক্করে। মিনিমাম এক বছর থাকবে। নিবেদিতা ঠোঁট ওলটাল,—ও সিলিকন ভ্যালিতে দলবল নিয়ে মস্তি করতে করতে কম্পিউটারে দু হাজার সাল আনবে, আর আমি এখানে শাশুড়ির বউমাটি হয়ে নার্স কাম আয়ার ডিউটি করব, জোক নাকি?

—কিন্তু এই যে তোরা দূরে দূরে থাকবি, এতে তোদের কনজুগাল লাইফ অ্যাফেক্ট করবে না? কেতাবি জ্ঞান আওড়াল সৌমিক, ছদ্ম উদ্বেগমাখা মুখে। পরক্ষণেই কথাটা গিলল,—অবশ্য তোদের একটা মারজিনাল সুবিধে আছে। ইস্যু টিস্যু নেই...।

—থাকলে কিছু একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করতাম।

—তবু অসুবিধে তো হতই...

—কিছু না। মেন থিং ইজ, আগে লাইফের প্রায়োরিটিগুলো ঠিক করে নিতে হবে। কনজুগাল লাইফ মানে কি শুধু বিছানা আর কম্পানিয়নশিপ? অ্যামেনিটিজ লাগবে না? অ্যান্ড দ্যাট নিডস মানি। তুমিও টাকা বানাও, আমিও টাকা বানাই। তুমিও কেরিয়ার গড়ো, আমিও কেরিয়ার গড়ি। তবেই না একটা স্ট্যান্ডার্ড কনজুগাল লাইফ...বলতে বলতে চোখ টিপল নিবেদিতা,—তোকে এ সব কী বলছি? তুই তো এখনও বাচ্চা আছিস, কনজুগাল লাইফের সি'ও জানিস না।

সৌমিক মুচকি মুচকি হাসল,—আজ না হোক কাল তো জানতেই হবে। টিপস দে।

—এর কোনও টিপস হয় না। নদীতে পড়লে আপনিই সাঁতার শিখে যাবি। তারপর নিজের মতো করে কাটো।

লঘু আলাপচারিতার সময় শেষ। আবার কাজে বসার ক্যালরিটুকু নেওয়া হয়ে গেছে। ঝড়ের গতিতে চলে গেল নিবেদিতা। সৌমিকও কথাগুলো নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখার টাইম পেল না, পর পর কাস্টমার আসছে। এখন ব্যাংকের পিক আওয়ার, দুটো আড়াইটে অবধি আর মাথা তোলার অবকাশ নেই।

ফুরসত মিলল টিফিন আওয়ারে। নিবেদিতা তখন মেমারি থেকে মুছে গেছে। পেটে চনচনে খিদে। অফিসে টিফিন বয়ে আনার অভ্যেস নেই সৌমিকের, কিছু একটা আনিয়ে নেয় ক্যান্টিন থেকে। আজও নিল।

সবে খাওয়া শুরু করেছে, ফোন। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলল সৌমিক,—ইয়েস, স্পিকিং।

—টিফিন করেছিস?

ওফ, মা।

সৌমিকের ভুরু কুঁচকে গেল,—করছিলাম।

—কী খাচ্ছিস?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটাও জানা জরুরি?

—টোস্ট কলা আর বয়েলড এগ।

—স্টু আনাসনি কেন?

—ইচ্ছে হল না।...জানোই তো স্টু ভালবাসি না।

—তা বলে কলা খাবি? কাল রাতে ঘঙঘঙ কাশছিলি না?

অসহ্য অসহ্য। কবিতা বসুরায় কি এখনও বোঝে না, তার প্রতি মুহূর্তের খবরদারিকে কী চোখে দেখে সৌমিক?

ভারী গলায় সৌমিক বলল,—ভুলে যেও না, আমার আটাশ বছর বয়স হয়ে গেছে। আই নো হোয়াট টু ইট।

—বটেই তো। বলবিই তো। মার মন তুই কী বুঝবি?...স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি গলা ঘড়ঘড় করছে। একেই ওই ঠাণ্ডায় গিয়ে বসে থাকিস...

সেন্টু! মানসিক চাপ তৈরি করার বস্তাপচা কৌশল!

সৌমিক স্বর আরও ভারী করল,—কাশির সঙ্গে কলার কোনও সম্পর্ক নেই। আর কিছু বলবে?

পলকের জন্য ও প্রান্ত নীরব। ফোন রেখে দেবে কি?

না। আবার শব্দ বাজছে,—কালকের কথা মনে আছে?

মেমারি সার্চ করল সৌমিক। ব্ল্যাংক সিগন্যাল। জিজ্ঞাসা করল,—কী কথা বলো তো?

—কাল ও বাড়ি যাওয়া আছে।

মগজে পিপ্ পিপ্ পিপ্ পিপ্। আশ্চর্য, ওই মারাত্মক কথাটা কী করে সৌমিক ভুলে ছিল এতক্ষণ? অফিস বেরনোর সময়েও তো মা কম ঘ্যান ঘ্যান করেনি!

বিরক্ত গলায় সৌমিক বলল,—এই কথাটা রিপিট করার জন্য ফোন করেছ? দেয়ার শুড বি সাম লিমিট, মা। দিস ইজ অফিস, তোমার পুতুল খেলার জায়গা নয়।

—আমি জানি। ফোন করছি, কারণ কালকের প্রোগ্রাম একটু চেঞ্জ হয়েছে। বিকেলে নয়, আমরা যাব কাল সকালে। দুপুরে ওরা আমাদের খেতে বলেছে। আগে থাকতে জানিয়ে রাখলাম, কাল দুপুরে অন্য কোনও প্রোগ্রাম রেখো না।

—থ্যাংকস।

তেতো স্বরে কথাটা বলে ঘটাং রিসিভার রেখে দিল সৌমিক। বিবমিষা জাগছে। মা একেবারে ঘাড়ের ওপর চেপে বসেছে। আবার।

কম্পিউটারের ধূসর পরদায় ধূসরতর ছবি। একের পর এক। খুদে সৌমিক কমিক্স পড়ছে, হাত থেকে ছবিওলা বই কেড়ে নিল মা। হোম টাস্ক তো শেষ, এখন একটু...! না, সামসের পরের এক্সারসাইজটা করো। কুন্তল, অভিষেকের থেকে তোমার এগিয়ে থাকতে হবে, অন্তত এক পা। পার্কে ফুটবল খেলছে সৌমিক, ঘাড় ধরে মা হিড়হিড় করে মাঠ থেকে টেনে নিয়ে এল। ফুটবল চাষাড়ে খেলা, ওতে ব্রেন ভোঁতা হয়ে যায়, তুমি ক্রিকেট খেলতে পারো। ক্লাস সেভেনের সৌমিক একা একা স্কুলে যাবে বলে বায়না ধরেছে। কারুর মা আর যায় না, তুমি কেন যাবে? ঠাস করে চড় কষাল মা, এখনই বখে যাওয়ার শখ হয়েছে? মাধ্যমিকের পর কুচবিহারে পিসির বাড়ি যাওয়ার জন্য লাফালাফি করছে সৌমিক। ওখানে কত মজা, রুন্টুদা সাঁতার শেখাবে, সাইকেল চড়া শেখাবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোর্সা নদীতে নৌকোয় ঘোরাবে খুব, নিয়ে যাবে জয়ন্তী পাহাড়, যে পাহাড়ে সর্বক্ষণ মেঘ আটকে থাকে...। হল না। ছুটিটা তুমি হেলায় নষ্ট করতে পারবে না সৌমিক, সায়েন্সের টিউটর ঠিক করেছি, হায়ার সেকেন্ডারির সিলেবাস বিশাল, এখন থেকেই পড়াশুনো শুরু করে দাও। সেকেন্ড ইয়ারে পড়ার সময়ে কবিতার খাতাটা ভ্যানিশ হয়ে গেল হঠাৎ। গান শুনতে ভালবাসে সৌমিক, পরীক্ষার ঠিক আগে অজ্ঞাত কারণে টেপ অচল।...আরও আরও কত ছবি! ছোটমামার বিয়েতে দারুণ হইচই চলছে বরানগরের বাড়িতে, রাতে দঙ্গল বেঁধে নাইট শোয়ে সিনেমা যাওয়া হবে। নমকহালাল। অমিতাভ বচ্চন। মার ঘাড় টেরা, ফিরতেই হবে। থাকি না মা, সবাই তো থাকছে। একটা তো রাত! না, আগামী সোমবার তোমার ক্লাসটেস্ট আছে, কাল তোমার স্যার পড়াতে আসবেন। দাদু-দিদার অনুরোধে পর্যন্ত গলল না মা। বইমেলা থেকে কেনা জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা অবলীলায় বেচে দিল কাগজঅলাকে। কেরিয়ারের কথা ভাবো সমু, কবিতা তো সারা জীবনের জন্য রইল।

কী মর্মভেদী ঘৃণা যে পাথর হয়ে আছে সৌমিকের বুকে। তার প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বাসনাকে পায়ের তলায় পিষেছে মা!

সৌমিকও প্রতিশোধ নিয়েছে। কেন নেবে না? কেন পড়ে পড়ে মার খাবে? সে মোটেই কবিতা বসুরায়ের ইচ্ছের গাছ নয়। তাকে ঘেঁটি ধরেও জয়েন্ট এনট্রান্সে বসাতে পারেনি মা। তখন কবিতা বসুরায় এক পা পিছিয়েছিল। যাক, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার না হোক, সায়েন্টিস্ট হোক ছেলে। সত্যেন বোস...মেঘনাদ সাহা...সৌমিক বসুরায়..শুনতে খারাপ লাগবে না! রিসার্চ করতে বিদেশ যাবে ছেলে, ফিরে কোনও ইনস্টিটিউট ফিউটের ডিরেক্টর হয়ে বসবে...! সে গুড়েও বালি, মাকে লুকিয়ে দুম করে কমার্স স্ট্রিমে ভর্তি হয়ে গেল সৌমিক। কবিতা বসুরায় বুক চাপড়াচ্ছে, অন্নজল ত্যাগ করল। বাবা বোঝানোর চেষ্টা করল শেষে। কমার্স স্ট্রিমেও তো শাইন করা যায়, ওকে একটু ওর মতো করে বাড়তে দাও কবিতা। কিছুকাল গুম হয়ে রইল মা, সৌমিকের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলত না। তার পরে শুরু হল নতুন চাপ। চার্টার্ডটা করে এম বি এ করতেই হবে সমু...। শুধু মার ইচ্ছেটাকে উপহাস করার জন্যই না চার্টার্ডটা পড়া হল না সৌমিকের।

এত কিছুর পরেও কবিতা বসুরায়ের শিক্ষা হয়নি। এখন সৌমিকের বিয়ের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে মা। এখানেও সৌমিকের নিজের কোনও চয়েস নেই। পাত্রীর কী গুণ, না সে নাকি মার গুরুবোনের মেয়ে! গুরুদেব নাকি তাদের জোড় মিলিয়ে দিয়েছেন। আশ্চর্য, কথা পর্যন্ত দিয়ে ফেলেছে মা! ধন্য সাহস!

মেয়েটাকে রিজেক্ট করে দেবে সৌমিক? কেন? একটা নারী শরীরের জন্য সে কি উন্মুখ হয়ে নেই? মাথায় আবার পিপ্ পিপ্ পিপ্। নিবেদিতার কথাটা মেমারিতে এসে গেল। কনজুগাল লাইফের তুই সি'ও বুঝিস না! সৌমিক মাথা ঝাঁকাল। বুঝি না'ই তো, কিন্তু বুঝতে চাই। বাট নট থ্রু দ্যাট গার্ল, যাকে মা পরিবেশন করে দেবে। শুধু মার ইচ্ছেটাই মেয়েটাকে অপছন্দ করার পক্ষে যথেষ্ট কারণ। কাল একটা সিন ক্রিয়েট করলে কেমন হয়? ওই বাড়িতে কাল সবার সামনে যদি না বলে দেয় সৌমিক?

হ্যাঁ, সৌমিক তাই করবে। কবিতা বসুরায়ের ইচ্ছের গাছটাকে জন্মের মতো মুড়িয়ে দেবে। ওফ্, মার ফেসটা তখন যা হবে না!

পারবে কি সত্যি সত্যি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিন্তাটা এই প্রথম নয়, কদিন ধরেই উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে মনে। রাতে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজলে ভাবনাটা হঠাৎ হঠাৎ স্কাড টোমাহকের মতো হানা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সংশয়টাও। পারবে কি সৌমিক? মার বিপক্ষে তার সব অভ্যুত্থানই সফল হয়েছে কিন্তু কোনও জয়কেই সে উপভোগ করতে পারেনি। কী করে পারবে? মার ইচ্ছের গাছ মুড়োতে গিয়ে সে নিজেই তো একটা অন্য গাছে পরিণত হয়ে গেছে। এবং সেই অন্য গাছটাও মার ইচ্ছের গাছের থেকে তেমন কিছু আলাদা নয়। মা তাকে রুমাল করতে চেয়েছিল, সে বেড়াল হয়ে গেল, এমন তো ঘটল না! সেই একঘেয়ে ক্লান্তিকর জীবনছন্দ—আহার অফিস ঘুম, অফিস ঘুম আহার, ঘুম আহার অফিস...

দোষ সেই বুলডগটার। একটু সরতে চাইলেই এমন ঘাঁউ ঘাঁউ করে ওঠে কুত্তাটা। এইখানেই কবিতা বসুরায় জিতে গেছে, নির্ভুল ভাবে কুকুরটাকে ফিট করে দিতে পেরেছে সৌমিকের ঘাড়ের কাছে। অদৃশ্য এক জন্তু, তবু কী ভয়ঙ্কর তার হুঙ্কার! ছোট্ শালা সমু, ছোট্ ছোট্ ছোট্...ঘাঁউ ঘাঁউ ঘাঁউ...

একবার, ফর ওয়ান্স, যদি কুত্তাটা গর্জন করার আগেই সৌমিক ঘাড় ঘোরাতে পারত...!

কিউবিক্‌লে উৎপল। জুনিয়র অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট। ছোট্ট আলোচনা সেরে চলে গেল উৎপল, ঢুকল আরেক জন। সময় বয়ে চলেছে দ্রুত। চারটেয় মিটিং, জি এম-এর চেম্বারে। মুম্বই থেকে কয়েকটা নতুন স্কিমের সার্কুলার এসেছে, তারই বিস্তারিত পর্যালোচনা। নামেই ডিসকাশান, এসব মিটিং-এ রোবট হয়ে বসে থাকাই দস্তুর, মাঝে মাঝে যান্ত্রিক কুশলতায় ঘাড় নাড়ানোটাই একমাত্র কাজ। জি এম-এর চেম্বার থেকে যখন বেরোল সৌমিক, তখন তার মাথাটা ইঁট হয়ে গেছে।

সোজা কিউবিক্‌লে এল না সৌমিক, টয়লেটে গেল। মুখে চোখে জল ছেটাল খানিকটা। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে এসে দাঁড়াল জানলায়। এই অফিসে একমাত্র টয়লেট থেকেই বাইরের পৃথিবীটা দেখা যায়। আবার ময়দানের দিকে চোখ গেল সৌমিকের। দিনের আলো মলিন এখন, অনেক নীচের ময়দানের সবুজ ভেলভেটে বাদামি ছায়া। মানুষরা সব অস্পষ্ট, তবু তাদের এখনও দেখা যায়। কালচে পিঁপড়ের মতো মানুষ নড়াচড়া করছে ভেলভেটে। সৌমিক ওখানে থাকলে তাকেও কি এখান থেকে ওইটুকুই লাগবে? কোনটা মানুষের আসল মাপ? তাকে যেখান থেকে যতটুকুনই দেখায়, ততটুকুন কি?

অস্বস্তিকর চিন্তা। চোখ ওঠাল সৌমিক। দূরে একটা মাস্তুল মতো দেখা যায় না? গঙ্গায় জাহাজ ঢুকেছে? কোন দেশের জাহাজ? ওই জাহাজ কি ইচ্ছে করলে কোনও অচিন দেশে চলে যেতে পারে?

আবার বুলডগটার ঘাঁউ। ছোট্ ছোট্ ছোট্...

সচকিত সৌমিক টয়লেট থেকে বেরিয়ে বাদামী রঙ করা লক্ষণগণ্ডীতে ফিরল। বেশ কিছু ডাটা আরও ফিড করতে হবে কম্পিউটারে, কয়েকটা ইনফরমেশান স্টাডি করতে হবে, হেড অফিসে কিছু ই-মেলও পাঠানো দরকার।

মিনিট পনেরো পর একটা অচেনা সুগন্ধ নাকে লাগল সৌমিকের। কিউবিক্‌লের মুখে এক তরুণী এসে দাঁড়িয়েছে। শ্যামলা রঙ, মাঝারি হাইট, ঝকঝকে মুখ, গাঢ় উজ্জ্বল চোখ। পরনে সূক্ষ্ম এম্‌ব্রয়েডরি করা নীল সিল্‌কের কামিজ, নীল সালোয়ার, কাঁধে

ফিরোজা রঙ ওড়না, রেশম রেশম চুল পিঠের ওপর ছড়ানো।

সৌমিক একটু অবাক হল। এ সময়ে কাস্টমার তো বড় একটা আসে না!

পেশাদারি ভদ্রতায় সৌমিক টান টান,—ইয়েস প্লিজ, হাউ ক্যান আই হেলপ্ ইউ?

মেয়েটা এক পা এগোল,—আপনিই কি সৌমিক বসুরায়?

—ইয়েস।

—আমি আপনার কাছেই এসেছি। ফর সাম পারসোনাল রিজন।

সৌমিক আড়ষ্ট হয়ে গেল,—বলুন।...বসুন না।

—থ্যাংকস্। মেয়েটা বসল না। সোজাসুজি বলল,—আপনি কি আমার সঙ্গে একটু বাইরে যেতে পারবেন?

সৌমিক চেয়ারে আটকে গেল,—কেন বলুন তো?

মেয়েটা আবছা হাসল। অথবা হাসল না, সৌমিকের মনে হল হাসছে।

তারপরই সপ্রতিভ গলায় বলল,—আমার নাম দয়িতা মিত্র। নামটা কি আপনার একদম অপরিচিত লাগছে?

সৌমিক হতচকিত হয়ে গেল। পাখি কেন নিষাদের দরজায়?

চার

চেয়ারে বসার পর ছেলেটাকে ভাল করে লক্ষ্য করল দয়িতা। হাইট মাঝারি, পাঁচ সাত-আট হবে। গায়ের রং বেশ ফরসা, আপেল আপেল। এত ফরসা ছেলেদের কেমন যেন আহ্লাদী মনে হয়। মুখের মধ্যে প্রথমেই নজরে আসে চোখ। ভাসা ভাসা, স্বপ্ন স্বপ্ন, যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠল। কী বলে ওই রকম চোখকে? মায়াবী, না ভাবলেশহীন গরুর চোখ? তবে স্ট্রাইপড্ ফুলস্লিভের সঙ্গে মেরুন কণ্ঠলেঙ্গুটি, অল্প কোঁকড়া ফোলা ফোলা চুলে ঠিক তত ক্যাবলা দেখাচ্ছে না ছেলেটাকে। আলগা নার্ভাস ভাব ছেলেটার মুখেচোখে। সত্যিই কি সৌমিক বসুরায়কে অস্বস্তিতে ফেলতে পেরেছে দয়িতা?

অস্বস্তি দয়িতারও হচ্ছিল। তেমন একটা হাঁটুকাঁপা ধরনের না হলেও, হচ্ছিল। দুম করে ঝোঁকের মাথায় ছেলেটার অফিসে চলে আসা কি ঠিক হল? কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যেত না?

অফিস জুড়ে ফ্লুরোসেন্ট টিউবের চড়া আলো। নিচু নিচু কিউবিক্‌লগুলোও বেজায় খোলামেলা, চোখ তুললেই এদিক ওদিকে মানুষ দৃশ্যমান। এমন উজ্জ্বল হাটের মাঝে অস্বচ্ছন্দ ভাব বেশিক্ষণ বজায় রাখা কঠিন।

দয়িতা সহজভাবে বলল,—আমি কি আপনাকে খুব ডিস্টার্ব করলাম?

সৌমিক কাঁধ ঝাঁকাল,—ওয়েল, ডিস্টার্বের কী আছে? র‍্যাদার ইট্‌স আ প্লেজ্যান্ট সারপ্রাইজ।

দয়িতা ঠোঁটের কোণ দিয়ে হাসল,—তা হলে চলুন উঠে পড়া যাক।

—দু মিনিট। একটা কাজ হাফ ডান পড়ে আছে...

—আমি কি ততক্ষণ বাইরে ওয়েট করব?

—না না, তা কেন, বসুন না আপনি।...কফি বলব?

—নো থ্যাংকস। আমি কফি খাই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কোল্ড ড্রিঙ্কস চলবে?

—থ্যাংক ইউ। লাগবে না।

—অ্যাজ ইউ প্লিজ।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল সৌমিক। হনহন করে চলে গেল কোথায় যেন। নির্ঘাত টয়লেটে গেল ব্যাটা, নার্ভাসনেস কাটাতে। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ফিরে কম্পিউটার থেকে প্রিন্টআউট বার করছে কিছু, আলগা চোখ বুলিয়ে রেখে দিল টেবিলে। চেয়ারের কাঁধ থেকে ব্লেজারটা তুলে নিয়েছে হাতে।

শ্রাগ্ করল আবার,—ওকে, লেটস মুভ।

বাইরে ভাল মতো অন্ধকার নেমে গেছে। নাগরিক অন্ধকার, মানে আলোর রোশনাই। গাড়িঘোড়ার আলো, রাস্তার আলো, দোকান-অফিসের আলো সবই এখন চোখ ধাঁধানো। বেচারা আঁধার গুটিসুটি মেরে মুখ লুকিয়েছে ময়দানে। দূষণের ধোঁয়া তাড়িয়ে দিচ্ছে সদ্য নামা কুয়াশাকে। শীতের আমেজ ভারী আবছা, শৈশবের স্মৃতির মতো।

ফুটপাতে জনস্রোত। বাড়িমুখো মানুষের অবিন্যস্ত মিছিল। উদ্‌ভ্রান্ত ভিড় কাটিয়ে কাটিয়ে হাঁটছিল দুজনে। নীরবে।

দয়িতাই কথা শুরু করল,—আমি কেন এসেছি আপনি গেস করতে পারছেন?

—বোধ হয় পারছি।

—কী আন্দাজ করছেন? টেরচা চোখে তাকাল দয়িতা।

সৌমিক ঢোক গিলল,—না মানে...আপনি বোধ হয় ফাইনাল এগজামের আগে আমার একটা ভাইভা নিতে চান।

দয়িতা হেসে ফেলেও গম্ভীর হল,—নট এগজ্যাক্টলি।...আমার আরও কিছু কথা ছিল। মোর দ্যান ভাইভা।

ফুটপাতে ঠেলে ওঠা ইটে হঠাৎ একটা হোঁচট খেল সৌমিক। সামলাতে সামলাতে বলল,—বলুন।

—হাঁটতে হাঁটতেই শুনবেন?

—বসবেন কোথায়?...বলেন তো পার্ক স্ট্রিটের দিকে যেতে পারি।

কী আহ্লাদ। ভাবছে কী, অ্যাঁ? চাঁদ ফুল পাখি তারা নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলবে দয়িতা? অত খায় না!

আরও গম্ভীর মুখে দয়িতা বলল,—না। অন্য কোথাও। বদ্ধ জায়গা আমি লাইক করি না।

এবার ইট ছাড়াই হোঁচট খেল সৌমিক, থমকে দাঁড়িয়েছে। ময়দানের দিকে আঙুল দেখাল,—ওখানে যাবেন? ওই যে একটা মেলা চলছে...

—মেলা?

দয়িতা আপত্তি করল না। মেলা মন্দ জায়গা নয়, রাস্তার ভিড়ে তালবেতাল হাঁটার চেয়ে ঢের ঢের ভাল। গাঢ় নির্জনতাও থাকে না, আবার ছড়ানো ছেটানো অলসমেজাজ লোকজনের মাঝে এক ধরনের নির্জনতা বুঝি থাকেও। মন খুলতে মেলার মাঠই বেশ।

রাস্তা পেরিয়ে ও-ফুটে গেল দুজনে, মেলার গেটে এল। শিল্পমেলা। ফাঁকা কাউন্টার থেকে টিকিট কাটল সৌমিক, ভেতরে ঢুকে দয়িতা দেখল জায়গাটা মোটামুটি জনশূন্যই। আছে কিছু স্যুট বুট টাই, আর ইয়া ইয়া প্যাভিলিয়নে হরেক কিসিমের মেশিন আর

গাড়ি। দেশি, বিদেশি। দেশি কম, বিদেশিই বেশি। নিরালা মেলাপ্রাঙ্গণে ক্রেতা-বিক্রেতা সবাই প্রায় ঢুলু ঢুলু।

সৌমিক ঢুকেই একটা ট্র্যাক্টরের স্টলের সামনে স্থাণু। নড়ছেই না। অদ্ভুত ছেলে তো! দয়িতা যে জরুরি কথা বলতেই এখানে এল, তা যেন খেয়ালই নেই। ভাবটা এমন, যেন গিন্নিকে নিয়ে সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছে।

কটমট চোখে হলুদরঙা চাষযন্ত্রটাকে একটুক্ষণ নিরীক্ষণ করল দয়িতা। একই সঙ্গে মনে মনে ভেঁজে নিল কথাগুলো। যা বলার বলে ফেলাই ভাল।

নীরস স্বরে বলে উঠল,—আপনি নিশ্চয়ই আমায় খুব নির্লজ্জ ভাবছেন?

সৌমিক হকচকিয়ে পিছিয়ে এল,—না তো! কেন এরকম ভাবব?

—আপনারা ম্যাসকিউলিন জেন্ডার, যা খুশি ভেবে নিতেই পারেন। সোসাইটি আপনাদের তো সে রাইট দিয়েই রেখেছে।

—এ কথা বলছেন কেন?

—আপনারাই বলতে বাধ্য করেন।

—আমরা?

—ইয়েস। ইন ফ্যাক্ট, আপনিও তার মধ্যে একজন।

—আমি? আ-আ-আ আমি?

—তোতলাবেন না। তোতলানো ছেলে আমি দু চক্ষে দেখতে পারি না। গড়গড় করে কথাগুলো বলে ফেলতে পেরে বেশ চনমনে বোধ করছিল দয়িতা। পুট পুট পিন ফোটাল,—সেজে থাকে ভিজে বেড়ালটি...

—আ-আ-আ...সৌমিকের স্বর একেবারেই আটকে গেল।

ছেলেটার অবস্থা দেখে দয়িতার বুঝি দয়া হল সামান্য। গলা একটু নরম করে বলল,—আমি ইউজুয়াল তোতলাদের কথা বলছি। হোপফুলি ইউ ডোন্ট বিলং টু দ্যাট ক্লাস।

সৌমিকের দৃষ্টি কেমন বিস্ফারিত, ঠোঁট হাঁ হয়ে আছে। অসহ্য।

দয়িতা আবার ঝনঝন করে উঠল,—কথাগুলো কেন আপনাকে বলছি বুঝতে পারছেন না?

সৌমিক দু দিকে মাথা নাড়ল।

হাঁটতে আরম্ভ করল দয়িতা,—কারণ আমার বিয়েতে আপনি একজন পার্টি। এবং যে সে পার্টি নয়, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পার্টি। বর। কী করে আপনি এ বিয়েটা মেনে নিয়েছেন?

—মানব না? সৌমিক হাঁটছে পিছন পিছন, একটু বুঝি বা ভয়ে ভয়ে।

—কেন মানবেন? একটা প্রিমিটিভ সিস্টেম চলে আসছে, কেন তা ব্রেক করবেন না? স্বর সামান্য চড়ে গিয়েছিল দয়িতার। এক বয়স্ক সর্দারজি পাশ দিয়ে যেতে যেতে ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে। দয়িতা ঝট করে মুখ ফিরিয়ে নিল,—ছেলে মেয়েকে চেনে না, মেয়ে ছেলেকে চেনে না, কী একটা অং বং চং মন্ত্র পড়া হল, যদস্তু তদস্তু হল, ব্যস ওমনি দুটো প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিল! ইস, কী জঘন্য।

সৌমিক অস্ফুটে বলল,—তা বটে।

—ওই মুখেই তা বটে বলবেন, কাজের সময়ে তো একেবারে উলটোটি।

এতক্ষণে সৌমিকের মুখে হাসি ফুটল সামান্য। মলিন হাসি। মৃদু, কিন্তু স্পষ্ট গলায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল,—বিয়েটা যে আমার মতে হচ্ছে, তা আপনি ভাবলেন কী করে? এমনও তো হতে পারে, আমার মতামত না জেনেই বিয়ের ঠিক হয়েছে?

—তা হলে তো আরও খারাপ। তার মানে আপনি মায়ের নাড়ুগোপালটি সেজে বিয়ে করতে বসছেন!

একটুক্ষণ সৌমিক চুপ। কী যেন ভাবছে। পাশের দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছে এক জাপানি, আভূমি নত হয়ে বাও করছে দুজনকে, সাজানো প্যাভিলিয়নে চা ছাঁটার মেশিন দেখতে ডাকছে। তাকে আলগা প্রতিনমস্কার জানিয়ে সরে গেল সৌমিক। দয়িতার দিকে না ফিরেই শূন্যে কাটা কাটা বাক্যবন্ধ ছুড়ে দিল,—আপনার কি বিয়েতে আপত্তি? না আমাকে বিয়েতে আপত্তি?

—দুটোই। দয়িতা ঝটপট জবাব দিল।

সৌমিক অন্য দিকে মুখ রেখেই বলল,—বিয়েতে আপত্তিটা নয় বুঝলাম। কিন্তু আমাকে অপছন্দ করার কারণটা জানতে পারি কি?

—এত বড় একটা চাকরি করেন, লেখাপড়ায় নাকি ব্রিলিয়ান্ট, এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধিও আপনার নেই?

এবার সৌমিক অপাঙ্গে দেখছে দয়িতাকে। ভুরু কুঁচকে বলল,—আপনি কি আর কাউকে ভালবাসেন? আই মিন, বিয়ে করতে চান?

দয়িতা চকিতে উদাস। বোধিসত্ত্বকে কি ভালবাসে সে? চায়? আকাশকে কি চাইলেই পাওয়া যায়? কিংবা সমুদ্রকে? পাহাড়কে? এ চাওয়ায় তো কোনও প্রত্যাশা নেই, শুধু যন্ত্রণা আছে। এক গভীর সুখের যন্ত্রণা। এ সব কথা বললেও কি বুঝবে এই বোকা বোকা অনুভূতিহীন ছেলেটা? সম্ভাব্য স্ত্রীকে পাশে নিয়ে যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ট্র্যাক্টর দেখে...!

সৌমিক আবার বলল,—আপনি কিন্তু নিঃসংকোচে বলতে পারেন।

দয়িতা একটা নিশ্বাস ফেলল। উষ্ণ। ভেজা ভেজা। শান্তভাবে মাথা নেড়ে বলল,—নাহ্, তেমন কিছু নয়।

—ও।

সৌমিক আর কথা বাড়াল না। নিঃশব্দে হাঁটছে। অস্বাভাবিক মন্থর গতিতে। আকাশের দিকে তাকাল একবার, হিম পড়ছে বোধ হয়। ধুলো ঢাকতে এখানে ওখানে জল ছড়িয়েছে মেলাকর্তৃপক্ষ, কোথাও কোথাও কাদা কাদা মতন হয়ে আছে। অন্যমনস্কভাবে একটা কাদায় পা পড়ল সৌমিকের, অন্যমনস্কভাবেই পার হয়ে গেল।

কেটলি হাতে চা বিক্রি করছে এক কিশোর। তাকে হঠাৎ ডাকল সৌমিক। ভাঁড়ে চা নিল।

ফিরে দয়িতাকে জিজ্ঞাসা করল,—চলবে?

আলতো ঘাড় নাড়ল দয়িতা। চা ভীষণ গরম, ছোট্ট ছোট্ট চুমুক দিচ্ছে ভাঁড়ে। উষ্ণ পানীয় নেমে যাচ্ছে গলা বেয়ে, মন্দ লাগছে না।

অস্বস্তিটা একটু একটু ফিরে আসছিল দয়িতার। এত কড়া ভাষায় ছেলেটাকে কথাগুলো না বললেই হত। একজন অচেনা মানুষ, যে ক্ষণিক পরিচয়ের পর আবার চিরকালের মতো অপরিচিত হয়ে যাবে, সে কী বিশ্রী একটা ধারণা করল দয়িতার সম্পর্কে! কিছুই যায় আসে না, আবার কিছু যেন যায় আসেও। এই পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তেই হোক, একটা মানুষ তার প্রতি তীব্র বিরাগ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই ভাবনাতেও

একটা বিজবিজে অস্বস্তি। প্রত্যাখ্যান কি একটু শালীন করা যায় না?

দয়িতা গলা নামিয়ে বলল,—সরি সৌমিক, আমি আপনাকে ঠিক হার্ট করতে চাইনি।

সৌমিক বলল না কিছু। ভাঁড়টা ঘাসে ফেলে চেপে চেপে গুঁড়ো করছে।

দয়িতা বলল,—শুনুন আপনাকে পছন্দ অপছন্দের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ইউ আর নো-বডি। বলেই একবার দেখে নিল সৌমিককে,—ইটস আ ম্যাটার অফ প্রিন্সিপল্। কোথাকার কে এক গুরুঠাকুর না গুরুদেব সে আমাদের মতো দুজনের ফেট ডিসাইড করবে, এটা মেনে নেওয়ার কোনও মানে হয় না। বাবা মা চাইলেও নয়।

—হুঁ।

—কিন্তু আমার প্রোটেস্ট জানানোর একটু প্রবলেম আছে। বুঝতেই তো পারছেন, কী যুক্তি দেখাব? আপনি ওয়েল কোয়ালিফায়েড, মোটা মাইনে পান, আপনার চেহারাও খারাপ নয়, অ্যাপারেন্টলি তেমন কোনও ভাইসও নেই। বাবা মা এর থেকে বেশি মেয়ের বিয়ের জন্য আর কী চায়! তার ওপর আপনি খোদ গুরুদেবের চয়েস। সুতরাং আমার কোনও আপত্তিই স্ট্যান্ড করবে না । কিন্তু আপনার কথা আলাদা।

—কেন? সৌমিক ভুরু কুঁচকে তাকাল,—আলাদা কীসে?

—ওই যে বললাম...ম্যাসকিউলিন জেন্ডার! ওটাই আপনার প্রিভিলেজ। আপনি অনায়াসে আমায় রিজেক্ট করতে পারেন।

—আমি! আমি কেন রিজেক্ট করব?

—কেন নয়? দয়িতা চোখ ঘোরাল,—আপনার ফেভারে তো অনেক পয়েন্ট। পাত্রী রূপেও কিছু অপ্সরী নয়, বিদ্যেতেও সরস্বতী নয়। অ্যাভারেজ। আপনার যা চেহারা, যা প্রসপেক্ট, আপনি বেটার ডিশ চাইতেই পারেন। অ্যান্ড অ্যাজ অ্যান এবল ম্যাসকিউলিন জেন্ডার সেটাই বোধ হয় আপনার উচিত হবে।

—বলছেন? এতক্ষণে সৌমিকের ঠোঁটে পাতলা হাসি।

—বলছি। আমি আপনাকে ওপেন ওফার দিচ্ছি। কাল আমাদের বাড়ি আসুন, এবং বাবা মা সকলের সামনে মুখের ওপর আমায় বাতিল করে দিন। আমি কিছু মনে করব না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

—তার মানে...আপনি...শুধু প্রিন্সিপলের জন্যই বিয়েটা?

—প্রিন্সিপল্টা কি ইর‍্যাশনাল মনে হল? সৌমিকের মুখ থেকে খপ করে কথা কেড়ে নিল দয়িতা।

—না, তা নয়...

—আইডিয়াটা খারাপ? সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না...

—সাপ? মানে ওই প্রিমিটিভ নিয়ম?

—অফ কোর্স। দয়িতা সরাসরি সৌমিকের চোখের দিকে তাকাল,—কী, পারবেন তো?

সৌমিক মাথা নামিয়ে নিল। ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে হাসিটা ঝুলেই আছে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল দয়িতা। যাক বাবা, আহত পৌরুষের ক্ষতস্থানে প্রলেপ পড়েছে কিছুটা। চিরশ্রী ঠিকই বলে, মেয়েরা সামান্য উসকে দিলেই ছেলেরা ভেড়া বনে যায়।

আহা রে বালাই ষাট, ছেলেটা একটু কেবলুশ আছে বটে, কিন্তু ভেড়া কেন হবে? ভাল ছেলে, ভালমানুষ ছেলে, গুডি গুডি বয়।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তুমি যতই গুড বয় হও সৌমিক, আমার বোধিসত্ত্বর কাছে তুমি কিচ্ছু না।

রাত্রে খাবার টেবিলে বসে কথা হচ্ছিল। ওই বিয়ে নিয়েই।

প্রবীর জিজ্ঞাসা করল,—মাঘের গোড়ার দিকে ডেট ফেললে তোর অসুবিধে হবে না তো মুনিয়া?

মণিদীপা স্যালাডে লেবু চিপছিল। বলল,—অসুবিধে কীসের? ওর ফাইনাল তো মার্চের লাস্টে। ইচ্ছে হলে একটা মিনি হনিমুনও সেরে নিতে পারবে।

বুম্বা সদ্য কলেজে ঢুকেছে এ বছর, কমার্স নিয়ে পড়ছে। সে ফোড়ন কেটে উঠল,—আজকাল মধুচন্দ্রিমার কি গ্রেডেশান হচ্ছে মা? মিনি হনিমুন? ম্যাক্সি হনিমুন?

—অ্যাই, তুই চুপ কর তো। মণিদীপা ছেলেকে লঘু ধমক দিয়ে স্বামীর দিকে ফিরল,—মনে খুঁতখুঁত থাকলে অত দেরি কোরো না, অঘ্রাণেই দিন দ্যাখো।

—এত তাড়াতাড়ি? মেয়ের বিয়ের অ্যারেঞ্জমেন্ট কি মুখের কথা! এখন বললে একটা ভাল বিয়েবাড়ি বুক করতে পারব? মাঘ মাসেই কোথায় পাই দ্যাখো। তার ওপর তোমাদের মার্কেটিং করতে কদ্দিন লাগাবে...শাড়ি আছে, কসমেটিকস আছে, ফার্নিচার আছে, গয়না গড়ানো আছে...। সুবীরদেরও টাইম দিতে হবে, ওরা নাইরোবি থেকে আসবে...

—ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। গয়না। মণিদীপা হাতায় কপি তুলে প্রবীরের পাতে দিল,—কোনটা কোনটা ভাঙি বলো তো?

—সে তুমি বোঝো। আমি কী বলব?

—ভাবছি বড় নেকলেসটা ভাঙব না। তোমার মা হাতে করে দিয়েছিলেন, থাক। ওটা ওই অবস্থাতেই পালিশ টালিশ করে মুনিয়াকে দিয়ে দেব। ওদের তো এখন ওই সাবেকি ডিজাইনই বেশি পছন্দ। ওতে পুরো ছ ভরি আছে, আমি ওজন করে দেখেছি। চূড় ব্রেসলেটও...আলাদা করে শুধু চুড়ি গড়াতে হবে। অন্তত দশ গাছা। ওই সোনাটুকু কিন্তু কিনতে হবে, বুঝলে?

—কতটা লাগবে?

—কম করেও এগারো-বারো ভরি তো বটেই। একদম ফংফঙে জিনিস দিলে কবিতাদির কাছে মান থাকবে?

নিঃশব্দে খেতে খেতে আলোচনাটা শুনছিল দয়িতা। কী অদ্ভুত অলীক এক বিষয় নিয়ে কথা চালিয়ে যাচ্ছে বাবা-মা! যে ঘটনাটা ঘটবেই না তা নিয়ে মধুর কল্পনার জাল বুনে চলেছে। আশ্চর্য, যেন দয়িতার বিয়ে দিতে পারলেই এদের জীবনের মোক্ষলাভ হয়। আরও আশ্চর্য, এই বাবা-মা তাকে নাকি স্বাধীন করে গড়েছে! তার ইচ্ছে-অনিচ্ছেকে নাকি রেসপেক্ট করে! অথচ কলকাতায় পা দেওয়ার পরে একবারও কেউ জিজ্ঞাসা করল না, হ্যাঁ রে মুনিয়া, তোর ওই ছেলে পছন্দ তো!

ঠিক করেছে দয়িতা, পাকা গুটি কাচিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এবারটা নয় পার করে দিল দয়িতা, নেক্সট বার? এখন তো সম্বন্ধ বার বার আসবে, কতবার ঠেকাবে দয়িতা? এক সময়ে কি নুয়ে পড়বে? কী হবে তখন বোধিসত্ত্বর? হৃদয়ের কোন মণিকোঠায় থাকবেন তিনি?

প্রসঙ্গ সরেছে সামান্য। গয়না থেকে ফার্নিচারে। ক্রমশ কালকের আয়োজনের দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গড়াচ্ছে।

মণিদীপা দয়িতাকে জিজ্ঞাস করল,—হ্যাঁ রে মুনিয়া, কাল কী কী করা যায় বল তো?

দয়িতা ঠোঁট উলটোল,—আমি কী বলব?

—কিছু একটা সাজেস্ট কর। প্রবীর মেয়ের দিকে তাকাল,—তোরা আজকালকার ছেলেদের টেস্ট বুঝিস।

—দিদি ছেলেদের টেস্ট কী বুঝবে? আমায় জিজ্ঞেস করো। বুম্বা চুপ থাকতে পারল না,—উই লাইক শর্টকাট। নো ঝোলঝাল, শুকনো শুকনো। চিকেন করলে চিলি চিকেন, মাটন করলে কাবাব, মাছ করলে ফিস তন্দুরি...

দয়িতা মুখ বেঁকাল,—ছেলেটা একা আসবে না মা। তার মা-বাবাও থাকবে।

—হ্যাঁ, সেটাও ভাবতে হবে। কবিতাদির বরকে নিয়ে কোনও প্রবলেম নেই। আশ্রমে তো দেখেছি নিরঞ্জনদা ভুনিখিচুড়িও কেমন সাপটেসুপটে খায়।...কবিতাদি মাছ খুব ভালবাসে। সেবার হরিদ্বারে গুরুদেবের কাছে গিয়ে বেচারার খুব অসুবিধে হচ্ছিল।

—তোমরা মেয়েরা কেনই বা যে দীক্ষা নাও। প্রবীর পুট করে মন্তব্য ছুড়ল,—ঈশ্বরের পায়ে সর্বস্ব অর্পণ করবে, কিন্তু মাছ মাংসটুকু ছাড়তে পারবে না।

—আহা, গুরুদেব কক্ষণও মাছ মাংস খেতে বারণ করেন না।

—সে তো উনি নিজে ছাড়তে পারেননি, তাই। বুম্বা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল কথাটা।

অগ্ন্যুৎপাতের আশঙ্কা। প্রবীর তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—যাক গে যাক, তোমার কবিতাদিকে কাল কী মাছ খাওয়াবে বলো। চিংড়ি? কই? ভেট্‌কি? রুই?

—চিংড়ি এনো। আর...মুনিয়া, তুই কী রাঁধবি?

—দিদি? বুম্বা আবার ফুট কাটল,—ও কোনও একটা রেডিও আইসোটোপের বড়া ভেজে দেবে। লেজার বিম দিয়ে।

দয়িতা তীব্র দৃষ্টি হানল ভাইয়ের দিকে। গম্ভীর মুখে বলল,—আমাকে কেন রাঁধতে হবে?

—ওটা নিয়ম। একটা কিছু করতেই হয়। কবিতাদিকে আমি মিথ্যে বলতে পারব না।

—আমার দ্বারা হবে না। এম এস্‌সি পড়ছি রাঁধুনি হওয়ার জন্য নাকি?

—ও কী কথা মুনিয়া! মেয়েরা যত বিদুষীই হোক, তাদের রান্নাবান্না একটু জানতেই হয়। নইলে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে নিন্দে হবে না?

বাহ বাহ, কী যুক্তি! শুধু এই অপমানজনক শব্দ কটার জন্যই বিয়ে ভেঙে দেওয়া উচিত। মা কি ওই সৌমিকটাকে জিজ্ঞেস করতে পারবে, হ্যাঁগো বাছা, তুমি বাড়ির কী কী কাজ জানো! বেসিন সাফ করতে পারো? ঝুল ঝাড়তে পারো? পরদায় রিং পরাতে? আশ্চর্য, বাবাও কোনও প্রতিবাদ করছে না! অথচ এই বাবাই না তার কেরিয়ার নিয়ে কত ভাবে? এম এসসি করে তোকে থামলে চলবে না মুনিয়া, পিএইচ ডি করতে হবে! আজকাল লেকচারারের চাকরি জোটাতে গেলেও...।

বাবা-মা কী ধরনের মানুষ? সেই কী একটা কবিতা আছে না, ধর্মেও আছি, জিরাফেও আছি, সেই প্রজাতির?

হঠাৎ একটা চাপা প্রতিশোধস্পৃহা জেগে উঠল দয়িতার মনে। বিয়ে তো ভেঙে যাচ্ছেই, তার আগে মা গদগদ মুখে তার গুরুবোনকে একটু মেয়ের গুণপনা শোনাক না! সৌমিক বসুরায় যখন চ্যাটাং চ্যাটাং করে মেয়েকে বাতিল করে দেবে, তখন গুণবতী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কন্যার মা'র মুখের ছবিটা কেমন হবে?

গোমড়া মুখেই দয়িতা বলল,—হুকুম করো কী করতে হবে? আমার শ্বশুর-শাশুড়ি কীসে তৃপ্ত হবেন?

বুম্বা দিদির কানের কাছে মুখ নিয়ে এল,—আহা, চটছিস কেন? লক্ষীদি ফিশফ্রাই গড়ে দেবে, গ্যাস জ্বালিয়ে দেবে, কড়ায় তেল দিয়ে দেবে, তুই খালি হাতে করে ছাড়বি। ব্যস, সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না।

রাগ ভুলে পেট গুলিয়ে হাসি এল দয়িতার। একই প্রবচনের কত রকম প্রয়োগ! এই প্রবচনেই না শেষমেষ পুরোদস্তুর ধরাশায়ী হল সৌমিক! আহা রে, দয়িতা যখন মেট্রো রেলের গহ্বরে নেমে যাচ্ছিল তখন ওপর থেকে হাত নাড়ছিল বেচারা!

আরও কিছুক্ষণ নৈশ টেবিলবৈঠক চালিয়ে সবাই যে যার মতো উঠল। ড্রয়িং স্পেসে পা ছড়িয়ে এখন টিভিতে স্পোর্টস চ্যানেল ধরবে বুম্বা, মণিদীপাও গিয়ে বসবে ছেলের পাশে। খুনসুটি শুরু হবে দুজনের। স্পোর্টস চ্যানেল, না সিনেমা! মণিদীপাই হারে বেশিরভাগ দিন। আজ অবশ্য শুক্রবার, লোকাল কেব্‌লে ভাল হিন্দি ছবি দেখাচ্ছে, মণিদীপা আজ জিতলেও জিততে পারে। প্রবীরের টিভির নেশা নেই, সে এখন বসবে অফিসের ফাইল নিয়ে। বহুজাতিক সংস্থায় দায়িত্বপূর্ণ পদে চাকরি, কোম্পানির ফাইল ঘরে স্তূপ না হলে মানায় না।

বাড়ি এলে দয়িতা এ সময়ে বাবার সঙ্গে বসে টুকটাক কথা বলে, মা ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমশকরা করে। আজ মুড নেই, সোজা চলে এল নিজের ঘরে। হ্যাঁ, নিজের ঘর, একেবারে নিজস্ব। বছর চারেক হল উত্তরের রায়বাগান স্ট্রিটে সাবেকি বসতবাড়ি কিনেছে প্রবীর, বুম্বা দয়িতা দুজনেরই আলাদা আলাদা ঘর আছে এখানে। শান্তি, ভাইবোনে ঝগড়াঝাটি লাগে কম। দয়িতার ঘরটা খুব বড় না হলেও ছিমছাম, সাজানো। সিঙ্গলবেড খাট, ওয়ারড্রোব, মিনি বুককেস, শৌখিন জিনিসপত্র রাখার ঝুলন্ত খোপ খোপ র‍্যাক, জানলা দরজায় বেডকভারের সঙ্গে মানানসই বাহারি পরদা, অফহোয়াইট দেয়ালে যামিনী রায়ের পেন্টিং-এর বাঁধানো প্রিন্ট। মেয়ে না থাকলেও রোজ এ ঘর নিজের হাতে গুছিয়ে রাখে মণিদীপা।

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছে দয়িতা। চোখ বুজতেই সন্ধেটা ঝেঁপে এল। পাশ ফিরে দয়িতা জড়িয়ে ধরল বালিশটাকে। কার জন্য করল এ সব আজ? বোধিসত্ত্ব...? কী করছেন বোধিসত্ত্ব এখন? আজ কি এসেছিলেন লাইব্রেরিতে? ফেরার পথে দয়িতার কথা কি একটুও মনে পড়েছিল? কী যেন বলছিলেন সে দিন বোধিসত্ত্ব? কোনও একটা পয়েন্ট থেকে সুইচ অন করে দেওয়া হয়েছে, তারপর থেকে এই ইউনিভার্সটা চলছে...চলছে...চলছে...! সুইচ-অন করা ঈশ্বর এক হাত-পা বাঁধা পুতুল, যা ঘটেছে তার বাইরে তাঁর নাকি আর কিছু করার ছিল না!

অন্ধকারে দয়িতা আপন মনে হাসল। আজ সন্ধেয় অন্য আর কিছু কি করতে পারত দয়িতা? সেও তো এখন একটা হাত-পা বাঁধা পুতুল!

ঘুমিয়ে পড়ল দয়িতা।

জাগল বুম্বার ডাকে,—দিদি, অ্যাই দিদি, নিউজ! তোর উড-বি বরটা আজ আসছে না।

—সে কী! দয়িতা চোখ রগড়াল,—কে বলল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—হ্যাঁরে, কবিতামাসি ফোন করেছিল। তোর বর নাকি তোকে একেবারে ছাদনাতলায় দেখবে। তার আগে নয়। ওরা অবশ্য আসছে আজ...তোকে আশীর্বাদ করতে।

দয়িতা নিঃসাড়। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না দয়িতা।

পাঁচ

সেকেন্ড পিরিয়ডের পর ঢং ঢং ঘণ্টা বেজে গেল। এইমাত্র খবর এসেছে কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ হরেন শাসমল মারা গেছেন, তাঁর আত্মার প্রতি সম্মান জানাতে তড়িঘড়ি কলেজ ছুটি দিয়ে দিয়েছেন প্রিন্সিপাল। এমন উড়ো শোকের ঘটনায় ছেলেমেয়েরা ভারী আহ্লাদিত। এক্ষুনি কোথায় কোন সিনেমা হলে ঢোকা যায় তাই নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে আলোচনা চলছে, এক দল নাচতে নাচতে কফিহাউসের দিকে চলে গেল, কেউ কেউ ছুটেছে কমনরুমে টেবিল টেনিস পিটতে। কয়েকজন এখনও উদ্দেশ্যহীন। তারা অলস মেজাজে গজল্লা করছে কলেজের বারান্দায়।

বাবুয়ার দিনটাই বিস্বাদ হয়ে গেল। এখন এই পড়ে পাওয়া সময়টা নিয়ে সে করে কী? বাড়ি ফিরবে? ফেরা যায়। নয় ফিরে শুয়েই রইল সন্ধে পর্যন্ত। কিন্তু তার অসুবিধে বিস্তর। দাদু কাকিমাকে হাজার কৈফিয়ত দিতে হবে, বাবুয়ার যা একদম পছন্দ নয়। আরও সমস্যা আছে। সকাল থেকে বাবুয়ার আজ একটু গা ম্যাজম্যাজ, এখন গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে আর দেখতে হবে না, জ্বর আসবেই। শীতের শুরুতেই বাবুয়া ভোগে বেশি, এ সময়ে আলস্য দেখিয়ে শরীরকে অকারণ উদ্ব্যস্ত না করাই ভাল। অবশ্য হাঁটতে হাঁটতে কলেজ স্কোয়ার চলে যেতে পারে বাবুয়া। কয়েকটা বুড়ো সেখানে ভারী মন দিয়ে তাস খেলে, তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে বাবুয়ার মন্দ লাগে না। কথায় কথায় খুব ঝগড়া করে বুড়োগুলো, স্পেড হার্টস ক্লাব ছাড়া আর কিছু তাদের জগতেই নেই...কী অদ্ভুত!

আর একটা কাজও করতে পারে বাবুয়া। ধীরে সুস্থে রওনা দিতে পারে বাড়ির দিকে। হেঁটে হেঁটে। আগেও একদিন গিয়েছে, বেশ লেগেছিল। একটার পর একটা পাড়া, একটার পর একটা জায়গা পেরিয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, ক্রমশ শহরটা বদলে যাচ্ছে...। মানে ঠিক শহর নয়, শহরের টোপোগ্রাফি, আশপাশের লোকজন। ঘিঞ্জি বউবাজার পেরিয়ে মুসলিম জোন, তারপর অ্যাংলোইন্ডিয়ান পাড়া, তারপর শুধু অফিসের জঙ্গল...। বাড়িঘরের আকৃতি পালটে পালটে যাচ্ছে, রাস্তাঘাটেরও। গন্ধও যেন বদলে বদলে যায়। কোথাও বাজারের বিশ্রি পচা দুর্গন্ধ, কোথাও চাঁপ বিরিয়ানির সুঘ্রাণ, কোথাও বা কাঠের ফার্ণিচারের বার্নিশ-ঝাঁঝ। অফিস পাড়ায় কোনও গন্ধ নেই। নাকি আছে? এটা মিশ্র গন্ধ, অথবা গন্ধহীন। আবার দক্ষিণে পৌঁছলে অবাঙালি গন্ধ, বাঙালি গন্ধ...।

অল্প অল্প উজ্জীবিত বোধ করছিল বাবুয়া। হ্যাঁ, এটাই বেশ হবে। এখান থেকে বাড়ি অনেকটা পথ। শ্লথ পায়ে হাঁটলে ঘণ্টা দু-আড়াই তো লেগেই যায়। এখন বাজে একটা, পৌঁছতে পৌঁছতে সাড়ে তিনটে। তখন নো জেরা, নাথিং। কলেজের শেষ ক্লাসগুলো বেশির ভাগ দিনই হয় না, বাড়ির লোকরা জানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবুয়া নোটখাতা গুছিয়ে কলেজের গেট দিয়ে বেরোচ্ছে, ইউনিয়নের তিন চারটে ছেলে এসে ধরল,—অ্যাই, কাল আসছিস তো?

বাবুয়া দাঁড়িয়ে গেল,—হ্যাঁ, কেন?

—পোস্টার দেখিসনি? কাল মিছিল আছে।

—ও, হ্যাঁ...। তো?

—তো কী রে? বিশাল র‍্যালি করতে হবে কাল। জিনস পাঞ্জাবি পরা একজন এগিয়ে এল। আলগা হাত রেখেছে বাবুয়ার কাঁধে,—ইরাকে মার্কিন হানাদারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এ তো আমাদের কর্তব্য।

—আমি মিছিলে যাব না। বাবুয়া শান্ত স্বরে বলল।

—কেন জানতে পারি?

—ইচ্ছে।

—তাহলে কি ধরে নেব তুই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করিস?

—তা তো বলিনি।...মিছিলে না যাওয়া মানেই কি সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করা?

—আমরা তাই বুঝি।

—ভুল বোঝো। বাবুয়া আলতো করে কাঁধ থেকে ছেলেটার হাত নামিয়ে দিল।

এগোচ্ছিল, ছেলেটার কথা কানে এল,—দেখব কাল বুকনি কোথায় থাকে! কেমন না যাস!

আরেকটা গলা ভেসে এল,—কেন ইনডিভিজুয়াল অ্যাপ্রোচ করছিস? কাল গেট আটকে দেব। তারপর সব কটাকে লাইন দিয়ে বার করব।

বাবুয়া ঘুরে দাঁড়াল,—কাজটা কি মার্কিন হানাদারির চেয়ে আলাদা কিছু? নিজেদের ইচ্ছে জোর করে অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টাকে কী বলে? বলে একটু থামল। হাসল,—তোমরা যদি আমেরিকার জায়গায় থাকতে তা হলে ইরাক কেন, গোটা পৃথিবীটারই অস্তিত্ব থাকত না।

কথাটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে দু-এক সেকেন্ড সময় লাগল ছেলেগুলোর। তারপরই রে রে করে তেড়ে এসেছে,—কী বললি তুই? আমরা সাম্মাজ্যবাদী?

—উহুঁ। বলছি, অনর্থক জোর ফলানোটা উচিত কাজ নয়। মহৎ আদর্শের ধ্বজা উড়িয়ে করলেও নয়। বাবুয়ার হাসি ঈষৎ প্রসারিত হল। নরম স্বরে বলল, —মিছিল আমার ভাল লাগে না, ভাই। নিজেকে কেমন ভেড়ার পালের একজন বলে মনে হয়।

ছেলেগুলো মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে, একটু বুঝি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বাবুয়া আর দাঁড়াল না। হাঁটা শুরু করেছে। ক'পা যেতে না যেতেই তমাল। পাস-কোর্সের ছেলে, গত বছরই বাবুয়ার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, হিস্ট্রির ক্লাসে। শ্যামলা রং, রোগাসোগা চেহারা, মুখে সামান্য চোয়াড়ে ভাব আছে। টি এস বি নিখাদ বাংলাতেই ইতিহাস পড়ান, শুনতে শুনতে ইংরিজিতে রানিং নোটস নেয় বাবুয়া, দেখে তমাল ভারী অভিভূত হয়েছিল। পথেঘাটে ক্লাসে করিডরে যেখানেই মুখোমুখি হোক, দু পাঁচ দশ মিনিট বাবুয়ার সঙ্গে থাকবেই তমাল। এমন গুণমুগ্ধ, একটু স্তাবক ধরনের বন্ধুই বাবুয়া পছন্দ করে। এরা ঠিক বন্ধু হয় না, ভক্তর মতোই থাকে, হয়তো সেই জন্যই। স্কুলে পড়ার সময়ে টাউনের ছোটকু বিশে পার্থরাও ছিল এই শ্রেণীর। প্রায় লোফার হওয়ার দরুণই বাবুয়ার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। কলকাতায় এসে ওদের অভাব খুব অনুভব করত বাবুয়া, সেই অভাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তমাল কিছুটা মেটায়।

তমাল পান-দোকানের ঝুলন্ত দড়ির আগুন থেকে সিগারেট ধরাচ্ছিল। প্রায় লাফিয়ে বাবুয়ার পাশে এল,—কী ডায়ালগ দিলে গুরু!

বাবুয়া অবহেলার স্বরে বলল,—ডায়ালগ কীসের? যা সত্যি তা তো বলতেই হবে।

—তুমি পারো! আমার তো ওদের দেখলেই হাঁটু কাঁপে।

—ফুঃ, ওদের ভয় পাওয়ার কী আছে? যারা দল বেঁধে জুলুম করে, তারা কক্ষনও সাহসী হয় না।

—না রে, তুই জানিস না, ফার্স্ট ইয়ারের একটা ছেলেকে যা কেলিয়েছে! কী সাবস্‌ক্রিপশন না ডোনেশন দিতে চায়নি...!

—বলার টেকনিক আছে। ফোর্স শুড বি ট্যাকলড্ উইথ র‍্যাশনালিটি। উদ্ধত হবে না, কিন্তু মনের ইচ্ছেটা বোল্ডলি জানিয়ে দেবে। উইথ ইওর ওন লজিক।

তমাল ঘটঘট ঘাড় নাড়ল,—ঠিক বলেছিস।...কিন্তু পারি না গুরু। ইউ ক্যান।

তমালের বিচিত্র ইংরিজিতে হেসে ফেলল বাবুয়া। হাঁটতে হাঁটতে তমাল স্টিম ইঞ্জিনের মতো ধোঁয়া ছাড়ছে, বাবুয়ার নাকে মুখে ঢুকে যাচ্ছে ধোঁয়া। ওই গন্ধে তার তীব্র বীতরাগ, সেই শৈশব থেকেই। তার বাবা সিগারেট ছাড়া থাকতে পারে না বলেই কি? বোধ হয়।

ডান হাত নাকের সামনে ঝাপটিয়ে লঘু ধমক দিল বাবুয়া,—অ্যাই, তোকে বলেছি না, আমার সঙ্গে থাকার সময়ে সিগারেট খাবি না?

—সরি গুরু। আর দুটো টান দিয়েই...। তমাল লজ্জিত মুখে হাসল,—চললি কোথায় এখন? বাড়ি?

—আর কোথায় যাব?

—ছুটিটা হয়ে মাইরি হেব্‌বি লাভ হল। সন্ধেবেলা মামাতো দাদার বিয়ে, বরযাত্রীর নেমন্তন্ন, সেই শালকিয়ায়। ভেবেছিলাম বোধহয় আর যাওয়াই হবে না। যাক, পোবলেম সলভ হয়ে গেল।

—কী প্রবলেম?

—টিউশনি। বরযাত্রী গেলে টিউশনিটা শালা কামাই হয়ে যেত।

—তুই টিউশনি করিস? বাবুয়া ভীষণ অবাক হল। সে স্বচক্ষে দেখেছে, ইংরিজি দূরস্থান, বাংলাতেও একটি বাক্য শুদ্ধ লিখতে পারে না তমাল। সে কিনা ছাত্রছাত্রী পড়ায়!

তমাল দাঁত ছিরকুটিয়ে হাসছে,—অনেক দিন ধরেই তো পড়াচ্ছি। তোকে বলিনি বুঝি?

—কাকে...মানে কোন ক্লাস?

—ক্লাস থ্রি।

—কী পড়াস?

—অল সাবজেক্ট। বাংলা ইংরিজি ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক...

—দ্যায় কত?

—সত্তর।

—মাত্র? কদিন যেতে হয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—রোজই। সানডে বাদ।...কাল পরশু দু দিন যাওয়া হয়নি, আজ নাগা করলে টাকা কেটে নেবে।

কথায় কথায় আরও অনেক কিছু জানতে পারল বাবুয়া। তমাল নাকি ইলেভেনে পড়ার সময় থেকেই টিউশনি করছে। লিমিট ওই ক্লাস ফোর। এক সময়ে হাতে নাকি অনেকগুলো টিউশনি ছিল তমালের, ছ সাতটা বাচ্চাকে পড়াত, ইদানীং বাজার মন্দা যাচ্ছে। ওই ছাত্রীটি আছে, আর এক ছাত্র আছে ক্লাস ওয়ানের । দুটো মিলিয়ে একশো কুড়ি। তমালের হাত খরচের অনেকটাই উঠে যায়। তমালের বাবা দমদমের দিকে একটা ওষুধ কারখানায় কাজ করতেন, বছরখানেক হল স্বেচ্ছা অবসর প্রকল্পে বসে গেছেন। তমালের টাকা থেকে দু চার পয়সা সংসারেও ঢোকে। নিয়মিত না হলেও মাঝে মাঝে।

শুনতে শুনতে বাবুয়া বিমোহিত হচ্ছিল। অধম বন্ধুর ওপর এক ধরনের সম্ভ্রম জাগছিল তার। সামান্যতম বিদ্যার পুঁজির সদ্ব্যবহার করে পরিবারের জোয়ালে কাঁধ লাগাচ্ছে তো! এতটুকুনি হলেও নিজের মাটি তো আছে! তুলনায় বাবুয়া কী? একটা প্যারাসাইট ছাড়া কিচ্ছু না। প্যারাসাইটও নয়, টোটাল ননএন্‌টিটি। প্রায় অস্তিত্বহীন এক অস্তিত্ব। যতই বাবুয়া অপছন্দ করুক, সহপাঠীদের পিতৃপরিচয় না জানতে দিক, জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সে প্রতি মুহূর্তে টের পায় বরেণ্য বিজ্ঞানী প্রফেসার বোধিসত্ত্ব মজুমদারের ছেলে হয়ে থাকাটাই তার ভবিতব্য। বাবুয়া জীবনে যত সার্থকই হোক, লোকে আগে তাকে চিনবে বোধিসত্ত্ব মজুমদারের ছেলে বলে। অসহ্য। পরিবারের একজন কেউ দীপ্যমান হলে বাকি সকলকে তার আলোতেই আলোকিত হতে হবে, এ কেমন কথা? সূর্য আছে বলে কি অন্য নক্ষত্ররা দিনের বেলা মিথ্যে হয়ে যাবে?

বাবুয়া ভেবেছিল কলকাতায় চলে এলে ওই জ্যোতিষ্কের সর্বগ্রাসী আলো থেকে পরিত্রাণ পাবে। হা হতোস্মি, কারা বাস করে লেক টেরেসের বাড়িতে? ওখানে কেউ বা বোধিসত্ত্ব মজুমদারের প্রতিফলিত গরিমায় ডগমগ বাবা, কেউ গরবিনী মা, কেউ বা পুলকিত ভাইঝি। এমনকী কাকা যে কাকা, অত বড় একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির পারসোনেল ম্যানেজার, তারও প্রথম পরিচয় সে বোধিসত্ত্ব মজুমদারের ভাই। এক অতিকায় সার্চলাইটের আলোয় ঝলমল শুধু কয়েকটা সাধারণ মানুষ সকলে। অসহ্য!

নয় নয় করে কলকাতাতেও তো বাবুয়ার দেড় বছর হয়ে গেল, অ্যাদ্দিন সে নিজেই বা কী চেষ্টা করেছে ওই জ্যোতিষ্কের কক্ষপথের বাইরে আসার?

বাবুয়া অন্যমনস্ক ভাবে বলে উঠল,—এ সব টিউশনি তুই জোটাস কোথ্‌থেকে বল তো?

তমাল সিগারেটটা ফুটপাথে ফেলে পা দিয়ে চাপল,—জুটে যায়। কলকাতায় এ কাজটা এখনও মোটামুটি অ্যাভেলেবল।

—তাই বুঝি?...তা দে না আমাকে এক আধটা।

—করবি তুই?

—না করার কী আছে!

—তোর পড়াশুনোর ক্ষতি হবে না?

—বিকেলটা তো আমার ফাঁকাই পড়ে থাকে। তখনই না হয়...। কী রে, চুপ মেরে গেলি কেন? লাইনে কম্পিটিটার ঢুকতে দিতে চাস না?

—না মানে...তোর তো তেমন দরকার নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কী করে জানলি?

—দেখে যা মনে হয়। তমাল একটু সঙ্কুচিতভাবে বলল।

—সব দেখাটাই সত্যি নয়। মানুষের প্রয়োজনের অনেক লেভেল আছে। কারও পেটের তাড়না, কারও সেরিব্রাল ক্রাইসিস।...ও তুই বুঝবি না।

বউবাজার মোড়ে যানজট। সার সার ট্রাম দাঁড়িয়ে। ঠেলা রিকশা বাস ট্যাক্সি আর মানুষের ভিড়ে চারদিক থই থই। হেলে দুলে রাস্তা পার হল দুজনে। ফুটপাথ ধরল আবার। চরম কোলাহলের মাঝেও বাতাসে এখন ফুলের গন্ধ। দোকানের ফুল।

তমাল বলল,—সত্যিই যদি করতে চাস তো আছে। দুজনকে পড়াতে হবে এক সঙ্গে। ভাই বোন। ছেলেটা নাইন, মেয়েটা সেভেন।

—কত দেবে?

—বেশি পারবে না। দুজন মিলিয়ে ধর দুশো। শুধু অঙ্ক আর ইংরিজি।

বাবুয়া দমে গেল একটু। সে তেমন উড়নচণ্ডী স্বভাবের নয়, তার কোনও নেশা নেই, তবু শ'দুয়েক টাকা তার সাপ্তাহিক হাতখরচেই চলে যায়। একটা পছন্দসই বই কিনল, কি একটা দুটো গানের ক্যাসেট...।

ভাবনাটা আসতেই নিজেকে ধমকাল বাবুয়া। সে তো সেই বোধিসত্ত্ব মজুমদারেরই টাকা!

বলল,—কদিন পড়াতে হবে?

—তিনদিন। কথা বলে নিতে পারিস, দুদিনও হতে পারে। আমিই করতাম, আমাকেই ধরেছিল, কিন্তু...অঙ্ক. ইংরিজিটা হেববি বোর করে। বিশেষত অ্যালজেব্রা, জিওমেট্রি।

সাবজেক্ট নিয়ে বাবুয়া ভাবিত নয়, যদিও অঙ্কে তার এক চোরা বিবমিষা আছে। সেটাকে অবশ্য আমল দিল না এখন। বলল,—তুই তাহলে কথা বল।

—আজই গিয়ে দেখি চল। তমাল কবজি উলটে ঘড়ি দেখল,—এখন কি পাওয়া যাবে? যেতেও পারে। চল, ট্রাই নিয়ে দেখি।

—কোথায় রে?

—এই তো কাছেই। আমি যেখানে পড়াতে যাই। লেবুতলা পার্কের পাশে।

সুড়ুৎ করে বাঁয়ের গলিতে ঢুকে পড়ল তমাল। জটিল গোলকধাঁধার মতো রাস্তা। গলির গলি তস্য গলি পেরিয়ে একটা নোনা ধরা দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। অন্য বাড়িগুলোরও এখানে বয়স অনেক। সত্তর আশি একশো...। ঠাকুমার মাথায় মাখার নারকেল তেলের মতো গন্ধ বাড়িগুলোর গায়ে। এরকম ধরনের পাড়ায় বাবুয়া আগে কখনও আসেনি।

বাড়িটা দেখেও বাবুয়ার বেশ কৌতূহল জাগছিল। জরাজীর্ণ বটে, কিন্তু সামনেই এক প্রকাণ্ড লোহার দেউড়ি। জং ধরা ধরা। দেউড়ি ঠেলে ভেতরে ঢুকলেই অন্ধকার একটু গলিপথের পর বিশাল এক উঠোন। শ্যাওলা লাগা, ভিজে ভিজে। উঠোনের চারদিক ঘিরে সরু টানা বারান্দা। সেখানে পর পর ঘর। কোনও ঘরের দরজা হাট, কোনওটায় তালা, কোথাও পরদা ঝুলছে। সর্বত্রই মলিন ছাপ, তবু দেখে বোঝা যায় বাড়িটার এক সময়ে সুদিন ছিল। দরজা জানলাগুলো ইয়া বড় বড়, জানলায় আবার খড়খড়ি আছে, দোতলার স্যান্ডকাস্টিং করা রেলিঙে বাহারি কারুকাজ। বারান্দার মেঝেতেও লাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিমেন্ট, কালো স্কার্টিং করা, এখনও তার প্রাচীন ঔজ্জ্বল্য পুরোপুরি মরেনি।

গোটা কয়েক বাচ্চা ক্যালব্যাল করে ছুটোছুটি করছে বারান্দায়। সামলে সুমলে তাদের কাটিয়ে বাঁ ধারের একটা ঘরের দরজায় গিয়ে গলা খাঁকারি দিল তমাল,—কাকিমা? কাকিমা আছেন?

ফুল ছাপ পরদার ওপারে ঘরঘর সেলাই মেশিনের শব্দ হচ্ছিল। থেমে গেল,—কে?

—আমি। তমাল। মিঠুর মাস্টারমশাই।

মহিলা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। মাঝারি রং, মাঝারি গড়ন, বয়স চল্লিশের আশে পাশে। দেখতে তেমন সুন্দর নয়, তবে একটা আলগা লাবণ্য আছে। চোখ দুটি ভারী উজ্জ্বল, মণির রং কুচকুচে কালো। পরণে আটপৌরে তাঁতের শাড়ি, হাতে শাঁখা পলা নেই, কপালে সিঁদুরও না।

মহিলা কিছু বলার আগে তমাল বলে উঠল,—আপনি বুলটু রিন্‌টির টিউটর খুঁজছিলেন...এই যে এনেছি।

মহিলা শশব্যস্ত,—ও, তাই? আসুন আসুন।

বাইরের মালিন্যের তুলনায় ঘরের ভেতরটা বেশ পরিপাটি। ঘরটাও যথেষ্ট বড়। দেয়াল জানলা বর্ণহীন হলেও সাজানো আসবাব তাদের অনেকটা আড়াল করে দেয়। ডবল বেডের খাট আছে একটা, আলমারি, ড্রেসিংটেবিল, খান কয়েক চেয়ার, মোড়া...। টিভি, ফ্রিজও আছে। এত কিছুতেও ঘরটাকে জবরজং লাগে না।

তমাল একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল,—এ আমার ক্লাসমেট। শুদ্ধসত্ত্ব মজুমদার। দারুণ ব্রিলিয়ান্ট ছেলে।

মহিলা হাত জোড় করে নমস্কার করল,—বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

এত আপনি আজ্ঞে, এত নমস্কার টমস্কারে বাবুয়া আড়ষ্ট বোধ করছিল। মহিলা মার বয়সী না হোক কাকিমার বয়সী তো বটেই। বোকা বোকা হেসে বলল,—আপনি আমাকে তুমিই বলুন।

—ওমা ছি ছি, আপনি আমার ছেলেমেয়ের মাস্টারমশাই...। আমার মেয়ের কিন্তু একদম মাথা নেই। ছেলে ভাল, তবে বড় ফাঁকিবাজ। আপনাকে কিন্তু একটু কড়া হতে হবে মাস্টারমশাই।

তমাল বলল,—সে ভাবতে হবে না। শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের ভীষণ সিরিয়াস ছেলে। ওর চোখের দিকে তাকালে বুলটু প্যান্টে পেচ্ছাপ করে ফেলবে।...আগে যে পড়াত সে কিন্তু বড় ন্যাদোস ছিল কাকিমা। বাচ্চাদের সঙ্গে অত হাহা হিহি করলে বাচ্চারা মানে?

—না না, উনিও ভাল ছিলেন । মহিলা তমালকে থামিয়ে দিল,—আপনারা চা খাবেন তো? বসাই?

বাবুয়া চা খায় না। কিন্তু না বলল না এই মুহূর্তে। মুখে একটু গুরুগম্ভীর ভাব ফুটিয়ে বলল,—স্টুডেন্টরা কোথায়।

—ছেলের ডে স্কুল, চারটেয় ফিরবে। রিন্‌টি কোন ঘরে গেল দেখি। বলতে বলতে দরজায় গিয়ে গলা ওঠাল,—রিন্‌টি, অ্যাই রিন্‌টি?

বার কয়েক ডাকাডাকির পর খুব রোগা একটি মেয়ে দৌড়ে এসেছে। ঘরে ঢুকেই থমকে গেল। জুলজুল চোখে দেখছে তমাল বাবুয়াকে।

মহিলা বলল,—প্রণাম করো। ইনি তোমাদের মাস্টারমশাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবুয়া দ্রুত পা সরিয়ে নিতে যাচ্ছিল, তার আগেই মেয়েটা ঢুকুস করে একটা প্রণাম ঠুকে দিয়েছে। তমালকেও করল, তমাল প্রসন্ন মুখে হাত ছোঁয়াল রিন্‌টির মাথায়।

বাবুয়া গলা ঝাড়ল,—কোন স্কুলে পড়ো?

—তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যাপীঠ।

—তোমার দাদা।

—বরদাচরণ। আমাদেরই ডে। রিন্‌টি বেশ সপ্রতিভ উত্তর দিচ্ছে।

ঘরের পিছন দিকের ফালি মতো জায়গায় চলে গেছে মহিলা। সম্ভবত ওটাই রান্নাঘর। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে চা নিয়ে ফিরে এল। শুধু চা নয়, সঙ্গে অল্প চানাচুর বিস্কুটও এনেছে।

রিন্‌টিকে টুকটাক প্রশ্ন করছিল বাবুয়া। মহিলা জিজ্ঞাসা করল,—কেমন বুঝছেন ছাত্রীকে?

—মন্দ কী! ওকেও একটু খাটতে হবে।

—হাফ ইয়ারলিতে ইংরিজিটা খুব খারাপ করেছে। অঙ্কও ধার ঘেঁষে। ছেলেটা অবশ্য সবেতেই টায়ে টুয়ে পাশ।...ওদের নিয়ে আমার বড় চিন্তা মাস্টারমশাই। ছোট যখন ছিল, নিজেই নিয়ে বসতাম। এখন আর বিদ্যেতেও কুলোয় না, সময়ও নেই।

বাবুয়া চোরা চোখে তমালের দিকে তাকাল । প্রশ্ন জড়ো হচ্ছে মনে। মহিলা কি বিধবা? চাকরি বাকরি করে? তাহলে দুপুরবেলা বাড়িতে কেন?

মহিলা নিজেই কিছুটা উত্তর দিয়ে দিল,—সন্ধেবেলা যে ঘাড় ধরে পড়তে বসাব, তাই বা পারি কই! আমার তো বেশির ভাগ দিনই নাইট ডিউটি, সাড়ে ছটা সাতটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হয়। রাস্তাঘাটে আজকাল যা ভিড় জ্যাম...সেই আলিপুর অবধি যাওয়া...। দিনভর সংসারের কাজকর্মও রয়েছে...।

তমাল কচকচ করে বিস্কুট চিবোতে চিবোতে উদাস মন্তব্য ছুড়ল,—তা ঠিক। আপনার যা খাটুনি যায়...।

—হুঁ। আলগা মাথা নাড়ল মহিলা,—তা মাস্টারমশায়ের সঙ্গে সমস্ত কথাবার্তা হয়ে গেছে তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ও সব ঠিক আছে। তমাল চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বাবুয়াকে চোখ টিপল,—বল কী বলবি বলছিলি? তিন দিন নয়, দু দিন...।

—না না, আমি তিন দিনই আসব। বাবুয়া ঝটপট বলে উঠল,—আমি কিন্তু বিকেলের দিকে আসব। এই ধরুন সাড়ে চারটে পাঁচটা...।

—সেই ভাল। আমি থাকতে থাকতে এলে...। নইলে কে কোথায় কোন ঘরে গিয়ে বসে থাকবে...! আমি বেরিয়ে গেলেই তো সব নাচন শুরু করে দেয়। বিকেল বেলাটাই নয়... আপনি তা হলে সামনের সোমবার থেকেই...

আরও দু চারটে কথাবার্তা বলে বাবুয়ারা উঠে পড়ল । সঙ্গে সঙ্গেই নিজের টিউশনিতে গেল না তমাল, মোড়ে এসে সিগারেট ধরাল,—কী গুরু, চলবে তো?

—দেখা যাক। তমালের ধূমপানে বিরক্তি প্রকাশ করল না বাবুয়া। ঠোঁট টিপে বলল,—মহিলার বেশ সেন্স অফ কার্টসি আছে!

—তেজও আছে খুব। মীরা কাকিমাকে এ পাড়ার সব্বাই চমকায়।...কত বড় বংশের মেয়ে জানিস? দুর্গা মল্লিকের নাম শুনেছিস? বিশাল রইস্ আদমি ছিল। তার নাতনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—হুঁ। তা এ দশা কেন?

—গ্রহের ফের। কম বয়সে একটা লক্কা পায়রার সঙ্গে ভেগেছিল। লোকটা হেব্বি লুজ ছিল মাইরি। খেত, ঘুমোত, আর এদিক ওদিক মাগিবাজি করে বেড়াত। মীরা কাকিমা অনেক দিন সহ্য করেছে। দু দুটো বাচ্চা হওয়ার পরও যখন শোধরাল না, তখন ঘাড় ধাক্কা দিয়ে...। বাপের বাড়িতেও যায় না মাইরি। নার্সিং শিখে ছেলেমেয়ে দুটোকে মানুষ করছে। খুব খাটে। বয়স হার্ডলি থারটিফাইভ, এখনও কতটা জীবন স্ট্রাগল করতে হবে বল? তুমি গুরু ওর বাচ্চাদের একটু স্পেশাল কেয়ার নিয়ো।

হেঁটে ফেরার বাসনাটা ঝেড়ে ফেলল বাবুয়া, মৌলালির মোড়ে এসে বাসে উঠল। তিনটে বাজে, বাসে এখনও গাদাগাদি ভিড় হয়নি, জোড়া গির্জার কাছে এসে বসার জায়গাও পেয়ে গেল। সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে, অঘ্রাণের রোদ্দুর এখন আর তেমন চড়া নয়। থেকে থেকে বাতাস আসছে জানলা দিয়ে। শুকনো, নরম হেমন্তের বাতাস। ভাল লাগছিল।

সদ্য দেখে আসা পরিবেশটার কথা ভাবছিল বাবুয়া। তাদের ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের কোয়ার্টারস, কিংবা তাদের লেক টেরেসের বাড়ি, সবের থেকেই একেবারে অন্য রকম। একই বাড়িতে এক সঙ্গে কতগুলো পরিবার, তার আবার একটা মাত্র ঘরে মা ছেলে মেয়ে থাকে খায় শোয়, কোথাও দিয়ে এতটুকু সূর্য ঢোকে না—এভাবেও বেঁচে থাকে মানুষ! নার্সিং করে কত আর রোজগার করে মহিলা? দু হাজার? তিন হাজার? তাই দিয়েও তো দিব্যি মাথা উঁচু করে আছে!

নাহ্, তমাল আজ বেশ চমক দিয়েছে!

বাড়ি পৌঁছে আবার চমক। মা। একতলায় দাদু ঠাকুমার ঘরে বসে কথা বলছে, পাশে কাকিমা আর মিলি। আজকে কি আসার কথা ছিল মার? রোববার তো ফোনে কিছু বলল না?

সচরাচর এই ঘরে ঢোকে না বাবুয়া। ঢুকতে ইচ্ছে করে না। কেন কে জানে! দাদু ঠাকুমার দেয়ালে বাবার বিশাল ফোটো, রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছে বাবা, ঘরে পা রাখলেই ওই ছবিতে চোখ চলে যায়, সেই জন্যই কি?

আজ বাবুয়া পায়ে পায়ে দরজায় এল,—তুমি হঠাৎ?

—এলাম। রাখী পূর্ণ চোখে তাকাল,—কিছু কেনাকাটা আছে।

—ও।...থাকছ কদিন?

—দেখি। কাল তো আছিই।

মিলি হই হই করে উঠল,—আসল কথাটা বললে না জেম্মা?...জানো দাদাভাই, জেঠু একটা দারুণ ইনভিটেশান পেয়েছে। বার্লিনে। ওখানে একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স হচ্ছে...।কোন মাসে যেন গো জেম্মা?

— মার্চের ফার্স্ট উইকে।

—জেম্মাও যাচ্ছে। উইথ ফ্যামিলি ওরা ডাকছে।

—ও।...বাহ্, ভাল খবর। বাবুয়ার স্বর নিস্পৃহ।

দীপালি জিজ্ঞাসা করল,—গেলে কন্টিনেন্ট ট্যুর করে এসো দিদি। তোমার কোথাও তো তেমন যাওয়া হয়নি।

—দেখি, উনি যা মানুষ, নড়তেই চান না। হয়তো বার্লিনেই গেঁথে যাবেন। ওঁর কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরনো বন্ধুবান্ধব আসবে ওখানে, তাদের সঙ্গে দেখা হবে বলে এখনই বেশ এক্সসাইটেড।

প্রভাবতী প্রশ্ন করলেন,—তোমাদের কত দিনের জন্য যাওয়া বড় বউমা?

অরবিন্দ বললেন,—কদ্দিন আবার কী! বুদ্ধর যদ্দিন ইচ্ছে, তদ্দিন। ও কি কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করেই পালিয়ে আসতে পারবে নাকি? ইউনিভার্সিটিগুলো ওকে ছাড়বেই না।

—সেবার স্টেটসে গিয়ে দাদা চার মাস পরে ফিরেছিলেন, না দিদি?

—চার মাস কোথায়, ছ মাস। বলেছিলেন দু মাসে ফিরব। আমার তখন যা ভাবনা গেছে! একে ঠাণ্ডার জায়গায় গেলেন, তায় শীতকাল...।

বাবুয়ার উপস্থিতি যেন মুছে গেছে। অনুপস্থিত এক মানুষই এখন রয়েছে ঘর জুড়ে। নিঃশব্দে বাবুয়া দোতলায় চলে এল। প্যান্ট শার্ট বদলে আধশোওয়া হল বিছানায়, একটা বই নিয়ে। খিদে পাচ্ছে অল্প অল্প। কাকিমা এ সময়ে রোজ দোতলাতেই থাকে, বাবুয়া ফিরলেই ঘরে জলখাবার এসে যায়, আজ সে সম্ভাবনা কম। বাবুয়া অবশ্য চাইলেই পেয়ে যাবে, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলা বাবুয়ার ধাতে নেই। যাক গে যাক, ক্ষুধার্ত মানুষকে ভুলে ওরা এখন নয় বিদ্বান ভগবানকে নিয়েই পড়ে থাকুক।

বেশিক্ষণ কাটল না, রাখী এসেছে ঘরে। মৃদু সুরভি ছড়িয়ে বাবুয়ার মাথার পাশে বসল। হাত রেখেছে ছেলের বুকে।

বাবুয়া সোজা হল,—কিছু বলবে?

—তোর কী হয়েছে রে বাবুয়া? একদমই যাচ্ছিস না কেন?

—যাব।

—যাব যাবই তো শুধু বলে যাচ্ছিস। এত করে ডাকলাম, জন্মদিনেও এলি না।

—আমার জন্মদিন তেমন কোনও ইভেন্ট নয় মা।

—বললেই হল! তোর বাবা তোকে সেদিন খুব মিস করেছে। বার বার তোর কথা বলছিল।

—ফোনে বলেছ তো। শুনেছি।

—কত স্পেশাল রান্না হয়েছিল সেদিন! তোর বাবা খাচ্ছে, আর ছটফট করছে।...একটা স্পেশাল ডে, ছেলেকে কাছে পেলে বাবা কত খুশি হয়...।

মা কি বাবার দূত হয়ে এসেছে? অথবা শান্তি সংস্থাপনের স্বঘোষিত মসিহা? বাবার সঙ্গে তো বাবুয়ার কোনও দিনই কোনও সংঘর্ষ হয়নি, তবে?

বাবুয়া বইয়ের পাতায় চোখ রাখার ভান করল। মনে মনে বলল, বাবার কথা ছাড়ো মা। তোমার কথা বলো, তোমার কথা বলো।

ছয়

—কনগ্র্যাচুলেশন্‌স্ প্রফেসার মজুমদার।

—কীসের জন্য বলুন তো?

—থিয়োরিটিকাল ফিজিক্সের অত বড় একটা সিমপোজিয়ামে ইউ আর দা লোন ইন্ডিয়ান রিপ্রেজেন্টেটিভ। এ তো এক দুর্লভ সম্মান, নয় কি? অ্যাজ ইওর কলিগ আমি কত ইলেটেড ফিল করছি জানেন? অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রাউডও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আরে না, ও তেমন কিছু না। সাতসকালে প্রফেসর অজিত ব্যানার্জির প্রশস্তিবাক্যে বুঝি বা একটু লজ্জাই পেল বোধিসত্ত্ব। অস্বস্তিভরা মুখে বলল,—থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। তারপর বলুন, আপনার কী খবর? কবে ফিরলেন নর্থ বেঙ্গল থেকে?

—এই তো কালই। অজিত চেয়ার টেনে বসল,—ডিপার্টমেন্টে ঢুকেই আপনার খবর পেলাম। ভাবলাম একটু নক করে যাই...

প্রফেসার অজিত ব্যানার্জির সাবজেক্ট সলিড স্টেট ফিজিক্স, তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা নয়। বোধিসত্ত্বরই প্রায় সমবয়সি, এক-আধ বছরের বড়ও হতে পারে। একটু গপ্পোবাজ ধরনের মানুষ, প্রসঙ্গ থেকে ঘন ঘন প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। কটা ছেলে তার আন্ডারে রিসার্চ করতে এসেছে বলতে বলতে আলিপুরদুয়ারে জমির কাঠা কত, সেখান থেকে দুধের দাম আবার বাড়ল, শীতটা কেন জাঁকিয়ে পড়ছে না...। লোকটার সঙ্গে কথা বলার একটাই সুবিধে, বোধিসত্ত্বকে বেশি বাক্য ব্যয় করতে হয় না। মাঝে মাঝে হুঁ হ্যাঁ করে গেলেই হয়, অজিত একাই বকে যেতে থাকে। অসুবিধে অজস্র। সব চেয়ে বড় অসুবিধে, অজিত মিনিট পাঁচ-দশ ঘরে থাকলেই বোধিসত্ত্বর মাথা ধরে যায়। কথাও বলতে হয় হিসেব করে, মেপেজুপে। একটা বেফাঁস মন্তব্য হলেই গোটা ডিপার্টমেন্টে রাষ্ট্র হয়ে থাকে। অজিত কখনও কখনও বড় বেশি পাণ্ডিত্যও জাহির করে, বোধিসত্ত্বর যা একদম পছন্দ নয়।

বোধিসত্ত্বর টেবিলে খোলা বই। সে দিকে তাকিয়ে অজিত আলাপ প্রসারিত করল,—পড়াশুনো করছিলেন? ডিসর্টাব করলাম?

—ওই আর কী!...সেকেন্ড ইয়ার পি জি-র ক্লাস আছে, একটু প্রিপেয়ার করে নিচ্ছিলাম লেকচারটা।

—আপনি পারেনও বটে। কাদের জন্য এত খাটেন? ছেলেমেয়েরা আজকাল আর নলেজ চায় না প্রফেসার মজুমদার, দে আর ওনলি ইন্টারেস্টেড ইন এগজামিনেশান ওরিয়েন্টেড পড়াশুনো। চেয়ারের কাঁধে হাত ছড়িয়ে দিল অজিত,—এই তো, নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা নিয়ে এলাম।...দেখলাম তো ছেলেমেয়েগুলোকে, বেসিকস পর্যন্ত জানে না । স্পেকট্রাল লাইনের সিম্‌পল্ প্রশ্ন করছি, আর সব ভ্যাবাগঙ্গারামের মতো মুখ কুরে দাঁড়িয়ে আছে!

বোধিসত্ত্ব চাপা বিরক্তি অনুভব করল। অজিতের এই হামবড়া ভাবটা একেবারেই অসহ্য। পরীক্ষার সময় অজিত কীভাবে নাকাল করে ছেলেমেয়েদের তা পুরোদস্তুর জানা আছে বোধিসত্ত্বর। এখানে বিভাগীয় প্রধান হয় পালা করে। বছর তিনেক আগে বোধিসত্ত্ব ওই পদে ছিল, সেবার দেখেছে অজিতের সেট করা পেপার হাতে নিয়ে স্টুডেন্টদের কী নাজেহাল দশা! একটা মেয়ে তো পরীক্ষার হলেই অজ্ঞান হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে ওই পেপারে সেবার জেনারেল গ্রেস দিতে হয়েছিল। লোকটা বোঝে না, পরীক্ষার কোয়েশ্চেনটা তার জ্ঞানের বহর দেখানোর জায়গা নয়। ছেলেমেয়েরা যদি বিদ্বান হয়, নিজেদের অন্তরের তাগিদেই হবে । তাদের ফেল করিয়ে ধর্ষকামী সুখ পাওয়া যেতে পারে মাত্র, তার বেশি কিছু নয়।

অসন্তোষ চেপে বোধিসত্ত্ব বলল,—ক্লাস নেওয়ার আগে পড়াশুনোটা আমি নিজের জন্যই করি প্রফেসার ব্যানার্জি। নিজেকে পুরোপুরি তৈরি না করে ক্লাসে ঢুকতে আমার খুব আনইজি লাগে।...মনে হয় ছেলেমেয়েদের ঠকাচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অজিত দাঁত বার করে হাসল,—এই জন্যই বোধ হয় আপনি ছেলেমেয়েদের কাছে এত পপুলার!

বোধিসত্ত্ব উচ্চবাচ্য কিছু করল না । মনে মনে বলল, পপুলারিটির জন্য আমি পড়াশুনো করি না অজিতবাবু, অ্যাজ এ টিচার পড়ানোটা আমার রিলিজিয়ন। কোনও স্টুডেন্ট কখনও যদি ক্লাসে এমন কোনও প্রশ্ন করে, যার উত্তরের জন্য আমি নিজেকে প্রস্তুত করতে পারিনি, আমার নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়।

দুম করে কথার মোড় ঘুরে গেল অজিতের,—তা প্রফেসার মজুমদার, বার্লিন যাওয়ার জন্য আপনার পেপার রেডি?

—মোটামুটি।

—আপনি নাকি নতুন পেপার কিছু পড়ছেন না?

—ঠিক নতুনও নয়, আবার পুরনোও নয়। ফিজিকাল রিভিউতে লাস্ট যেটা পাবলিশড হয়েছিল, ওটাই মাজা ঘষা করছি। রিগার্ডিং ব্ল্যাক হোল নতুন কিছু আইডিয়া ইনকরপোরেট করছি...

—অর্থাৎ নতুন কাজ আছে, তাই তো?

— হ্যাঁ। তা আছে।

—অথচ প্রফেসার সামন্ত বলে দিলেন, আপনি নাকি পুরনো পেপারটাই পড়বেন! একই আইডিয়ার চর্বিতচর্বণ!...কোনও মানে হয় এই সব জেলাসির? কোথায় একই ডিপার্টমেন্টের লোক বলে গর্বে বুক ফুলে উঠবে, তা নয়...!

এবারও চুপ করে রইল বোধিসত্ত্ব। তার প্রতি এখানকার অধ্যাপককুলের প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা আছে, বোধিসত্ত্ব জানে। থাকতেই পারে। জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে নিজেদের যতই উন্নত প্রজাতির জীব মনে করুক না কেন, আদতে তারা মানুষ তো বটে। অর্থাৎ ষড়রিপুর দাস।

মাঝে মাঝে এ নিয়ে আহতও হয়েছে বোধিসত্ত্ব। কখনও বা সহকর্মীদের বঙ্কিম কটাক্ষে, কখনও বা শীতল ঔদাসীন্যে, কিন্তু তাই বলে এই লোকটার কথার ওপর ভিত্তি করে আলটপকা কমেন্ট করার মতন মূর্খ সে নয়। এই ডিপার্টমেন্টাল নারদটা এখন মানে মানে বেরিয়ে গেলে বাঁচে।

আলগাভাবে বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করল,—আপনার ঘড়িতে কটা বাজে প্রফেসার ব্যানার্জি?

—নটা দশ।

—দেখেছেন, আমার ঘড়ি পাঁচ মিনিট স্লো!...ক্লাসের টাইম তো হয়ে গেল!

ইশারাটা বুঝল অজিত। উঠে দাঁড়াল,—চলি তা হলে। মর্নিং-এ আমার আজ ক্লাস নেই, আফটারনুনেই আসব।

অজিত চলে যেতেই ঝটিতি বই-এর পাতায় ডুব দিল বোধিসত্ত্ব। এই সময়টায় তার বাহ্যজ্ঞান থাকে না, তবু যেন হালকা ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেল। ক্লাসের সময় হয়ে গেছে সত্যি সত্যি। এখন পর পর দুটো পিরিয়ড, আরেকটু সময় নিয়ে লেকচারটা তৈরি করতে পারলে ভাল হত। সপ্তাহে মাত্র গোটা আটেক ক্লাস নিতে হয়, পি-জি এম-ফিল মিলিয়ে, এটুকুতেও যদি নিষ্ঠায় ঘাটতি পড়ে যায়...! এতদিন ধরে পড়াচ্ছে, প্রায় একই বিষয়, তবুও কেন যে এখনও ক্লাসে যেতে বুক কাঁপে? কোনও অসামান্য ছাত্র তার জ্ঞানের পরিধির বাইরে কোনও বিচিত্র প্রশ্ন করে বসবে, এই আশঙ্কায় কি? নাকি প্রশ্নটার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশায়? কে জানে হয়তো সেই প্রশ্ন থেকেই নিজের মনের জিজ্ঞাসার কোনও নতুন দিগন্ত খুলে যাবে বোধিসত্ত্বর!

আজকের পড়ানোর বিষয় ভাবতে ভাবতেই বোধিসত্ত্ব অন্যমনস্কভাবে চেয়ার ছাড়ল। কিছু বই-এর র‍্যাক, স্টিলের ক্যাবিনেট আর চেয়ার টেবিলে সাজানো বোধিসত্ত্বর এই ঘরটা ডিপার্টমেন্টের একেবারে শেষ প্রান্তে, ক্লাসরুম এখান থেকে অনেকটা দূর। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোচ্ছে বোধিসত্ত্ব, খালি হাতে। সে কক্ষনও রোল কলের রেজিস্টার নেয় না। তার ক্লাসে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীরই পারসেন্টেজ বাঁধা। আসো, না আসো, পেয়ে যাবে।

ক্লাসে ঢুকেই অন্যমনস্কভাব কেটে গেল বোধিসত্ত্বর। আজ ছেলেমেয়েদের উপস্থিতি ভালই, চল্লিশ-বিয়াল্লিশ জন আছে, দেখে বোধিসত্ত্ব বেশ সতেজ সপ্রাণ বোধ করল। ভরাট কণ্ঠস্বরে শুরু করেছে বক্তৃতা। বোর্ডের পাশে চক ডাস্টার রাখা থাকে, লিখছে, মুছছে জটিল সমীকরণ। মিনিট পনেরো পরে থেমে গেল। তার পড়ানোর পদ্ধতিটা একটু অদ্ভুত। শুরুতে কিছুটা ধরিয়ে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পাশে চেয়ার টেনে এনে বসে পড়ে, কোনও একজন স্টুডেন্টকে বোর্ডে পাঠিয়ে দেয়, সেই তখন লেখে, আর বোধিসত্ত্ব ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একসঙ্গে বিষয়টা আলোচনা করতে থাকে। টুকরো টুকরো ভাবে বোঝায় কিছু, হঠাৎ হঠাৎ উঠে যায় বোর্ডে, আবার হয়তো কখনও বলে টানা দশ মিনিট, পনেরো মিনিট...

আজও একইভাবে ক্লাস এগোচ্ছিল। বোর্ডে চিরশ্রী, সামনের সারির জয়দীপ আর ভেঙ্কটরমনের মাঝখানে বোধিসত্ত্ব। কথার ফাঁকে হঠাৎই বোধিসত্ত্বর নজর গেল দয়িতায়। ফোর্থ রো-তে বসে একদম ফাঁকা চোখে তাকিয়ে আছে মেয়েটা! বুঝছে না কিছু? লাস্ট দিন ক্লাসে অ্যাবসেন্ট ছিল, লাইব্রেরি থেকে বেরনোর সময়ও কয়েকদিন দেখা হয়নি, হয়েছেটা কী? এমনিতে তো মেয়েটা ক্লাসে বেশ চনমনে থাকে!

বোধিসত্ত্ব স্বভাবগতভাবে তেমন কৌতূহলী নয়। অন্তত ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে। তবু আজ প্রশ্ন করে ফেলল,—হোয়াটস রং দয়িতা? তুমি কিছু শুনছ না মনে হচ্ছে?

দয়িতা নড়ে উঠল।

—কী হয়েছে তোমার? ফিলিং আনইজি?

—না স্যার। দয়িতা অস্পষ্ট স্বরে বলল।

—নো। সামথিং ইজ রং। তুমি কি বুঝতে পারছ না?

দয়িতা আবছাভাবে ঘাড় নাড়ল।

—বলো তো, হাউ দা স্ট্রেঞ্জনেস ইজ কনজার্ভড ইন দি ইভেন্ট অব ডিকে প্রসেস?

দয়িতা উঠে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েই আছে।

বোধিসত্ত্বর কপালে ভাঁজ পড়ল,—কী হল, চুপ করে আছ কেন? বলো।

দয়িতার ঘাড় আরও ঝুলে গেল। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে।

—তুমি কিন্তু ক্লাসে মনোযোগী হচ্ছ না দয়িতা। ইটস নট ফেয়ার। বোধিসত্ত্বর স্বর অপ্রসন্ন,—বোসো।

ঝুপ করে বসে পড়ল দয়িতা, কিন্তু অবনত মস্তক সোজা হল না।

বোধিসত্ত্ব আবার লেকচার শুরু করল। পড়াতে পড়াতে আরও কয়েকবার চোখ পড়ল দয়িতার দিকে। একইভাবে বসে আছে মেয়েটা, কাঠ হয়ে, সামান্যতম নড়াচড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যন্ত করছে না।

প্রায় দু ঘণ্টার ক্লাস। দেড় ঘণ্টা পর থেকেই অল্প অল্প ক্লান্ত বোধ করছিল বোধিসত্ত্ব। বয়সের জন্য কি? বোধিসত্ত্বর সেরকমই মনে হল, আজকাল এরকম হচ্ছে মাঝে মাঝে। ক্লাস ছেড়ে বেরনোর সময়ও দয়িতা একইভাবে বসে আছে দেখে বোধিসত্ত্বর একটু খারাপই লাগল। সে কি বেশি রূঢ় হয়েছিল মেয়েটার ওপর? ক্লাসে অমনোযোগী ছাত্রছাত্রীরা তাকে পীড়িত করে, কিন্তু সে তো কখনও মেজাজ হারায় না! এও কি বয়সের দোষ?

কী ভেবে ক্লাসরুমের দরজায় ঘুরে দাঁড়াল বোধিসত্ত্ব। ডাকল,—দয়িতা?

—হ্যাঁ, স্যার? দয়িতা ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল।

—তুমি একবার আমার রুমে এসো তো।

—কেন স্যার?

—এসো। যা বলছি শোনো।

রুমে ফিরে বোধিসত্ত্ব দেখল শামিম বসে আছে তার প্রতীক্ষায়। শামিম আহমেদ, বাংলাদেশের ছেলে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ ডি, বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে পড়ায়, বয়স বছর বত্রিশ, এখানে বোধিসত্ত্বর তত্ত্বাবধানে পোস্টডক্টরাল রিসার্চ করছে। ভারী মেধাবী ছেলে, অসম্ভব জ্ঞানস্পৃহা, মাত্র সাত মাসে বোধিসত্ত্বকে মুগ্ধ করে দিয়েছে শামিম।

কাজ নিয়ে কথা শুরু হয়ে গেল। কাল ও মহাশূন্য নিয়ে নিজস্ব কিছু চিন্তাভাবনা আছে শামিমের। যুক্তি দিয়ে বোঝাচ্ছে বোধিসত্ত্বকে, কয়েকটা ছোটখাটো গণনাও করে দেখাল। কয়েকদিন ধরেই চলছে আলোচনাটা, বোধিসত্ত্ব মোটামুটি সন্তুষ্টই।

বলল,—তোমার যা কাজ হয়েছে তাতেই তো স্বচ্ছন্দে একটা পেপার হয়ে যায়।

—হুঁ, তা হয়। নিচু স্বরে বলল শামিম, সে কখনও গলা ওঠায় না,—সত্যি বলতে কি স্যার, পেপার আমি একটা করেও ফেলেছি। যদি বলেন তো সোমবার আপনাকে মোটামুটি রাইট আপটা দেখিয়ে যেতে পারি।

—ভেরি গুড, লেট না করাই তো ভাল।

—ইচ্ছে আছে স্যার আমেরিকান জার্নাল অব থিয়োরিটিকাল ফিজিক্সে পাঠাব।

—পাঠাও। আমি ফরওয়ার্ডিং নোট দিয়ে দেব। বাট ওয়ান থিং, দিস উইল বি ইওর পেপার।

—কিন্তু স্যার...শামিম একটু চুপ থেকে বলল,—আমি যে ভেবেছিলাম পেপারটা আপনার আমার জয়েন্ট নামে পাবলিশ করব!

—কেন? আমি এ ব্যাপারে কোনও কাজ করিনি। ইউ হ্যাভ ডান ইট অ্যালোন।

—আপনার নাম থাকলে স্যার ব্যাপারটার ওয়েট বাড়বে।

দরজায় কেউ নক করছে,—আসতে পারি স্যার?

—কে?

—আমি দয়িতা।

মুহূর্তের জন্য নামটা মাথায় ঢুকল না বোধিসত্ত্বর, পরমুহূর্তেই মনে পড়েছে। ডাকল,—ও হ্যাঁ, এসো। ভেতরে এসো।

দয়িতা ঘরে ঢুকে একটু যেন জড়োসড়ো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধিসত্ত্ব বলল,—এক সেকেন্ড।...আগে শামিমকে ছেড়ে দিই। তোমার লাঞ্চের দেরি হয়ে যাবে না তো?

ঢকঢক দু দিকে ঘাড় নাড়ল দয়িতা।

—আফটারনুনে তোমার কটায় ক্লাস?

—দুটোয়।

—তা হলে তো সময় আছে। বলেই বোধিসত্ত্ব আবার শামিমের দিকে ফিরেছে,—হ্যাঁ, যা বলছিলাম।...শোনো, তোমার কাজ তোমার নামেই বেরবে। এটাই কাম্য। সেখানে আমার নামের লেজুড় যোগ করলে তোমার মর্যাদা বাড়বে না। সেকেন্ডলি, আমি যে কাজ করি না সেখানে আমি কোনওভাবে আমার নাম যোগ করতে দিই না। এটা অবশ্য খুবই চালু প্রথা, গাইডের নাম রিসার্চ স্কলারের পেপারের শোভা বৃদ্ধি করে। এবং তোমাদের গবেষণার সুবাদেই আমাদের পেপারের সংখ্যা বাড়ে। কিন্তু আমি বাজারচলতি রক্তচোষা সিস্টেমটা ঘোরতর অপছন্দ করি। তোমার ক্রেডিটটা তোমারই থাকলে আমার বেশি ভাল লাগবে।

বোধিসত্ত্বর স্বরে সরল ঋজুতা। শামিমের মুখ উজ্জ্বল হাসিতে ভরে গেল,—ও কে স্যার, তাই হবে । তবে রেফারেন্সে আমি আপনার কথা উল্লেখ করব স্যার।

—আচ্ছা আচ্ছা। দেখা যাবে। তুমি কাজটা কমপ্লিট করো তো।

শামিম খাতাপত্র গুছিয়ে উঠে পড়ল, দয়িতার দিকে তাকিয়ে সৌজন্যসূচক হাসি হাসল একটু।

দয়িতার মুখে হাসি ফুটল না । আরও যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে সে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঙুলের নখ খুঁটছে।

শামিম যাওয়ার পর একটা সিগারেট ধরাল বোধিসত্ত্ব। বহুক্ষণ পর মস্তিষ্কে ধোঁয়ার প্রবেশ, ক্লান্তি কেটে যাচ্ছে।

হাসিমুখে দয়িতাকে জিজ্ঞাসা করল,—হ্যাঁ বলো, তোমার সমস্যাটা কী?

দয়িতা অস্ফুটে বলল,—কীসের সমস্যা স্যার?

—তুমি তো ক্লাসে কখনও অমনোযোগী থাকো না?

দয়িতা নীরব।

—তুমি কি কোনও কারণে ডিসটার্বড আছ?

চোখ তুলেই নামিয়ে নিল দয়িতা।

—বলতে আপত্তি থাকলে বোলো না । বাট প্লিজ বি অ্যাটেনটিভ ইন মাই ক্লাস।

দয়িতা আবার চোখ তুলল, নামাল। ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল সামান্য,—স্যার...

—কিছু বলবে?

—স্যার, আমার বিয়ের ঠিক হয়েছে।

—ইজ ইট? বাহ্, এ তো ভাল খবর। বোধিসত্ত্ব গমগমিয়ে হেসে উঠল। হালকা কৌতুকের স্বরে বলল, —ওহ্‌হো, এইজন্যই এত উদাস? বরের কথা ভাবছিলে? হা হা হা।

দয়িতা নিরুত্তর।

—কবে বিয়ে? ফাইনালটা দিচ্ছ তো?

দয়িতা অস্ফুটে বলল,—এ বিয়েতে আমার মত নেই স্যার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ও, তাই বুঝি? বোধিসত্ত্ব থমকে গেল। ঘাড় দোলাল বুঝদারের মতো,—সেইজন্যই টেনশানে আছ?

দয়িতার চোখের ওঠাপড়াটা ঘটল আবার। উত্তর নেই।

—কী করে ছেলে? কেন অপছন্দ?

এবারও কোনও সাড়াশব্দ নেই।

—ও কে, ও কে। বোধিসত্ত্ব আলগা গলা বাড়ল,—বাড়ির লোকরা কি জোর করছে? অপছন্দ হলে জানিয়ে দাও, কোরো না বিয়ে।

—কিন্তু আমি যে...এতক্ষণে দয়িতার স্বর শোনা গেল,—আমি যে মত দিয়ে ফেলেছি।

এবার বোধিসত্ত্বই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। মেয়েটা কী চায়? একবার বলে মত নেই, একবার বলে রাজি হয়ে গেছি! স্ট্রেঞ্জ! নাহ, মেয়েদের নিয়ে কোনও সমীকরণ গড়া সম্ভব নয়। এতগুলো আননোন ফ্যাক্টর মেয়েদের মনে কাজ করে! এই তো রাখীও, ছেলে এলে একদিকে কী উল্লসিত, আবার কেমন যেন সিঁটিয়েও থাকে! এই প্রথম বিদেশ যাবে বলে উৎসাহী, না নিরুৎসুক, তাই কি বোঝা গেছে?

নাহ, মেয়েটাকে ডেকে পাঠানো ভুলই হয়েছে।

বোধিসত্ত্ব নিস্পৃহ স্বরে বলল,—তা হলে আর কী, চোখকান বুজে করেই ফ্যালো।

সহসা বিস্ফোরণ ঘটল যেন। দয়িতা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল,—আমি পারব না স্যার। কিছুতেই পারব না।

—কেন, বিয়ে না করতে পারার কী আছে? পড়াশুনোর কথা যদি ভাব, বিয়ের পরও কন্টিনিউ করতে পারো।

দু দিকে অস্থিরভাবে মাথা ঝাঁকাচ্ছে দয়িতা। অঝোরে জল গড়াচ্ছে দু গাল বেয়ে। বোধিসত্ত্ব বিচলিত বোধ করল, এত কাঁদে কেন মেয়েটা? বোধিসত্ত্ব কি মেয়েটার মনের কোনও স্পর্শকাতর জায়গায় আঘাত করে ফেলল?

অপরাধী অপরাধী মুখে উঠে এল বোধিসত্ত্ব। আলগা হাত রাখল মেয়েটার পিঠে,—আহা, শান্ত হও।...আমি কি তোমাকে কোনওভাবে হার্ট করেছি?

—করেছেনই তো। দয়িতার স্বর বদলে গেল । সজল চোখে স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছে,—আপনি কি কিছুই বুঝতে পারেন না।?

—না তো! কী?

—আপনিই দায়ী। আপনিই।..আপনার জন্যই আমি...

ছিটকে সরে গেল বোধিসত্ত্ব, যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে। দয়িতার দিকে আবার তাকাতেই কেঁপে উঠেছে আমূল। এ কী দৃষ্টি জ্বলে মেয়েটার চোখে? পাগল না কী? বলে কী মেয়েটা?

গম্ভীর স্বরে বোধিসত্ত্ব বলল,—যাও, হোস্টেলে চলে যাও।

চকিতে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে দয়িতা। এক সেকেন্ড স্থির থেকে স্বচ্ছ সবুজ ওড়নায় চোখ মুছে নিল। পায়ে পায়ে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল ক্ষণিক। আবছায়ামাখা গলায় বলল,—সরি স্যার।...তবে আমি কিন্তু মিথ্যে বলিনি।

—আঃ যাও। বোধিসত্ত্ব প্রায় চেঁচিয়েই ফেলল।

দয়িতার নিষ্ক্রমণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়েছে বোধিসত্ত্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেবিলে কনুইয়ের ভর, টিপছে কপাল, মাথা নিচু। অযাচিত এক আলোড়ন জাগছে বুকে। যেন ভূতলের অনেক গভীরে নড়ে চড়ে উঠছে কিছু, গোপন কন্দর বেয়ে তারই রেশ এসে পৌঁছচ্ছে ওপরে।

কেন এমন হচ্ছে?

প্রৌঢ়ত্বের দ্বারপ্রান্তে এসে এই ধরনের আবেগ কি বোধিসত্ত্বকে শোভা পায়?

দয়িতা একটা অল্পবয়সী মেয়ে, ঝোঁকের মাথায় কী বলতে কী প্রলাপ বকে ফেলেছে...! বোধিসত্ত্ব কষে ধমকাল নিজেকে। গোটা পরিস্থিতিটাকেই যুক্তির নিগড়ে বাঁধতে চাইল । অনেক মেয়েরই কি বাবার প্রতি অন্ধ ভালবাসা থাকে না? ইলেকট্রা কমপ্লেক্স? হয়তো দয়িতার এটাও সেই ধরনেরই কোনও অনুভূতি! তাইই হবে, অন্য কিছু হওয়া সম্ভব নয়। মেয়েটাকে সেও তো কক্ষনও আলাদা চোখে দেখেনি! দয়িতা তো তার কন্যাসমাই, নয় কি? ওই বয়সের মেয়েদের আবেগ নাকি লাগামছাড়া, এমনই কী একটা যেন বলেছিল না রাখী? আবেগ কি খুব ছোঁয়াচে, বোধিসত্ত্বও আপ্লুত হয়ে পড়ছে কেন? পড়ছে, নাকি পড়তে চাইছে?

দূর, ব্যাপারটা পুরোটাই ছেলেমানুষি। দয়িতার পাগলামিও আইডল ওয়রশিপ ছাড়া কিছু নয়। সিম্পল কেস অব মূর্তিপুজো। মেয়েটাকে নিয়ে এত ভাবাও এক ধরনের স্টুপিডিটি।

একা একাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল বোধিসত্ত্ব। ফাঁকা ঘরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে হাসি, ধাক্কা মারছে কানে।

বোধিসত্ত্ব থেমে যাওয়ার পরও মিলিয়ে গেল না হাসিটা। পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরতে লাগল। ঘুরতেই লাগল।

সাত

দুপুরে ক্লাস থেকে ফিরেই শুয়ে পড়েছিল দয়িতা। স্নান করতে উঠল না, খেতে গেল না, শুয়েই রইল। কম্বল মুড়ি দিয়ে। অনেকটা পালাজ্বরের রুগিদের মতো। কোলাহলমুখর হস্টেল এক সময়ে শূন্য হয়ে গেল, মেয়েরা সব যে যার চলে গেল দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্লাসে, দয়িতা তখনও শুয়ে। উঠল একবার, শেষ দুপুরে। অঘ্রাণের নরম রোদ্দুর মাখা নির্জন করিডোরে একা একা হাঁটল কিছুক্ষণ, আবার এসে গড়িয়ে পড়েছে বিছানায়। পেটের চনচনে খিদেটা কখন মরে গেছে, জড়িয়ে এল চোখ। কিন্তু ঘুম আসে কই! মাঝে মাঝে ছেঁড়া ছেঁড়া তন্দ্রা লেপটে যাচ্ছে চোখের পাতায়, মিলিয়েও যাচ্ছে। যা থাকছে তা হল এক আচ্ছন্নতার ঘোর। ঝিমধরা নেশা নেশা অনুভূতি।

এরই মধ্যে স্বপ্ন দেখছিল দয়িতা। স্বপ্ন, না দৃশ্য? সে জেগে আছে না ঘুমিয়ে তাই সে ঠাহর করতে পারছে না, স্বপ্ন আর দৃশ্যের তফাত সে বুঝবে কী করে! তা সে স্বপ্নই হোক, কি দৃশ্য, একই ছবি ফুটছে বার বার, যেন ভিডিও-রিপ্লে!...ধু-ধু মাঠ, দূরে এক আবছা বটগাছ। মাঠের মধ্যিখান দিয়ে হাঁটছে দয়িতা। মাঠটা দেখে মনে হয় রুক্ষ, কিন্তু দয়িতা পা ফেললেই কোত্থেকে যেন ঘাস গজিয়ে উঠছে মাঠে। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে ঘাস, ক্রমশ যেন মাঠটা শরবন হয়ে গেল। বটগাছটাও উঁচু হয়ে গেছে অনেক, প্রকাণ্ড এক দৈত্যের আকার ধারণ করেছে। দয়িতা কিছুতেই আর ঘাস ঠেলে এগোতে পারল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। হাঁপাচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।...এখানেই ছবি শেষ। আবার শুরু হচ্ছে নতুন করে।

কে চালায় ওই ভিডিও টেপ? কে টেপে অদৃশ্য বাটন?

পশ্চিমের সূর্য ডুবে গেল যথাসময়ে। আকাশে রঙের খেলা শেষ, তরল আঁধার ঘন হল সন্ধেয়। দয়িতার ঘরের উত্তরের জানলাটা খোলা, হুহু করে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে। দয়িতাকে স্পর্শ করছিল না সে বাতাস। মেয়েরা একে একে হস্টেলে ফিরল, কলকাকলিতে ভরে গেল চারদিক। দয়িতার কানে কোনও শব্দই ঢুকছিল না।

চিরশ্রী ঘরে ফিরে থমকে দাঁড়াল,—কী রে দয়ি, পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস যে? ক্লাসে গেলি না?

দয়িতা নির্বাক চোখে তাকাল।

চিরশ্রীর ভুরুতে ভাঁজ পড়ল,—কী হয়েছে রে তোর? শরীর খারাপ?

দয়িতা চেতনায় ফিরল। মাথা নেড়ে বলল,—নাহ।

—বললেই হল! তোর চোখমুখ কেমন লাগছে! জ্বর এসেছে না কি?

—না।

—মাথা ধরেছে? পেট ব্যথা?

—না।

—তা হলে শুয়ে কেন?

—এমনিই। দয়িতা হাতের পিঠে চোখ ঢেকে নিল। হৃদয়ের আন্দোলন লুকোনোর এটাই শ্রেষ্ঠ উপায়। কান্না আবেগ সুখ দুঃখ সবই তো প্রতিফলিত হয় ওই চোখেই। অস্ফুটে বলল,—ঠিক আছি রে।

—তা হলে ক্লাসে গেলি না কেন?

—ইচ্ছে করছিল না।

—স্ট্রেঞ্জ! এমন ইচ্ছের কারণ জানতে পারি?

—সব ইচ্ছের কি কারণ থাকে?

—অফকোর্স। আউট অফ নাথিং ইচ্ছে গ্রো করতেই পারে না। আর এটা তো ইচ্ছে নয়, অনিচ্ছে। খেয়েছিস?

—না।

—বি এম-এর ঝাড় খেয়ে খাওয়াও বন্ধ করে দিলি?

একটু কি কেঁপে উঠল দয়িতা? বুকটা কি চিনচিন করে উঠল হঠাৎ? বোধিসত্ত্ব কি সত্যিই তার সঙ্গে খুব নিষ্ঠুর আচরণ করেছিলেন? না, তাও তো ঠিক বলা যায় না। বরং একটু বুঝি নার্ভাসই হয়ে গিয়েছিলেন। ওই ঘাবড়ে যাওয়া ভাবটাকে কাটাতেই হয়তো অত জোরে...!

নীল শালে মোড়া চিরশ্রী নিজের বিছানায় গিয়ে বসেছে। এলোমেলো শয্যায় যত্রতত্র বই। জন গ্রিশামের একখানা বই খুলে পেজমার্কটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল একটু, রেখে দিল। কনুইয়ে ভর রেখে আধশোয়া হয়েছে,—তোর ব্যাপারটা ঠিক কী হয়েছে বল তো?

—কী আবার হবে? দয়িতা নিচু স্বরে বলল।

—বি এম তখন ডেকে কী বললেন?

—কিছুই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—শুধুমুদু ডাকলেন? কিছু না বলে ছেড়ে দিলেন? স্যারের কি সময় বেশি হয়ে গেছে?

দয়িতা উত্তরটা এড়িয়ে গেল। মিথ্যে মিথ্যে কিছু একটা বানিয়ে বলে দেওয়া যায়, কিন্তু তাতে এখন তার উৎসাহ নেই। সত্যি বলতে কি, মিথ্যে বলতে তার ভালও লাগে না। সে তো আর ওই শয়তান সৌমিকটার মতো দুমুখো সাপ নয়।

দেয়ালের দিকে পাশ ফিরল দয়িতা। টের পাচ্ছিল, চিরশ্রী বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, পায়চারি করছে, ঘুরে ঘুরে দেখছে তাকে। তার অন্য ইন্দ্রিয়রা এখন অসাড় বলেই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় প্রখর হয়েছে, কম্বল ফুঁড়ে চিরশ্রীর দৃষ্টি যেন বিঁধছে দয়িতাকে।

চিরশ্রী বিড়বিড় করে বলল,—তোর বিহেভিয়ারটা কী রকম যেন পিকিউলিয়ার হয়ে গেছে। অন্য বার বাড়ি গেলে নাচতে নাচতে ফিরিস, এবার এলি মুখ হাঁড়ি করে। ছত্রিশ বার খোঁচানোর পর জানা গেল তোর নাকি বিয়ের ঠিক হয়েছে! ভাল হয়েছে, কিন্তু তার জন্য এত আপসেট কেন? সন্ধেবেলা বেরোনোর জন্য তিড়িং বিড়িং করে লাফাতিস, কদিন ধরে গুম হয়ে ঘরে বসে আছিস! আজ ক্লাসে আনমাইন্ডফুল হয়ে ফালতু ফালতু ঝাড়ও খেয়ে গেলি! বিয়ের ঠিক হলে দুটো কারণে মানুষ আনমাইন্ডফুল হয়। এক, বর পছন্দ না হলে। আদারওয়াজ বরের চিন্তায় মজে থাকলে। তোর কেসটা কী?

দয়িতা কেঠো হাসল,—ধর, বরের চিন্তাতেই মজে আছি।

—সরি। ধরতে পারলাম না। বরের ভাবনায় কারও মুখ অমন নিমপাতা-খাওয়া হয়ে থাকে না।...বিয়েটাতে কি তুই অ্যাট অল ইন্টারেস্টেড নস? আর ইউ বিয়িং ফোর্সড টু ম্যারি?

দয়িতা বড় করে নিশ্বাস ফেলল। তপ্ত বাতাস বুঝি ছড়িয়ে গেল ঘরে, বুঝি চিরশ্রীকেও ছুঁল।

চিরশ্রী কাছে এসে টানল দয়িতাকে, নরম গলায় বলল,—অ্যাই দয়ি...অ্যাই?

—উঁ?

—কী হয়েছে? আমায় বল না।

—আমার ভাল্লাগছে না। কিছু ভাল লাগছে না।

—কেন রে? ছেলেটাকে পছন্দ হয়নি?

চিরশ্রীর সঙ্গে দয়িতার তেমন সখ্য নেই। মেয়েটার জ্ঞান দেওয়া স্বভাব, বিজ্ঞ বিজ্ঞ ভাব দয়িতার পছন্দ হয় না। তবু এই মুহূর্তে চিরশ্রীর কোমল স্বরে বুকটা কেমন হুহু করে উঠল। চোখ হঠাৎ জলে ভরে গেছে।

সে দিকে তাকিয়েই বুঝি উত্তর পেয়ে গেছে চিরশ্রী। দয়িতার গা ঘেঁষে বসে বলল,—বুঝলাম, কিন্তু তার জন্য এত ভেঙে পড়েছিস কেন?

—কী করব? দয়িতা জোরে নাক টানল।

—স্ট্রেট নেগেট করে দে।

—উপায় নেই।

—কেন?

—আশীর্বাদ হয়ে গেছে, ডেটও ফাইনাল। এইটিনথ জানুয়ারি।

—স্ট্রেঞ্জ! মেয়ের অমতে বাবা-মা বিয়ে দিয়ে দেবে? এটা কি মধ্যযুগ নাকি?

—জোর কেউ করেনি রে। দয়িতা ভেজা গলায় বলল,—আমিই সেভাবে অমত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিনি।

—সো হোয়াট? এখন না বলে দে।

—হয় না রে। এখন দু বাড়িরই মান সম্মানের প্রশ্ন এসে যাবে।

—বারে বা, বাবা-মার তুচ্ছ মানসম্মানের জন্য মেয়ের জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে? মানসম্মান আগে, না জীবন আগে?

এ প্রশ্নটা দয়িতাকেও কুরে কুরে খাচ্ছে। তবু যেন সে নৈতিক জোর পাচ্ছে না কিছুতেই। কী যে বুদ্ধিভ্রংশ হল তার? কেন যে সৌমিকের অফিসে ছুটল? কেনই বা সেই বজ্জাতটাকে দিয়ে কায়দা করে বিয়ে ভাঙাতে চাইল? কেন যে সে নিজেই তার অমতটা গেয়ে রাখল না?

চিরশ্রী উঠে জানলায় গেল। বাইরেটা দেখল একটু, বন্ধ করে দিল কাচের পাল্লা। ফিরে স্টিলের চেয়ারে বসে বিছানায় পা তুলে দিল।

গম্ভীর মুখে প্রশ্ন জুড়ল,—ছেলেটার সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছে?

—হুঁ।

—আগেই হয়েছিল? না এবারই হল?

—এবারই।

—কেমন ছেলে?

—ছেলেরা যেমন হয়।

—দেখতে কেমন?

—চলেবল্।...ভালই।

—করে কী?

—ফরেন ব্যাঙ্কের অফিসার। কস্টিং করেছে।

—অর্থাৎ পাত্র হিসেবে খারাপ নয়!

—বলতে পারিস।

—কথাবার্তা কী রকম? চালচলন?

—একটু টিমিড টাইপ।

—কেবলুস?

—কেবলুস নয়, সেয়ানাই। দেখায় ভালমানুষ।

—অর্থাৎ ডাবল ফেসেড ম্যান? এতক্ষণে যেন ক্লু খুঁজে পেল চিরশ্রী,—তোর কি এই কারণেই অপছন্দ?

—তা ছাড়া কী! দয়িতাও যেন যুক্তি পেয়ে গেল,—ও ধরনের মুখে এক, কাজে এক ছেলে আমার একটুও সহ্য হয় না।

—কী মুখে এক, কাজে এক আচরণ করেছে?

দয়িতা থমকে গেল। বলবে, কি বলবে না প্রথমটা ভেবে পেল না। শেষ পর্যন্ত দ্বিধা কাটিয়ে উগরেই দিল। ভারটা অন্তত লাঘব হোক।

বিনা মন্তব্যে শুনল চিরশ্রী। রীতিমতো মনোযোগ সহকারে। কাহিনী সমাপনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরেছে দয়িতাকে,—তুই ছেলেটাকে না দেখেই তাকে বাতিল করার জন্য মরিয়া হয়ে গেলি কেন?

—বললাম তো, বাবা-মার ঠিক করা পাত্র...নেগোসিয়েশান ম্যারেজ আমার ভাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগে না...

—বকোয়াস্। এ কথা তো তুই বাবা-মাকেই বলতে পারতিস।

—পারতাম। তবে...

—উঁহু, তোর লজিকটা তত টেনেবেল হচ্ছে না দয়ি। ইনফ্যাক্ট তুই যা বললি তাতে তো ছেলেটাকে বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। সেন্স অফ হিউমার আছে। তুই তাকে নিয়ে খেলতে চেয়েছিলি, পালটা চালে সে তোকে মেট্ করে দিয়েছে...। আমার তো মনে হয় দিস ইন্টেলিজেন্ট চ্যাপই তোর উপযুক্ত বর হতে পারে।

—অসম্ভব, কক্ষণও না। আমি ওকে বর ভাবতেই পারব না।

—কেন?

চোখ নয়, যেন সার্চলাইট ফেলল চিরশ্রী। আবরণ ভেদ করে দেখে নিচ্ছে দয়িতার হৃদয়ের অন্তঃস্তল। অস্বস্তি হচ্ছিল দয়িতার, মুখ ঘুরিয়ে নিল।

চিরশ্রী শব্দ করে হেসে উঠল,—লুক দয়ি, আমি জানি তোর কোনও আন্সার নেই। তুই এমন কিছু অ্যাকাডেমিক মাইন্ডেডও নস যে লেখাপড়া শেষ হচ্ছে না বলে একটা ছেলেকে ক্যানসেল করতে হবে। আবার আজীবন কুমারী থাকবি এমন বাসনাও তোর নেই। ইফ দিজ আর ট্রু, তখন হোয়াই নট দিস চ্যাপ?...অবশ্য একটা ফ্লিমজি গ্রাউন্ড তোর আছে।

দয়িতা সচকিত হল,—মানে?

—মুখ ফুটে বলতে হবে? চিরশ্রী ঠোঁটের কোণে নিয়ে গেল হাসিটাকে,—তুই মিলস অ্যান্ড বুনের পরে আর কোনও বই পড়িসনি দয়ি। এবং তোর মেন্টাল এজও বাড়েনি। এখন তোর চোখে পুরুষ মানে সামওয়ান এক্সট্রাঅর্ডিনারি, যার তুলনায় মেয়েরা একদম তুচ্ছ।

—কী মিন করতে চাইছিস?

—ওরে গাধা, স্যারের সঙ্গে তোর আর কদ্দিন দেখা হবে? চার-ছ মাস? মেরে কেটে এক বছর? তারপর তুইই বা কোথায়, বিএমই বা কোথায়? চোখের প্রেমে মন ভরে না রে দয়ি, ইউ নিড সামথিং ট্যানজিবল্। ওই প্লেটনিক লাভ এক দু-মাসই ভাল। বুদ্ধিমান মেয়েরা তারপরই টপ করে অন্য কাউকে বিয়ে করে নেয়। কদিন হয়তো খারাপ লাগবে, পরে নিজের ছেলেমানুষির কথা ভেবে নিজেই হেসে গড়িয়ে পড়বি।

দয়িতা ঝট করে উঠে বসল। সংশয় তো তার মনেও আছে, কেন সেটাকে উসকে দিচ্ছে চিরশ্রী? মন কি অত লজিক মেনে চলে? অনাগত সুখের কল্পনায় কেউ কি এই মুহূর্তের কষ্টটাকে উপেক্ষা করতে পারে?

শুকনো গলায় দয়িতা বলল,—তোর অনেক অভিজ্ঞতা আছে মনে হচ্ছে?

—অভিজ্ঞতার দরকার হয় না। কমন্ সেন্স আবেগে জেবড়ে না গেলেই বলা যায়।

—ঠিক আছে, যা। আমি ইমোশনে চলি, ইমোশনেই চলব। দয়িতা আবার কম্বলে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল।

চিরশ্রী এসে দয়িতাকে ঠেলল আবার,—অ্যাই পাগলি, চল চল, খাবি চল।

—আমার ভাল্লাগছে না। আমায় ডিস্টার্ব করিস না।

—পেট ঠাণ্ডা নেই বলেই তোর মুড খিঁচড়ে আছে। ডিনারটা নামিয়ে একটা স্ট্রোল মেরে আয়, চিত্ত একেবারে সতেজ হয়ে যাবে।...শুড্ডাটার সঙ্গেও একটা মিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোলাকাত করে আসতে পারিস।

—তুই যাবি এখান থেকে?

হাসতে হাসতে পালাল চিরশ্রী।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দয়িতা উঠে বসেছে। নাকের পাটা ফুলে গেছে তার, বিষণ্ণতার ওপর চেপে বসেছে এক ক্রোধের আস্তরণ। পলকের জন্য সৌমিকের মুখটা মনে পড়ল। কেন শয়তানি করল ছেলেটা? ছেলেটা অতি চতুর, না অতি নির্বোধ? একবারও কি বুঝতে পারেনি দয়িতার প্রস্তাবের মধ্যে প্রত্যাখ্যান লুকিয়ে আছে? একটা চিঠি লিখবে নাকি ছেলেটাকে? লিখলে হয়। ছেলেটার অন্তত জানা দরকার যাকে বিয়ে করার জন্য তার নাল পড়ছে সে অন্য একজনে আসক্ত। এবং সেই অন্য একজন কোনও হেঁজিপেঁজি নয়। হাজারখানা সৌমিককে জড়ো করলেও তার কড়ে আঙুলের সমান হবে না। তার পরও যদি কলজের জোর থাকে তো ছেলেটা তাকে বিয়ে করুক।

পরিকল্পনাটায় দয়িতা বেশ উত্তেজিত বোধ করল। ঝড়ের গতিতে টেবিলে এসে বসেছে, কাগজ টেনে লিখছে খসখস। দু লাইন লিখল, ছিঁড়ে ফেলল। আবার লিখল, আবার ছিঁড়ল। মনঃপূত হচ্ছে না ভাষা। কোনওটা বেশি রুক্ষ মনে হয়, কোনওটা বা অতি মোলায়েম। ঠিক কোন ভাষাতে লিখলে যে গায়ে জ্বালা ধরবে সৌমিকের, অথচ দয়িতাও খাটো হবে না? হচ্ছে না, হচ্ছে না...

ধুততেরি বলে উঠে পড়ল দয়িতা। কাগজগুলো দোমড়াল, মোচড়াল, ঠেসে গুঁজে দিল ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে। হঠাৎই আয়নায় চোখ পড়েছে। ইশ, কী চেহারা হয়েছে! চুলগুলো কাকের বাসা, চোখের নীচে কালি, ঠোঁট দুটো শুকিয়ে খটখট করছে। কার জন্য দয়িতার এই দশা? বোধিসত্ত্ব বোধিসত্ত্ব...! দয়িতাকে আবার বলে কি না যাও। কেন যাবে দয়িতা। দয়িতাকে হটিয়ে দেওয়া কি এতই সহজ? মোটেই না, মোটেই না।

গায়ে একটা শাল জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল দয়িতা। নিজের চাবিতে দরজা লাগিয়ে হনহন করিডোর পার হচ্ছে। মিনিট কয়েকের মধ্যেই পৌঁছে গেল ইউনিভার্সিটি গেটে। ক্যান্টিনের অদূরে বিশাল এক জারুল গাছ, তার তলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়েই আছে। ছায়া মেখে। ছায়ামানবী হয়ে। বেশ ভাল ঠাণ্ডা পড়ে গেছে এ অঞ্চলে, হাত পা হিম হয়ে আসছে, তবু স্থির দাঁড়িয়ে দয়িতা। লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে তিনটে ছেলে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে সামনে দিয়ে হেঁটে গেল, প্রফেসার তেওয়ারি চলেছেন লাইব্রেরিতে, দয়িতার দিকে কারুরই চোখ পড়ল না।

প্রায় আধ ঘণ্টাটাক প্রতীক্ষার পর তার দর্শন মিলল। দীর্ঘ ঋজু শরীর লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে। ঝটিতি নিজেকে আরও অন্ধকারে লুকিয়ে ফেলল দয়িতা। অধীর চোখে দেখছে তাকে। ক্যান্টিন পেরিয়ে একটু গিয়েই থামল বোধিসত্ত্ব, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, চোখ চালাচ্ছে অন্ধকারে।

কাকে খোঁজে? দয়িতাকে কি?

দয়িতার বুক ছলাৎ ছল। হ্যাঁ, খুঁজছেন স্যার। দয়িতাকেই। না হলে ওভাবে গেটের সামনে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়বেন কেন?

এক ছুটে মানুষটার কাছে পৌঁছে যেতে ইচ্ছে করল দয়িতার। কিন্তু গেল না। উদ্বেল হৃদয় নিয়ে দূর থেকে দেখছে বোধিসত্ত্বর ক্রিয়াকলাপ। সিগারেট ধরাল বোধিসত্ত্ব, বাড়ির পথে এগোচ্ছে এবার। ক'পা গিয়েই ঘুরে তাকাল। আবার হাঁটা শুরু করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তীব্র আনন্দের শিহরনে কাঁপছিল দয়িতা। বোধিসত্ত্ব দৃষ্টিসীমার আড়ালে যাওয়ার আগেই আঁধার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। মোহগ্রস্তের মতো চলেছে বোধিসত্ত্বর পিছু পিছু। আর একবার কি ফিরে তাকাবেন না তিনি? আর একটিবার?

না, পিছন ফিরছে না বোধিসত্ত্ব। সিগারেট শেষ করে ছুড়ে দিল রাস্তার ধারে, নতুন একটা ধরাল। দেখতে দেখতে পৌঁছে গেল বাড়ির গেটে। রোজকার মতো আলো জ্বলে উঠল বোধিসত্ত্বর বারান্দার, নিবেও গেল।

দয়িতার ফুসফুস নিংড়ে একটা লম্বা নিঃশ্বাস গড়িয়ে এল। শীতল চরাচরে এক কুচি উষ্ণ বাতাস।

আট

বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে খবরের কাগজ দেখছিল বোধিসত্ত্ব। রবিবার সকালটাই বোধিসত্ত্বর কাগজ পড়ার সময়। কাগজ পড়া সম্পর্কে বোধিসত্ত্বর এক বিটকেল ধারণা আছে, সপ্তাহের যে কোনও একদিন মন দিয়ে কাগজ ওলটালেই মোটামুটি সাত দিনের হালচাল বুঝে নেওয়া যায়। এ ব্যাপারে রবিবারই শ্রেষ্ঠ দিন, ইউনিভার্সিটি বন্ধ থাকে, এ দিন সময় কিছুটা শ্লথ গতিতে হাঁটে।

রবিবার তিন তিনটে কাগজ আসে বাড়িতে। ইংরিজি বাংলা মিলিয়ে। সব কটারই আদ্যোপান্ত গোগ্রাসে গেলে বোধিসত্ত্ব, এমনকি বিজ্ঞাপনও। কত যে মনোহরণ পণ্যসামগ্রী বেরিয়েছে আজকাল। টিভি ফ্রিজ ওয়াশিং মেশিন ইনভার্টার ভিসিপি ভিসিআর...। গাড়ির বিজ্ঞাপনও কত। দেখতে ভারী মজা লাগে বোধিসত্ত্বর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কী অদ্ভুতভাবে চাহিদা বদলে যায় মানুষের। বোধিসত্ত্বর মনে পড়ে তার শৈশবে, কৈশোরে, এমনকি যৌবনেও পাতাজোড়া রেডিওর বিজ্ঞাপন থাকত। ঠোঁটে আঙুল এক শিশু, তার পাশে রেডিও। বিজ্ঞাপনটা ভারী জনপ্রিয় ছিল, কী ধুম পড়ে গিয়েছিল সেই রেডিও কেনার। আশ্চর্য, এখনও পৃথিবী থেকে রেডিও নিশ্চিহ্ন হয়নি, অনেক বাড়িতেই শোনে, কিন্তু সেই বিজ্ঞাপন আর কোথায়!

আরও কত কী যে মনে হয়! বিজ্ঞানের ওপর ভর করে প্রযুক্তি গড়ে উঠছে, প্রযুক্তি তৈরি করছে বাসনা। এই বাসনা আবার তৈরি করছে চাহিদা। চাহিদার অন্তহীন খিদে মেটাতে নিত্যনতুন ছলাকলার আশ্রয় নিচ্ছে প্রযুক্তি, নিয়ন্তা বিজ্ঞান বনে যাচ্ছে প্রযুক্তির তাঁবেদার। ভূমিকাটাই বদলে যাচ্ছে বিজ্ঞানের। ছিল স্বপ্নদ্রষ্টা, হয়ে গেছে সুইচ। কোথায় যে এর শেষ কে জানে!

আজ বোধিসত্ত্বর একটা ছোট্ট খবরে চোখ আটকে গেল। ইংরিজি কাগজের ভেতরের পাতায় বেরিয়েছে। সানফ্রান্সিসকোর অদূরে এক পাহাড়ি গাঁয়ের বাসিন্দারা নাকি আবার ইউ এফ ও দেখতে পেয়েছে! শুক্রবার মধ্যরাতে এক টিলার ওপর নাকি নেমেছিল ফ্লাইং সসার, হরেক রকম চোখ ধাঁধানো আলোর খেলা দেখিয়ে আবার উড়ে গেছে! ওড়ার সময় নাকি এত শব্দ হয়েছে, পাশের পাহাড়টা থরথর করে কাঁপছিল। গ্রামবাসীরা ভয় পেয়ে চোখ বুজে ফেলেছিল। তাই কোন দিকে সসারটা উড়ে গেল তা তাদের দেখা হয়নি।

কাগজ মুড়ে রেখে হা হা হেসে উঠল বোধিসত্ত্ব। চেঁচিয়ে ডাকল—শুনছ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখী বাগানে। ফুলগাছের পরিচর্যা করছে। রূপচাঁদের দাদার বিয়ে, দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে পরশু সে মোহনপুর গেছে, কদিন এখন বাগান দেখার কাজ রাখীর। এক সার চন্দ্রমল্লিকা লাগানো হয়েছে, কচি কচি চারাগুলো ঝাড়া দিয়ে উঠেছে বেশ, গোড়ার মাটি ঝুরো করে আন্দাজ মতো তাতে সার মেশাচ্ছে রাখী।

মাটি ঘাঁটতে ঘাঁটতে ঘাড় ঘোরাল,—কী হল, এত হাসছ কেন?

—সেই কেস! আবার আমেরিকানগুলো ইউ এফ ও দেখেছে।

—কী ফো?

—ইউ এফ ও। আনআইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট। এ ক্ষেত্রে ফ্লাইং সসার।

—ও।

—আচ্ছা, শুধু আমেরিকানগুলোই ওগুলো দেখতে পায় কেন বলো তো? অন্য গ্রহের জীবরা কি শুধু আমেরিকানদেরই দর্শন দেয়?

রাখী বোকা বোকা মুখে তাকাল,—আমি কী করে বলব?...হয়তো অন্য গ্রহ থেকে আমেরিকাটা কাছে হয়।

বোধিসত্ত্ব আরও জোরে হেসে উঠল,—তুমি যে দেখছি আমেরিকানদের থেকেও স্টুপিড!

—আমি তো স্টুপিডই। রাখী হাসিমুখে সরে গেল গাছের কাছ থেকে। কোণের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল,—এই গাঁদার বেড এবার ওদিকটায় করলে কেমন হয়?

বোধিসত্ত্বর হাসি মরে গেল। খবরটা পড়ার আনন্দই মাটি। বিজ্ঞান সম্পর্কে চরম কৌতূহলহীন হয়ে কী করে যে এক বিজ্ঞানীর সঙ্গে এতদিন কাটিয়ে দিল রাখী!

—মন্দ কী, লাগাও। দায়সারা গোছের জবাব দিয়ে আবার কাগজে মন দিল বোধিসত্ত্ব।

—এবার কিছু প্যানজি লাগালে ভাল হয় না? রূপচাঁদ বলছিল ফিরে টাউনের বড় নার্সারিটা থেকে নিয়ে আসবে।

—ভালই তো।... ডালিয়া করছ না?

—ডালিয়া ছাড়া শীতের বাগান মানায়? ডালিয়া তো থাকবেই।

—গুড। যাও, চা নিয়ে এসো।... আর হ্যাঁ, বাথরুমে শেভিং সেটটা রেখে দাও, আমি এক্ষুনি দাড়ি কামাতে যাব।

—গরম জল লাগবে?

—না।

অপসৃয়মান রাখীকে দেখতে দেখতে বোধিসত্ত্ব ঠোঁটে সিগারেট লাগাল। তার হুকুম তামিল করার জন্য রাখীর চেয়ে যোগ্য আর বোধ হয় কেউ নেই। এত নির্দ্বিধায়, নিঃসাড়ে কাজ করে যায় যে, শুধু সেই কারণেই এক এক সময়ে বউটাকে বড় পানসে লাগে। পাপোশ, এক্কেবারে পাপোশ।

প্রথম শীতের লাজুক রোদ্দুর সিঁড়ি টপকে বারান্দা ছুঁয়েছে। উত্তুরে বাতাস বইছে সরসর, মৃদু শব্দ উঠছে গাছগাছালিতে, পাঁচিল ধারের নিমগাছের পাতারা ভীরু যুবতীর মতো কাঁপছে তিরতির। কোথাও একটা পিক পিক পাখি ডেকে উঠল। একদল আদিবাসী কামিন নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে চলে গেল ক্যাম্পাস গেটের দিকে। প্রত্যেকেরই মাথায় ঝুড়ি, হাঁটার ভঙ্গি ভারী স্বচ্ছন্দ, সূর্যরশ্মি ঠিকরোচ্ছে কালো চামড়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবিবারের সকাল আরও যেন একটু ফুটে উঠল।

বোধিসত্ত্বর মধ্যেও চারিয়ে যাচ্ছিল সকালটা। সিগারেট শেষ করে অলস মেজাজে হাঁটছে বাগানে, খালি পায়ে। শিশিরে ভিজে যাচ্ছে পা, ঘাসের ছোঁয়ায় বিচিত্র এক বিক্রিয়া হচ্ছে শরীরে, সতেজ চনমনে হয়ে উঠছে বোধিসত্ত্ব। গ্যারেজের সামনে এসে দাঁড়াল একবার। সাদা অ্যাম্বাসাডার যেন ঈষৎ মলিন। রূপচাঁদই রোজ ধোয়ামোছা করে গাড়ি, তার বিহনেই কি এই হাল? নিজে ধোবে আজ? একটু এক্সসারসাইজ হয় তা হলে। থাক গে, বোধিসত্ত্বর হাতে বালতি দেখলে রাখীই হয়তো কেড়ে নিয়ে...।

ভেতরে ফোন বাজছে। উৎকট ধ্বনি। বোধিসত্ত্ব কুপিত চোখে বাড়ির দিকে তাকাল। কে রে বেআক্কেলে এই মনোরম সকালটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে দিচ্ছে? বেশ কয়েক বার ঝনঝন করে থামল ঝঙ্কার। ক্ষণপরেই রাখীর আর্ত ডাক। প্রায় ছুটেই ঘরে এল বোধিসত্ত্ব।

টেলিফোনের সামনেই নীরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে রাখী। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করল,—কী হয়েছে? কার ফোন?

—বারাসত থেকে। রন্টুর। বাবার...

—কী হয়েছে?

—স্ট্রোক। আজ ভোরে। নার্সিং হোমে ভর্তি করেছে।

—কোথায়? বারাসতেই?

—তাই তো বলল। রাখী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল,—এবার কলকাতায় গিয়ে ভেবেছিলাম বাবার সঙ্গে দেখা করে আসব। কাজেকর্মে আটকে গেলাম... আর বোধ হয় হল না।

—আহা, এত উতলা হচ্ছ কেন? কী বলল রন্টু? কী কন্ডিশন?

—বলল তো বেশ সিরিয়াস। ইনটেনসিভ কেয়ারে রেখেছে। রাখী মুখে আঁচল চাপল,—থার্ড অ্যাটাক হয়ে গেল। এই সাতাত্তর বছর বয়সে আর কি বাবা সামাল দিতে পারবে?

শ্বশুরমশায়ের ওপর বোধিসত্ত্বর তেমন টান নেই। থাকার কথাও নয়। সূর্যকান্ত চৌধুরী বারাসত কোর্টের নামী ল'ইয়ার ছিলেন, তাঁর চিন্তাভাবনার জগৎ চিরকালই মক্কেল মোকদ্দমা মামলাকে ঘিরে, শ্বশুর জামাই-এর কোনও দিনই তেমন নৈকট্য তৈরি হয়নি। সূর্যকান্ত গুণী জামাইকে সমীহ করেন বটে, তবে একটু দূর থেকে। বোধিসত্ত্বরও শ্বশুরবাড়িতে যাতায়াত খুব কম। বরাবরই। তা ছাড়া সাতাত্তর বছর বয়সে কারও মৃত্যু ভীষণ একটা শোকাবহ ঘটনাও নয়। নিজের বাবা-মা মারা গেলেই কি এখন বোধিসত্ত্ব হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদবে?

তবু বোধিসত্ত্বর খারাপ লাগছিল। মৃত্যুর মধ্যে মানুষের যে গভীর অনস্তিত্ব লুকিয়ে থাকে, সেটা বড় পীড়া দেয় তাকে।

এগিয়ে গিয়ে রাখীর কাঁধে হাত রাখল বোধিসত্ত্ব,—মন খারাপ কোরো না। দেখো, এবারও উনি সারভাইভ করে যাবেন।

—বলছ?

—বলছি।...এক কাজ করো। তুমি লেট কোরো না, এক্ষুনি চলে যাও।

— তুমি যাবে না?

—আমি এক্ষুনি কী করে যাই! একটা কাজ হাফ-ফিনিশড হয়ে পড়ে আছে। তুমি

বরং রাতে একটা ফোন কোরো। যদি তেমন অবস্থা হয়...আশা করি হবে না...তাহলে কালই চলে যাব।

রাখী আঁচলে নাক মুছল,—রূপচাঁদ নেই, তোমার অসুবিধে হবে না? তোমার খাওয়া-দাওয়া, দেখাশুনো...

—ও নিয়ে ভেবো না। বোধিসত্ত্ব কাঁধ ঝাঁকাল,—সামহাউ ম্যানেজ করে নেব। দীনেশকে খবর দেব? গাড়ি বার করে তোমায় স্টেশনে দিয়ে আসবে?

—থাক, তুমি ওর বাড়ি চিনতে পারবে না। আমি রিকশাতেই চলে যাব।

ঘরে গিয়ে দ্রুত হাতে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে রাখী। তারই মধ্যে চা করল, জলখাবার বানাল, ফ্রিজে রাখা কাঁচা মাছ বার করে রান্না চড়িয়ে দিল। বোধিসত্ত্বর জন্য রান্নাবান্না গুছিয়ে রেখে পৌনে বারোটার ট্রেন ধরবে।

বোধিসত্ত্ব ব্রেকফাস্ট সারতে সারতে আবার খবরের কাগজে ডুবেছে, সাড়ে নটা নাগাদ দরজায় বেল। রাখী কাজে ব্যস্ত, নিজেই উঠে দরজা খুলল বোধিসত্ত্ব। দুজন অচেনা মানুষ। একজন বছর পঁয়ত্রিশের যুবক, গালে সযত্নলালিত দাড়ি, পরনে জিনস। অন্যজনের বয়েস একটু বেশি, কাঁধে ইয়া বড়ো এক ব্যাগ।

বোধিসত্ত্ব ভুরু কুঁচকোল,—কাকে চাই?

—আপনার কছেই এসেছিলাম স্যার। যুবকটি চামড়ার জ্যাকেটের পকেট থেকে কার্ড বার করে বাড়িয়ে দিল,—দৈনিক দিনরাত পত্রিকার সায়েন্স পেজের জন্য আমরা আপনার একটা ইন্টারভিউ নিতে চাই।

বোধিসত্ত্ব কার্ডটা দেখল না। নীরস স্বরে বলল,—অ্যাপয়েমেন্ট ছাড়া তো আমি ইন্টারভিউ দিই না।

—আমরা স্যার কাল অনেকবার আপনার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি, লাইন পাইনি। ডিসেম্বরে আমরা একটা স্পেশাল পুলআউট বার করছি। মহাবিশ্বের ওপর। আপনার সাক্ষাৎকার ছাড়া পুলআউট স্যার অসম্পূর্ণ থাকবে।

ছেলেটির কথাবার্তার ভঙ্গি বেশ বিনীত। সামান্য নরম হল বোধিসত্ত্ব। তবু কাটাতে চাইল ছেলেটাকে,—আমার যে ভাই আজ একটু অসুবিধে আছে। এক ক্লোজ রিলেটিভ খুব অসুস্থ, তাকে নিয়ে টেনশনে আছি...

—কিন্তু আমরা যে স্যার অনেক আশা করে এসেছিলাম...

পিছনের লোকটা বলে উঠল,—সেই কাকভোরে বেরিয়েছি স্যার। সেই সাড়ে পাঁচটার ট্রেন ধরেছি হাওড়া থেকে।

—আপনি যে ইন্টারন্যাশনাল সেমিনারে যাচ্ছেন, সে ব্যাপারেও কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল।

—আপনার খুব বড় ছবি দিয়ে ছাপা হবে স্যার। আপনার ইন্টারভিউই পুলআউটটাকে লিড করবে।

—বেশি সময় নেব না স্যার।

ওফ, পারেও বটে ঘ্যান ঘ্যান করতে। বোধিসত্ত্ব বিরক্ত মুখে বলল,—আসুন। বাট প্লিজ মেক ইট ব্রিফ।

সোফায় বসেই ছোট্ট টেপ রেকর্ডার বার করে ফেলল ছেলেটা। সাংবাদিকের চোখে বসার জায়গাটাকে জরিপ করে নিল। অন্যজন ঢাউস ব্যাগ নামিয়েছে কাঁধ থেকে, ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা রেডি করছে। পটাপট কটা শাটার মেরে নিল ঘরে, অনুমতি না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়েই। সম্ভবত আঙুল শুলোচ্ছিল।

বোধিসত্ত্ব রুক্ষ স্বরে বলল,—কোয়েশ্চেনেয়ার তৈরি করেছেন?

—মোটামুটি।

—শুরু করুন।

ছেলেটা সুইচ অন করল,—স্যার, প্রথমেই জানতে চাইব, মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণা করার প্রেরণা আপনি পেলেন কোথ্‌থেকে? আপনাদের পরিবারের কেউ কি এই গবেষণায় যুক্ত ছিলেন?

ছেঁদো প্রশ্ন। অনেক ম্যাগাজিনে আগে এর জবাবও দিয়েছে বোধিসত্ত্ব। সিগারেট ধরিয়ে ভাবলেশহীন গলায় বলল,—আমাদের বাড়িতে বিজ্ঞানচর্চার রেওয়াজ ছিল না। পড়াশুনোর চর্চা ছিল। আমার বাবা ছিলেন রেলের অফিসার, তবে অসম্ভব বই পড়ার নেশা ছিল তাঁর। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অত্যন্ত জ্ঞানস্পৃহা ছিল। আমার ইনকুইজিটিভ্‌নেসটা সম্ভবত বাবার কাছ থেকে পাওয়া। ...এ ছাড়া ছোটবেলায় আমার খুব ছাদে যাওয়ার নেশা ছিল। বিশেষত রাতে। অন্ধকার মহাশূন্যে আকাশভর্তি তারা আমায় ভীষণ টানত। কীভাবে এই তারাদের জন্ম হল, কেন সব তারারই একটি নির্দিষ্ট অবস্থান আছে, কীভাবে তারারা মুভ করছে, এ সব আমাকে দারুণ অবাক করত। স্পেশালি স্বর্গগঙ্গা, আই মিন ছায়াপথ। যা আকাশের এ পাশ থেকে ও পাশে চলে গেছে। বলতে পারেন, তখন থেকেই আমার সৃষ্টি নিয়ে কৌতূহল।

পর পর আরও কয়েকটা রুটিন প্রশ্ন করল ছেলেটা। বাঁধা গতের উত্তর দিল বোধিসত্ত্ব। মিছিমিছি সময় নষ্ট হচ্ছে, বোধিসত্ত্বর বিরক্তি বাড়ছিল। পাতা ভরানোর জন্য তার মুখ থেকে কিছু কথা আউড়ে নেওয়া কি এত জরুরি?

একসময়ে অসহিষ্ণুভাবে বলল,—আপনি আমার কাজটা সম্পর্কে কি কিছু জানেন?

—হ্যাঁ, জানি বইকী। ছেলেটার চটজলদি উত্তর,—আপনি এখন ব্ল্যাক হোল নিয়ে কাজ করছেন।

—সে নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই?

—আছে স্যার। ছোট্ট একটা চিরকুট বার করে দেখে নিল ছেলেটা,—আসছি স্টেপ বাই স্টেপ।...আপনি স্যার ব্ল্যাক হোলের কনসেপ্টটা পেলেন কোথ্‌থেকে?

—কনসেপ্টটা তো আমার নয়। আমি শুধু কনসেপ্টটাকে একটু ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি।

—কীভাবে করছেন তা যদি একটু বলেন স্যার?

—এটা তো নিশ্চয়ই জানেন, ব্ল্যাক হোলকে যতটা কালো বলে কল্পনা করা হচ্ছে, আসলে সেগুলো ততটা কৃষ্ণ নয়। ইনফ্যাক্ট, ব্ল্যাক হোলের সাইজ ক্রমশ রিডিউস করছে, এবং তাদের কেউ কেউ উবেও যাচ্ছে। উবে যাওয়ার পর কৃষ্ণ গহ্বরগুলো কীসে পরিণত হচ্ছে, সেটা এখনও নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। সৃষ্টিরহস্যকে জানতে গেলে এটা জানা অত্যন্ত জরুরি। আমার এখন সব ভাবনাচিন্তা এই বিষয় নিয়ে।

—অর্থাৎ আপনি কৃষ্ণ গহ্বরের উবে যাওয়ার রহস্য উদ্ঘাটিত করতে চান, তাই তো?

বোধিসত্ত্বর চোখ কুঁচকে গেল। ছেলেটা কি কোনও হিরে চুরির রহস্য উদ্ঘাটনের কথা ভাবছে নাকি? প্রশ্নটাই কেমন যেন লঘু ধরনের। একটু কড়াভাবেই বোধিসত্ত্ব উত্তর দিতে যাচ্ছিল, রাখীকে চোখে পড়ল। ইশারায় ডাকছে রাখী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধিসত্ত্ব উঠে গেল,—কী বলছ?

—মাছের ঝোল করে রাখলাম। আজ কাল দুদিনের মতো। আলাদা আলাদা বাটিতে ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি। গরম করে খেয়ো।

—হুঁ।

—ওবেলা কি ভাত খাবে? তা-হলে বেশি করে চাল বসাব। না হলে কিন্তু বাইরে থেকে রুটি এনে নিতে হবে।

কথাগুলো ভাল করে মাথায় ঢুকছিল না বোধিসত্ত্বর। ব্ল্যাক হোলের সঙ্গে ভাত মাছের ঝোল, কী বিচিত্র কম্বিনেশন। অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নেড়ে দিল,—যা ভাল বোঝো করো।

—আমি তা হলে চানে ঢুকে যাচ্ছি।

—যাও।

ফিরে এসে বোধিসত্ত্ব আবার সোফায় বসল। কাগজের ছেলে দুটো অনেক দূর থেকে এসেছে, বকবকও করছে অনেক, উঠে গিয়ে রাখীকে বলে আসবে চা দিতে? থাক গে, রাখীর আজ মন খারাপ, তাড়াহুড়োও আছে, অনর্থক চাপ না বাড়ানোই ভাল। অন্য দিন হলে রাখী তো নিজেই এতক্ষণে...

ছেলেটা একটু বাধো বাধো গলায় বলল,—স্যার, আপনার অনেকটা মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম। আর একটা দুটো প্রশ্ন আছে।

—বলুন।

—সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর নিয়ে আপনার কিছু নিজস্ব ধ্যানধারণা আছে, আমরা জানি। তাই নিয়ে যদি কিছু বলেন...

—আমার ভাবনার সঙ্গে সাধারণ মানুষের ভাবনা মিলবে না। আমি ঈশ্বরে কণামাত্র আগ্রহী নই। আমি শুধু তাঁর মেজাজমর্জি বুঝতে চাই। ঈশ্বর এখানে আমার কাছে নেহাতই একটা টার্ম মাত্র। এই সৃষ্টিটা আদৌ হল কেন, এর কী প্রয়োজন ছিল, এই সব চিন্তার মধ্যে হয়তো আপনাদের ঈশ্বরের স্থান থাকলেও থাকতে পারে।

—কিন্তু স্যার, ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলে মানুষের নৈতিক ব্যাপার-স্যাপারগুলোর কী হবে?

—ওটা আমার ফিজিক্সের আওতায় পড়ে না। মানুষের নৈতিকতা নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই।... তবে হ্যাঁ, ফিজিক্সের মধ্যে দিয়ে, অঙ্কের মধ্যে দিয়ে আমি একটা র‍্যাশনালিটির সন্ধান পাই। মানুষের জীবনে তার প্রয়োজন থাকলেও থাকতে পারে।

—স্যার, লাস্ট প্রশ্ন। কোনও মহাকাশযান যদি কখনও ব্ল্যাক হোলের মধ্যে পড়ে যায়, তা হলে সত্যিই কি তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? মানে ওই গর্তটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে কি?

ব্রহ্মতালু জ্বলে গলে বোধিসত্ত্বর। ব্ল্যাক হোল মানে গর্ত? এতক্ষণ ধরে যা বললেন, সবই বেনা বনে মুক্তো ছড়ানো? সাংবাদিকরা সাধারণত পল্লবগ্রাহী ধরনেরই হয়, নিজেদের যতটা চালাক আর জ্ঞানী বলে প্রতিপন্ন করতে চায় তারা মোটেই তা নয়। বোধিসত্ত্ব জানে। কিন্তু ইন্টারভিউ নিতে এসেও এমন মূর্খের মতো উক্তি করবে? এ কি মহাকর্ষ শব্দটারও অর্থ জানে?

গম্ভীর মুখে বোধিসত্ত্ব বলল,—এর উত্তর আপনাদের কোনও সায়েন্স ফিকশনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বইতেই পাবেন।

আশ্চর্য, ছেলেটা কথাটার অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গটাও বুঝল না। খুশি খুশি মুখে টেপ বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়েছে,—তা হলে কটা স্ন্যাপ নিয়ে নিক স্যার?

বোধিসত্ত্ব হ্যাঁ না কিছু বলল না। ফটোগ্রাফার লোকটা নিজেই নানা রকম পোজ দিতে দিতে গোটা চারেক ছবি তুলল। আলোর ঝলকানিতে চোখ বুজে ফেলল বোধিসত্ত্ব।

দুই মূর্তিমান বেরিয়ে যাওয়ার পরই বোধিসত্ত্বর মাথায় একটা আইডিয়া খেলে গেল। কৃষ্ণগহ্বর, মহাবিশ্ব নিয়ে এরা কী লিখবে তা তো বোঝাই যাচ্ছে, এদের লেখা পড়েই সাধারণ মানুষের ভাবনাগুলো আরও জট পাকিয়ে যায়। নিজে একটা বই লিখলে কেমন হয়? সহজ সরল ভাষায়? অনেকটা পপুলার সায়েন্সের মতো করে? অঙ্ক টঙ্ক নয় তেমন নাই দিল, ব্যাপারগুলো কি বোঝানো যাবে না? বাংলায় লিখবে? না ইংরিজিতে? বাংলাই ভাল। কোথা থেকে শুরু করা যায় বইটা? নিউটন, গ্যালিলিও, নাকি আইনস্টাইন?

নিমগ্ন ভাবনার মাঝেই রাখী বেরিয়ে গেল। কাগজ নিয়ে বইটার একটু আধটু খসড়াও করে ফেলল বোধিসত্ত্ব। কোন অধ্যায়ের পর কোন অধ্যায় যেতে পারে, কোন কোন ডায়াগ্রাম ব্যবহার করা যায়, এই সব।

হুঁশ ফিরল খিদের ডাকে। ঘড়িতে চোখ পড়তেই লাফিয়ে উঠেছে। একটা বাজে, এক্ষুনি লাইব্রেরি ছুটতে হবে। হকিং রেডিয়েশান থেকে একটা নতুন চিন্তার সূত্র পেয়েছে বোধিসত্ত্ব, ভাবনাটাকে আরও এগোতে হবে আজ। বাড়িতে বসেও করা যায় কাজটা, তবে লাইব্রেরিতে ইন্টারনেট আছে...

ঝড়ের গতিতে স্নান খাওয়া সেরে বোধিসত্ত্ব বেরিয়ে পড়ছিল, হঠাৎ খেয়াল হল বাড়ির দরজা জানলা সব খোলা। এত দরজা জানলা বন্ধ করা যে কী ঝকমারি! লাইব্রেরিতে পৌঁছতে পৌঁছতে আড়াইটে বেজে গেল। ঘণ্টা দুয়েক দানোয় পাওয়া মানুষের মতো খাটল বোধিসত্ত্ব, তবু তেমন কাজ এগোল না। কোথায় যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এমন প্রায়শই হয়। ব্যাপারটাকে বোধিসত্ত্ব বিশেষ আমল দিল না। সে কাজ করে প্রধানত ইনট্যুইশনের ওপর। আগে কিছু ভেবে নেয়, পরে ভাবনাকে আঙ্কিক পদ্ধতিতে মেলায়। আজ বোধ হয় ভাবনাতেই ভুল ছিল।

লাইব্রেরি ছাড়ার আগে বোধিসত্ত্ব মগজটাকে সাফ করে নিল। ভ্রান্ত চিন্তা মাথায় জমে থাকলে পরদিন কাজ করা কঠিন হয়ে ওঠে। আগামীকাল বাকি জীবনের প্রথম দিন, কাল নয় আবার গোড়া থেকে শুরু করা যাবে।

বাইরে এক মায়াবী বিকেল। আকাশে হালকা নীলের আভা। সূর্য এখন গাছগাছালির ওপারে, তার শেষ আলো মেখে বিশ্ববিদ্যালয় ভবন যেন সোনামোড়া হর্ম্য। পাতায় পাতায় কাঁচা হলুদের ছোঁয়া। মাঝ আকাশে ভেসে রয়েছে এক সাদাটে চাঁদ। যেন চাঁদ নয় সে, চাঁদের ছায়া। পড়ন্ত বিকেলের রূপ দেখছে চাঁদ। চোরের মতো।

ইউনিভার্সিটি গেটে এসে বোধিসত্ত্ব দাঁড়িয়ে পড়ল। ঠিক এই স্থানটিতে এসে আজকাল কেমন যেন বৈকল্য জাগে সহসা। অজান্তেই চোখ ঘুরে যায় পিছনে, আশেপাশে। আজ ছুটির দিন, চারদিকে ছেলেমেয়েরা ঘোরাঘুরি করছে। না, এদের মধ্যে নেই সে। দয়িতা নামের মেয়েটা কি সে দিনের পর থেকে উবে গেল? আজ নিয়ে চারদিন হল, একবারও ইউনিভার্সিটিতেও দেখা পাওয়া গেল না তো? বেশ লাগত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটাকে। ভারী সুন্দর এক রিনরিন সুরে কথা বলে, তাকিয়ে থাকে মুগ্ধ চোখে, পাশে এলে মনে হয় যেন তাজা প্রাণের সৌরভ ছড়িয়ে গেল। খুব আহত হয়েছে কি দয়িতা? তাকে এড়িয়ে চলছে? এখন নিজেরও যে কেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে? অযথা রূঢ় না হয়ে মেয়েটাকে আরেকটু কি বোঝানো উচিত ছিল সে দিন? কীই বা বোঝাত? নিজেরই বুকটা কেঁপে উঠেছিল যে!

ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে হাঁটা শুরু করল বোধিসত্ত্ব। বাড়ি ঢোকার মুখে মুহূর্তের জন্য রাখীর কথা মনে পড়ল। একা চলায় মোটামুটি অভ্যস্ত রাখী, নিশ্চয়ই ঠিক মতোই পৌঁছেছে। শ্বশুরমশাই এখন কেমন কে জানে! কিছু একটা হয়ে গেলে ছুটতেই হবে, কোনও মানে হয়!

অনেক দিন পর স্বহস্তে গ্যাস জ্বালিয়ে বোধিসত্ত্ব চা করল। লিকার চা। দুধ চিনি ছাড়া। ঈষৎ অবসন্ন ভাব লেগে আছে শরীরে, এতেই কাটবে। টিভি চালিয়ে সোফায় বসে চায়ে চুমুক দিল। চিরাচরিত অভ্যাসে হাত ঢুকিয়েছে পকেটে, ওমনি মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। যাহ, একটাও সিগারেট নেই।

ঝুঁঝকো আঁধার নেমেছে। সিগারেট কিনে ফিরছে বোধিসত্ত্ব, হাতে টর্চ। গেট খুলে আংটা লাগাতে গিয়ে হঠাৎই খানিক দূরে চোখ আটকে গেল।

বোধিসত্ত্ব গলা ওঠাল,—কে? কে ওখানে?

সাড়া নেই।

টর্চের আলো ফেলল বোধিসত্ত্ব। এবং হকচকিয়ে গেল, —তুমি! তুমি এখানে?

অন্ধকার লাইটপোস্টের নীচে ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দয়িতা বুঝি কুঁকড়ে গেল। অস্ফুটে বলল কী যেন, বোধিসত্ত্ব শুনতে পেল না।

গলা খাঁকারি দিয়ে বোধিসত্ত্ব বলল,—ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? এসো, ভেতরে এসো।

বাধ্য ছাত্রীর মতো বোধিসত্ত্বকে অনুসরণ করল দয়িতা। ঘরের দরজায় পা রেখেও দাঁড়িয়ে পড়েছে।

বোধিসত্ত্ব আবার বলল,—কী হল? এসো।

আড়ষ্ট পায়ে ঢুকল মেয়েটা। বসল না সোফায়, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

দয়িতার আড় ভাঙাতেই বোধিসত্ত্ব স্বচ্ছন্দ গলায় বলল,—চা খাবে নাকি? যদি লিকার চলে তো এক্ষুনি করে দিতে পারি। দুধ চা হলে টাইম লাগবে।

দয়িতার চোখে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন।

হা হা হেসে উঠল বোধিসত্ত্ব,—মিসেস নেই। কলকাতা গেছে। আমার এখন সেলফহেল্পের পালা চলছে।

দয়িতা ঢোক গিলল,—আপনি একা?

—মানুষ তো একাই দয়িতা। জন্মানোর সময়েও, মরার সময়েও।...কী হল বলো, খাবে চা? এর পর কিন্তু আমার মুড চলে যাবে।

দয়িতা বোকা বোকা মুখে তাকাল,—আপনি চা করতে জানেন স্যার?

—আমি অনেক কিছুই করতে জানি। ভাত ডিমসেদ্ধ আলুসেদ্ধ মাছভাজা...লন্ডনে থাকার সময়ে টানা তিন বছর নিজে রান্না করে খেয়েছি। ইন ফ্যাক্ট, কুকিং ইজ অ্যান ইজি জব। ছেলেরা চাইলেই পারে। তোমরা মেয়েরাই এটাকে কুক্ষিগত করে রেখেছ। আই মিন, তোমরা এই একটা ব্যাপারে আমাদের ডিপেন্ডেন্ট করে রাখতে ভালবাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাভারত পড়েছ, আই হোপ। নিশ্চয়ই জানো, ভীম ওয়াজ এ গ্রেট কুক। বড় বড় হোটেলেও দ্যাখো...

বোধিসত্ত্ব থেমে গেল। বড্ড বেশি কথা বলছে কি? নির্জন গৃহে মেয়েটির সান্নিধ্য কি তাকে প্রগলভ করে তুলল?

কথার থেকে নৈঃশব্দ্য আরও বেশি অস্বস্তিকর। বোধিসত্ত্ব গলা নামিয়ে বলল,—দাঁড়িয়ে কেন এখনও? বোসো।

দয়িতা বড় সোফার কোণটিতে বসল বটে, কিন্তু ভাবটা এমন যেন ধমক খেলেই ছুটে পালাবে। কাঁপছে কি মেয়েটা? এ যেন ব্যাধের সামনে হরিণী।

উলটো দিকের সোফায় বসে বোধিসত্ত্ব সিগারেট ধরাল। দু এক সেকেন্ড দয়িতার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল একটু। মৃদুস্বরে বলল,—তুমি ওখানে ওভাবে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন?

দয়িতা চুপ।

—এখানে কি কারও কাছে এসেছিলে?

জোরে জোরে দু দিকে মাথা নাড়ল দয়িতা।

—তা হলে?

দয়িতার থুতনি বুকে ঠেকে গেল,—আমি তো রোজই আসি।

—রোজ? কখন?

—আপনার পেছন পেছন।

—স্ট্রেঞ্জ! কেন?

দয়িতা ঝট করে চোখ তুলল। ভীরু আঁখি জ্বলে উঠেছে হঠাৎ,—আপনি তো জানেন, কেন!

মেয়েটার স্বর অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ, সরাসরি বিদ্ধ করল বোধিসত্ত্বকে। হাঁটুর জোর কমে গেছে সহসা, শীত শীত করছে।

চাপা স্বরে বলল,—পাগলের মতো কথা বোলো না।

—আমি পাগল নই।

—তুমি যা বলছ তার মানে বোঝ?

—বুঝি।

—এটা যে ঠিক নয়, অন্যায়, তা বোঝ?

—কীসের অন্যায়? কেন অন্যায়?

—বি লজিকাল দয়িতা, বি র‍্যাশনাল। বোধিসত্ত্ব গলা ভারী করতে চাইল, তবু যেন দুলে গেল স্বর,—সোসাইটির কিছু নিয়মকানুন আছে, মানুষকে তা মেনে চলতে হয়।

—সমাজের জন্য মানুষ? না মানুষের জন্য সমাজ? মন কি সব সময় আইন মেনে চলে?

উত্তরোত্তর সপ্রতিভ হচ্ছে দয়িতা, একটু একটু করে সিঁটিয়ে যাচ্ছে বোধিসত্ত্ব। সিঁটিয়ে যাচ্ছে, না আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে? তালু শুকিয়ে আসছে, জ্বালা জ্বালা করছে শরীর। এই জ্বালা কখন আসে বোধিসত্ত্ব জানে।

খরখরে জিভে তালু ভিজিয়ে নিল বোধিসত্ত্ব। যেন নিজেকেই সাবধান করছে, এমন স্বরে বলল,—আমি বুড়ো মানুষ দয়িতা। তোমার বাবার মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—মতো, কিন্তু বাবা নন। আপনার বয়স হওয়ায় আমার কিচ্ছু যায় আসে না।

—আমি বিবাহিত। আমার একটা কলেজে-পড়া ছেলে আছে।

—তাতেও আমার কিছু যায় আসে না।

—থামো। বাচালপনা কোরো না। বোধিসত্ত্ব গর্জে উঠল। হুঙ্কারটা নিজের কানেই ভারী হাস্যকর ঠেকল বোধিসত্ত্বর। ব্যাধ হরিণ বনে গেলে কি এই স্বরে আর্তনাদ করে? ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বোধিসত্ত্ব বলল,— তুমি কী চাও বলো তো? কী চাও?

—জানি না। আমি কিচ্ছু জানি না। চকিত কান্নায় ভেঙে পড়ল দয়িতা,—আমি আপনাকে ছাড়া বাঁচতে পারব না...মরে যাব...মরে যাব...

চোখের জল যে আগ্নেয়গিরির লাভা হয়ে যেতে পারে, ধারণা ছিল না বোধিসত্ত্বর। এক প্রস্ফুটিত যৌবন আকুল হয়ে বলছে আমায় গ্রহণ করো, এমন আহ্বান কি মুনিঋষিদের পক্ষেও প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব? উন্মুখ অম্বাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ভীষ্ম, পরিণাম কি ভাল হয়েছিল? ভীষ্ম তো দূরস্থান, বোধিসত্ত্ব এমন কিছু জিতেন্দ্রিয় পুরুষ নয়, কতক্ষণ সে নিজেকে সংযত রাখবে?

কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছে দয়িতা, দু হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে। মাতালের মতো টলমল পায়ে দয়িতার কাছে গেল বোধিসত্ত্ব, দু হাতে খামচে ধরেছে দয়িতার কাঁধ। টেনে তুলল দয়িতাকে। সজল মুখ তুলে তাকিয়েছে দয়িতা, বোধিসত্ত্বর ঠোঁট নেমে এল দয়িতার ঠোঁটে। ওষ্ঠ থেকে শুষে নিচ্ছে জল। জল, না আগুন?

বোধিসত্ত্বর শিরা উপশিরায় রক্তকণিকারা নেচে উঠল। ছুটছে এলোপাতাড়ি, ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মাসাইদের ড্রাম বেজে উঠল বুকে। গুমগুম গুমগুম।

নয়

বারাসতে লালজিবাবার আশ্রমটি স্টেশনের কাছেই। হাঁটাপথে জোর মিনিট দশেক, রিকশায় আরও কম। একদম ন্যাশনাল হাইওয়ের গায়ে অবস্থান বলে সামনে দিয়ে হরদম বাসও যাচ্ছে, দূরদূরান্তের ভক্তদেরও আশ্রমে পৌঁছতে কোনও অসুবিধে নেই।

সৌমিকরা অবশ্য বাস ট্রেন কিছুই ধরেনি। তারা এসেছে গাড়িতে। ভাড়ার গাড়ি। সঙ্গে আজ মণিদীপা প্রবীরও আছে। সারাটা দিন সকলে মিলে আশ্রমেই কাটাবে তারা।

উদ্যোগটা মূলত কবিতার। উদ্দেশ্য দুটো। রথ দেখা, এবং কলা বেচা। হরিদ্বার থেকে গুরুদেব এসেছেন, অনেকটা সময় তাঁর সান্নিধ্যও পাওয়া যাবে, দিনভর এক সঙ্গে কাটালে দুই পরিবারের সম্পর্কও নিবিড় হবে আরও। মণিদীপা প্রবীরেরও সৌমিককে ভাল করে দেখা হয়ে যাবে।

সৌমিক ঘুরে ঘুরে আশ্রমটা দেখছিল। এবং মুহুর্মুহু চমৎকৃত হচ্ছিল। এ আশ্রমে সে একবারই এসেছিল, অনেক কাল আগে, তা প্রায় বছর দশেক হবে। সেই মা-বাবার দীক্ষা নেওয়ার সময়। তখন কী চেহারা ছিল, আর এখন কী! জায়গা এতটাই ছিল, তবে ধু-ধু করত। দুটো মাত্র টালির বাড়ি ছিল তখন, আর একখানা মাঝারি সাইজের মন্দির। আর এখন এ তো মিনি টাউনশিপ। সাদামাটা মন্দির গায়ে শ্বেতপাথর গেঁথে বিশাল আকার ধারণ করেছে, ধ্যান জপ কীর্তনের জন্য এক অতিকায় হলঘর তৈরি হয়েছে, স্বচ্ছ জলের পুকুরটার এখন চারপাশ বাঁধানো, টালির চালা অদৃশ্য হয়ে সার সার পাকা দোতলা উঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে আশ্রমবাসীদের জন্য। ওদিকে গোয়ালে হাই তুলছে গোটা আষ্টেক জার্সি গাই, এদিকে লকলক করছে সবজিখেত, ফুলবাগান। পিছনে রয়েছে মিনি ওয়াটার পাম্পিং স্টেশন, জেনারেটার রুম। কী সুন্দর একটা গেস্টহাউসও বানিয়েছে! যেন একেবারে থ্রিস্টার হোটেল। সবই কী পেল্লাই পেল্লাই। রান্নাঘর, খাওয়ার ঘর, এমনকি আশ্রমকে ঘিরে রাখা পাঁচিলটা পর্যন্ত।

এত টাকা এল কোথ্‌থেকে? কোনও ব্যাঙ্ক এদের ফিনান্স করে নাকি?

প্রবীরও এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ আশ্রমে সে একদমই নবাগত। একটু বুঝি ছটফটই করছিল সে, সৌমিককে সামনে পেয়ে স্বস্তি বোধ করল।

সৌমিক হেসে জিজ্ঞাসা করল,—কী, আপনি গেলেন না?

—কোথায়?

—গুরুদেবকে দর্শন করতে?

—আমি পাপী-তাপী মানুষ, আমার ও সব পোষায় না। হাসতে হাসতেই গলা নামাল প্রবীর,—এই, এখানে সিগারেট চলে না?

—ঠিক জানি না।... আমি তো এখানে আসি না...

—ও। বলেই পুট করে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করল প্রবীর। একবার চোখ বুলিয়ে নিল চারদিকে। গেরুয়া বসন পরা সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরা ভাবলেশহীন মুখে যাতায়াত করছে এ দিক ও দিক। সম্ভবত তাদের দেখে আঁচ করতে চাইল নিয়মটা। দুষ্টু হেসে বলল,—নো স্মোকিং বোর্ড তো নেই। ধরানোই যাক, কী বলো?

সৌমিক কাঁধ ঝাঁকাল,—হ্যাঁ হ্যাঁ, ধরান। কিছু বললে নয় ফেলে দেবেন।

কুণ্ঠাভাব ঝেড়ে ফেলে সিগারেট ধরাল প্রবীর। প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল সৌমিকের দিকে,—চলে?

সৌমিক ঝটিতি মাথা নাড়ল দু দিকে।

—কাম অন, লজ্জা পেয়ো না। ইউ আর অ্যাডাল্ট এনাফ টু স্মোক পাবলিকলি।

—আমি খাই না।

—একদম না?

—না।

—অকেশনালিও না?

—না। গন্ধটাই আমার...

—আমার মেয়ে কিন্তু এই গন্ধটাই খুব পছন্দ করে। সিগারেটের গন্ধকে ও কী বলে জানো? ম্যানলি স্মেল।

সৌমিক বোকা বোকা মুখে হাসল সামান্য। বিয়ের পর কি দয়িতার ইচ্ছেয় তাকে সিগারেট ধরতে হবে? আজ দয়িতাও এলে বেশ হত, জিজ্ঞেস করে নেওয়া যেত।

পলকের জন্য দয়িতার মুখটা শূন্যে দুলে গেল। সেই মেলার মাঠের। মেয়েটার ইচ্ছে অনিচ্ছে বোধ বড় তীব্র, তার চাওয়ার সঙ্গে কি তাল মেলাতে পারবে সৌমিক?

বাগানটা হলুদে ছেয়ে আছে। টেনিস বল সাইজের গাঁদা, দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আর একটাও মরসুমি ফুলের গাছ নেই বাগানে। জবা গোলাপ দু-চারটে আছে বটে, কিন্তু গাঁদার সাম্রাজ্যে তাদের অস্তিত্ব টের পাওয়া কঠিন। বৃক্ষময় আশ্রমে প্রতিটি বড় গাছের নীচেই বাঁধানো সিমেন্টের বেদি। সিগারেট শেষ করে একটা ঘোড়ানিম গাছের তলায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসল প্রবীর, সৌমিককেও বসাল।

পিঠে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করল,—ফিউচার নিয়ে কী ভাবছ?

সৌমিক হাসল,—কী ভাবব? কিছুই না।

—চাকরি চেঞ্জ করার কোনও প্ল্যান নেই?

—আপাতত না।

—ব্যাঙ্কের চাকরি ভাল লাগে? স্টিরিওটাইপ মনে হয় না?

—সব চাকরিই তো স্টিরিওটাইপ।

—খাসা বলেছ। এতক্ষণে প্রবীরের স্বর গমগম করে উঠল। যেন মনের মতো কথাটি শুনতে পেয়েছে হবু জামাইয়ের মুখে। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল,—এখনকার কোম্পানিতে যখন ঢুকলাম, প্রথমটা মনে হয়েছিল এদের মার্কেটিং জবটা খুব চ্যালেঞ্জিং হবে। ধুস, কোথায় কী! রুটিন জব, রুটিন টেনশান, রুটিন এক্সাইটমেন্ট...। কোনও কিছুতেই আপত্তি করি না, তাই কাজও চাপছে দিন দিন...।

—সমু...অ্যাই সমু...

সৌমিক প্রবীরের বাক্যালাপে ছেদ পড়ল। দয়িতার বাবাটাকে মন্দ লাগছিল না সৌমিকের, কিন্তু কবিতা বসুরায় শান্ত মতো কথা বলতে দিলে তো!

আবার হাঁকছে কবিতা,—অ্যাই সমু, শোন না এদিকে।

সৌমিক বেজার মুখে উঠে গেল,—কী?

—গুরুদেবকে প্রণাম করবি চল।

—আমি! কেন?

—আশ্চর্য, তাঁর আশীর্বাদ নিবি না?

—তোমরাই তো নিচ্ছ!

বেঁটেখাটো ভারিক্কি কবিতা পলক স্থির চোখে দেখল ছেলেকে। দৃঢ় গলায় বলল,—সিনক্রিয়েট কোরো না। এসো।

এই সিনক্রিয়েট করতে চায় না বলেই তো কবিতা বসুরায়ের এই উৎপীড়ন সহ্য করে সৌমিক। এই সিনক্রিয়েট করতে চায় না বলেই তো সেই অদৃশ্য বুলডগটার সঙ্গে আজও সৌমিকের পাঞ্জা কষা হল না।

একে রবিবার, তায় গুরুদেব আছেন, আশ্রমে আজ খুব ভিড়। মন্দিরেও। লালজিবাবা বসেন মন্দিরের পিছনটায়, তাঁর দরজায় দর্শনার্থী থইথই। ছোট্ট ঘরখানার মেঝে জুড়ে কার্পেট পাতা, সেখানেও নারী পুরুষ শিশুতে ঠাসাঠাসি। লালজিবাবার আসন একটু উঁচুতে, মার্বেল পাথরের মঞ্চে। গেরুয়া বরণ ধুতি পরে আছেন তিনি, খালি গায়ে জড়ানো নকশাদার কাশ্মীরি শাল। চেহারাটি তাঁর ভারী মনোহর। চওড়া কাঁধ, চওড়া কপাল, উন্নত নাক, টকটকে ফরসা রং, দু গাল দিয়ে ঠিকরোচ্ছে লাল আভা। বয়স পঞ্চাশ থেকে সত্তরের মধ্যে যা ইচ্ছে হতে পারে। টানা টানা চোখ দুটিও তাঁর অতি সৌম্য, স্নেহময়। ঘরে ধূপধুনোর পাট নেই, তবু এক আশ্চর্য সুরভি তাঁকে ঘিরে আছে।

ছেলের কবজি ধরে সুকৌশলে ভিড় কাটিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল কবিতা, প্রায় টানতে টানতে সৌমিককে লালজিবাবার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল,—এই আমার ছেলে, গুরুদেব।

লালজিবাবা নিম্নস্বরে এক বয়স্কা সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। ঘুরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকালেন—ও তুই? তুইই সৌমিক?

সৌমিক হাত জোড় করে নমস্কার করতে যাচ্ছিল, প্রথম সারিতে উপবিষ্ট ক্ষীণতনু বাসুদেব তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। ছেলের কানে ফিসফিস করে বলল, করছিস কী? মাথা নোওয়া, প্রণাম কর।

লালজিবাবা বুঝি অন্তর্যামীর মতো টের পেয়ে গেলেন কথাগুলো। স্মিত মুখে হাত তুললেন,—থাক বাবা। মাথা নোওয়ালেই কি আর বেশি সম্মান জানানো হয়?...আয় সৌমিক, আমার কাছে এসে বোস।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসল সৌমিক। একটু জড়োসড়ো হয়ে। ঘরসুদ্ধ লোক হাঁ করে দেখছে, কেমন যেন সঙের মতো লাগছে নিজেকে!

লালজিবাবা সৌমিকের মাথায় হাত রাখলেন,—তোর মা তোকে নিয়ে মিছিমিছি বড় উতলা হয়। এমন সুন্দর বুদ্ধিমান ছেলে কটা মায়ের কপালে জোটে রে? ...তোরই বিয়ে তো?

—হ্যাঁ। ওই মণিদির মেয়ের সঙ্গে। আপনিই তো ছবি দেখে জোড় মেলালেন।

সৌমিকের হাতের চেটোটা টিপছেন লালজিবাবা। দৃষ্টি সৌমিকের কপালে। বলে উঠলেন,—রাজযোটক। অনন্ত সুখ। অপার ঐশ্বর্য।

মণিদীপাও ধড়মড় করে উঠে এসেছে,—মাঘের কোন তারিখটা তবে স্থির করব গুরুদেব?

—সাতের পরে, কুড়ির আগে। মঙ্গল কিংবা শনি নয়।

—ন তারিখটা বুধবার আছে গুরুদেব।

—ওই দিনই কর তবে। শুভস্য শীঘ্রম। আবার সৌমিকের হাতের চেটো টিপছেন লালজিবাবা,—কী রে, মেয়েকে দেখেছিস?

কবিতা তড়িঘড়ি বলে উঠল,—আপনি যখন ঠিক করে দিয়েছেন, ও আর কী দেখবে গুরুদেব?

—তবু আজকালকার ছেলে-মেয়ে, ওরা একটু পরস্পরকে দেখে নেবে না?

—ছবি দেখেছে। পছন্দও হয়েছে।

—বেশ।... বুঝলি সৌমিক, মানুষের জন্ম মৃত্যু বিয়ে সবই তাঁর হাতে। শুধু জন্ম মৃত্যু বিয়ে কেন, সব কিছুই। এই যে সূর্য উঠছে, অস্ত যাচ্ছে, চাঁদ উঠছে, তারা ফুটছে, এ তো সবই তাঁরই ইচ্ছের নিয়মে বাঁধা। তিনি চেয়েছেন বলেই আমরা আছি, তিনি না চাইলে নেই। এটা বুঝলেই সংসারে আর সুখের কমতি থাকে না। বুঝলি?

গুরুদেবের বলার ভঙ্গিটি চমৎকার। মোহাবিষ্টের মতো মাথা নেড়ে ফেলল সৌমিক,—হুঁ।

—তোরাও খুব সুখী হবি। যা, বিয়ের পর একবার জোড়ে দেখা করে যাস কিন্তু।

ছাড়া পেয়ে বাঁচল সৌমিক। তিরবেগে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বুকের গভীরে আন্দোলিত হচ্ছে লালজিবাবার কথাগুলো। তোরা খুব সুখী হবি! দয়িতাই তার সুখের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে এই ধরণীতে! অথবা দয়িতার জন্য সে। ভাবনাটায় কী অদ্ভুত এক তৃপ্তি আছে। প্রশান্তি আছে। দয়িতার কোন গুণ দেখে সে দিন বিমোহিত হয়েছিল সে? কথা বলার স্বচ্ছ অনাড়ষ্ট ভঙ্গি? আপরাইটনেস? খ্যাপামো? নাকি অন্য কিছু, যা ব্যাখ্যার অতীত?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায়ে পায়ে সৌমিক আশ্রমের গেটে এল। অনাগত ভবিষ্যতের ছবি ভেসে উঠছে মনশ্চক্ষে। বিশাল উঁচু স্কাইস্ক্র্যাপারের একদম ওপরতলার ফ্ল্যাট। প্রশস্ত ব্যালকনিতে পাশাপাশি দুটো বেতের আরামকেদারা। মুখোমুখি বসে আছে এক প্রৌঢ় দম্পতি। কারা ওরা? সৌমিক আর দয়িতা না? কপালে অনেক ভাঁজ পড়ে গেছে সৌমিকের, দয়িতারও চুলে বয়সের রং। কী নিয়ে যেন কথা বলছে দুজনে। কী কথা? আকাশে কান পাতল সৌমিক। সেই কবে মেলার মাঠে ভ্যাবাগঙ্গারাম হয়ে দাঁড়িয়েছিল সৌমিক, তারই গল্প বলতে বলতে হেসে খুন হচ্ছে দয়িতা। কী চোখ, ওই বয়সেও বিজলি হানছে চোখে! কেঁপে কেঁপে উঠছে প্রৌঢ় শরীর! এই কি অনন্ত সুখ?

ছবিটা ছিঁড়ে গেল সহসা। কোথা থেকে যেন কান্নার রোল ভেসে আসছে! সৌমিক ইতিউতি তাকাল। আশ্রমের পাঁচিল ঘেঁষে একটা বড়সড় বাড়ি, দেখে মনে হয় ধনী গৃহ, আওয়াজটা আসছে ওখান থেকেই। বাড়িটার সামনেও ছোটখাটো এক জটলা। ঈষৎ কৌতূহল জাগল সৌমিকের, এগোল বাড়িটার দিকে। ভিড় থেকে বেরিয়ে আসছে একটা মোটাসোটা লোক, হাতে বাজারের থলি।

সৌমিক তাকেই শুধোল,—কী হয়েছে দাদা?

—মারা গেছে। লোকটার উদাসীন উত্তর।

—কে মারা গেছে?

—উকিলবাবু। বুড়ো খুব লড়ছিল কদিন, টেঁসে গেল।

—কী হয়েছিল?

—বেশি পয়সা থাকলে যা হয়। সেরিব্রাল।...

মৃত মানুষের সম্পর্কে এমন চ্যাটাং চ্যাটাং মন্তব্য শুনতে ভাল লাগছিল না সৌমিকের, চুপচাপ ফিরে এল আশ্রমে। দূর থেকে দেখতে পেল একটা বেদিতে রুমালচোর খেলার ভঙ্গিতে বসে আছে দু জোড়া স্বামী স্ত্রী। কবিতা-বাসুদেব। প্রবীর-মণিদীপা।

তাকে দেখতে পেয়েই হাতের ইশারায় ডাকল মণিদীপা। সৌমিক কাছে যেতেই বলল,—কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছ? এসো, কথা বলি।

সৌমিক সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করল,—বলুন।

—তোমাকে তো সামনের সপ্তাহে একদিন আসতে হবে বাবা।

—কেন বলুন তো?

—তোমাকে একটু মুনিয়ার বাবার সঙ্গে বেরতে হবে যে। স্যুটের মাপ দিতে হবে, পাঞ্জাবির মাপ দিতে হবে।...আমিও থাকব।

—ও।

—তা ছাড়া বুম্‌বার সঙ্গেও একদিন আলাপ করে যাও এসে। সে তো অলরেডি তোমার ফ্যান বনে গেছে।

—কেন? সৌমিক ভুরু তুলল,—আমার মধ্যে কী আছে?

—আরে ওই যে তুমি বলেছ মুনিয়াকে এমনি দেখবে না, একেবারে ছাদনাতলায় দেখবে, ওটাই বুম্‌বাকে দারুণ ইমপ্রেস করেছে। সবাইকে বলছে, দিদির জন্য এরকমই একটা স্মার্ট ডেয়ারডেভিল ছেলে দরকার ছিল।

সৌমিক হেসে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে এও টের পেল দয়িতা, থুড়ি মুনিয়া, সে দিন তার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথাটা এখনও বাড়িতে অপ্রকাশ্য রেখেছে।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মণিদীপাও মিটিমিটি হাসছে। শাশুড়ি নয়, শ্যালিকার স্বরে রঙ্গ করল,—তা তোমরা হানিমুনে কোথায় যাচ্ছ?

—না মানে...

—এখনও ঠিক করোনি? এর পর তো টিকিট পাবে না! কোথায় যাবে ভাবছ? পাহাড়ে?

সৌমিক মনে মনে বলল,—আমি ঠিক করার কে? দয়িতা যেখানে যেতে চাইবে, সেখানেই যাব।

কবিতা ঝপাং করে বলে বসল,—না না, শীতকালে ওরা পাহাড়ে যাবে কি? সমুর ঠাণ্ডা লেগে যাবে। আমার মনে হয় ওদের গোয়া-টোয়ার দিকে যাওয়াই ভাল।

—কিংবা ওয়ালটেয়ার। বাসুদেব সমর্থনের আশায় স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। ভয়ে ভয়ে বলল,—কিংবা পুরী, গোপালপুর।

বিষম ক্রোধে সৌমিকের ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল। ভেবেছে কী কবিতা বসুরায় অ্যান্ড কোম্পানি? বিয়েতে রাজি হয়েছে বলে কি ধরে নিয়েছে আবার তাদের খাঁচায় ফিরে এসেছে সৌমিক? এবং তার মধুচন্দ্রিমাও নিয়ন্ত্রিত হবে এদেরই অঙ্গুলি হেলনে? বিয়েটা হয়ে গেলেই শোধ নেবে সৌমিক, প্রথম সুযোগেই দয়িতাকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাবে। তার বউয়ের ওপর ছড়ি ঘোরানোর সুযোগই দেবে না কবিতাকে। নিজের স্বামীকে বগলের চাপে স্যান্ডুইচ করে রেখে দিয়েছে, গলা টিপে ধরে রেখেছে লোকটার ব্যক্তিত্বের, তাকে নিয়েই থাকুক বাকি জীবন।

মণিদীপা বেশ বুদ্ধিমতী মহিলা। সৌমিকের অসন্তোষ আঁচ করে ফেলেছে। কথা ঘুরিয়ে দিয়ে বলল,—কবিতাদি, আমরা কিন্তু ওদের জন্য এমনি ইংলিশ খাটের অর্ডার দিচ্ছি। বক্স খাট দিলে কি ভাল হত?

—সে তুমি তোমার মেয়ে-জামাইকে যা দেবে...। আগেই তো বলেছি, আমাদের কিচ্ছু চাওয়ার নেই।

—মুনিয়ার বাবা বলছিল, মেয়েকে আলাদা করে ড্রেসিংটেবিল দেওয়ার দরকার নেই। আজকাল তো সবাই দেয়ালেই আয়না লাগিয়ে র‍্যাক ট্যাক ফিটিং করে নেয়। সেটাই মডার্ন হয়, কী বলো?

—যা ভাল বোঝো।... তোমরা কি ফ্রিজ দিচ্ছ? দিলে কিন্তু ভাই বড়টা দিয়ো। ফ্রস্ট ফ্রি।

—কোন কোম্পানির দেব?

—সবই তো এক। উনিশ আর বিশ। তবে ভাই ওয়াশিং মেশিন দিলে কিন্তু ওইটা দিয়ো...ওই যে কী একটা নতুন বেরিয়েছে...

এটাই কি তবে দেনাপাওনার মডার্ন ফর্ম? অসহ্য অসহ্য, অথচ কোনও সিন ক্রিয়েট করতে পারবে না সৌমিক। আশ্চর্য, মণিদীপাও কী অবলীলায় মেনে নিচ্ছে কবিতার বায়নাক্কা।

দুই গুরুবোনের বকধার্মিক আলাপচারিতার মাঝে কখন যেন উঠে গিয়েছিল প্রবীর, বোধ হয় ধূমপান সারতে। ফিরে এসেই তাড়া লাগাচ্ছে,—কী গো, প্রায় একটা তো বাজে, পেটপুজোর কী হবে?

মণিদীপা কলকল করে উঠল,—আসার পথে এত কিছু খেলে, কচুরি সিঙাড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিলিপি...এর মধ্যেই খিদে পেয়ে গেল? আমার তো বাবা পেট এখনও গজগজ করছে।

প্রবীর কাঁচুমাচু মুখে বলল,—কী করি বলো, এ তোমাদের আশ্রমের জলহাওয়ার গুণ।

বাসুদেব বলল,—প্রসাদ তো রেডি হয়ে গেছে, গেলেই হয়।

—চলুন তবে।

খাবার ঘরে পংক্তিভোজনের সুচারু বন্দোবস্ত। অন্তত শ'খানেক লোকের পাত পড়েছে একসঙ্গে। নিরামিষ হলেও মেনু মন্দ নয়, পোলাও ডাল সবজি চাটনি মিষ্টি, যে যত পারো খাও। মাসিক একশো এক টাকা করে আশ্রমে চাঁদা পাঠায় অন্তত হাজার খানেক ভক্ত, ভগবান এখানে একটু তো ভালমন্দ খাবেনই।

সৌমিকের আহার বেশ গুরু হয়ে গেল। আঁচাতে না আঁচাতেই ভারী হয়ে এল চোখের পাতা। বাসুদেব-প্রবীর আর মণিদীপা-কবিতায় জোর মেশামেশি চলছে এখন, সন্ধের আরতি না দেখে কেউ এখান থেকে নড়বে না।

সৌমিক হাঁটতে হাঁটতে পুকুরধারে এল। শিরীষতলার বেদিতে গড়াচ্ছে। অলস মেদুর মধ্যাহ্ন এখন দয়িতায় মাখামাখি। উঁহু, মুনিয়া মুনিয়া মুনিয়া...। কোথায় যেন একটা পাখি ডেকে উঠল। অচিন পাখি। পাখিটার ডাক বুকে নিয়ে ঘুমে তলিয়ে গেল সৌমিক।

ঘুম ভাঙল এক আশ্চর্য অপরাহ্নে। চোখের সামনে এক কোমল গোলাপি আকাশ, পাশেই এক শীতল পুষ্করিণী, স্বচ্ছ জলের মাথায় শীতের সরমাখা পাতলা পাতলা কুয়াশা, বাতাসে হিমরেণু। এক লয়ে ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে কোথাও। কোথায় হচ্ছে? এই পৃথিবীতেই কি?

অদ্ভুত এক মন-কেমন-করা অনুভূতি নিয়ে একটুক্ষণ আচ্ছন্নের মতো শুয়ে রইল সৌমিক। শীত করছে বেশ, কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছে না। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা ছেলে পুকুরের বাঁধানো শানে বসে একটার পর একটা ঢিল ছুড়ছে জলে। কেমন যেন গভীর আত্মমগ্ন ভাব ছেলেটার। ডুবে আছে উদাসীন খেলায়। যেন গাছ পুকুর আকাশের মতো সে-ও এক নীরব অস্তিত্ব মাত্র। ছেলেটি পোশাকে আসাকে বেশ আধুনিক, বয়স কোনওভাবেই কুড়ি-একুশের বেশি হবে না, এই রকম ছেলেরা সচরাচর এমন ভাবে চুপ মেরে বসে থাকে না। ছেলেটার মুখমণ্ডলে ভগবৎ প্রেমে আপ্লুত ভাবও নেই। প্রকৃতিপ্রেমিক?

সৌমিক তেমন আলাপি নয়, তবু কথা বলতে ইচ্ছে করল ছেলেটার সঙ্গে। মৃদু স্বরে, প্রায় স্বগতোক্তির মতো করে বলল,— হ্যালো?

ছেলেটা চমকে ফিরল। প্রত্যুত্তর করল না কোনও।

পাশে এসে বসল সৌমিক,—দিনটা আজ খুব সুন্দর, তাই না?

ছেলেটা অস্ফুটে বলল,—হুঁ।

—বাড়ির সবাই কোথায়? মন্দিরে?

—আমি একা।

একা শব্দটার মধ্যে এক গাঢ় নির্জনতার আভাস পেল সৌমিক। যেন এই মুহূর্তে তার একা থাকাটাও প্রতিফলিত হল ওই শব্দে। একটু বুঝি কৌতূহলও জাগল।

সৌমিক আলগা স্বরে বলল,—একা কেন?

—এমনিই।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—এখানেই থাকা হয়?

—নাহ, কলকাতায়। এখানে আমার মামারবাড়ি। পাশেই।

—মামারবাড়ি ছেড়ে আশ্রমে যে? সৌমিকের ঠোঁটে দাদাসুলভ হাসি,—সমবয়সী সঙ্গীসাথী নেই বুঝি?

ছেলেটা দুঃখী চোখে তাকাল,—আমার দাদু মারা গেছেন আজ। সবাই এখন শ্মশানে।

—ও, আচ্ছা। সরি। ...এই সকালেই যিনি মারা গেলেন? পাশের বাড়িতে?

—হুঁ।

—তা সকলের সঙ্গে শ্মশান যাওয়া হয়নি কেন?

—আমার শ্মশান ভাল লাগে না। আই হেট ডেথ।

—বাট ডেথ ইজ ডেসটিনি। সৌমিক একটু সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল।

—আই হেট ডেসটিনি টুউ।

বেশ তেজী আছে তো ছেলেটা!

—নামটা জানতে পারি? সৌমিক জিজ্ঞেস না করে পারল না।

—কার? আমার?

—ইয়েস।

—শুদ্ধসত্ত্ব মজুমদার। ...আপনি?

—আমি সৌমিক বসুরায়।

আলাপটা হয়েই গেল। সৌমিক জানতেও পারল না নিয়তিকে ঘৃণা করা এই ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হওয়াই আজ তার নিয়তি ছিল।

ঠিক নিয়তি কি? না নিয়তির পরিহাস?

দশ

রাখী বাপের বাড়ি থেকে ফিরল তিন সপ্তাহ পর। বাবা নার্সিংহোমে শুনে তড়িঘড়ি বারাসত ছুটেও এবার আর তাঁকে সজ্ঞানে দেখতে পায়নি রাখী। সন্ন্যাসরোগে আগাগোড়াই অচেতন ছিলেন সূর্যকান্ত চৌধুরী, অর্থ-প্রতিপত্তি-ডাক্তার-স্পেশালিস্ট কোনও কিছুতেই তাঁর অবস্থার উন্নতি হল না, দিন পাঁচেক পর মারা গেলেন তিনি। চার দিনের কাজ রাখী বারাসতের বাড়িতেই সারল, ইচ্ছে অনিচ্ছের দোলাচলে ভুগতে ভুগতে শ্রাদ্ধশান্তি চোকা পর্যন্ত রয়েই গেল। কিছুটা রণ্টুদের জোরাজুরিতেও বটে, আবার সঙ্গে ভাবল এখন চলে গেলে আবার শ্রাদ্ধতে তো আসতেই হবে, বার বার এই ছোটাছুটি...। তাছাড়া ভিড়ের বাড়িতে শোকের অভিঘাতও কম হয়, দুঃখ তাড়াতাড়ি থিতিয়ে আসে। ইদানীং বাপেরবাড়ির আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কমই দেখা হয়, কটা দিন তাঁদের সঙ্গও মন্দ লাগল না রাখীর।

এ ক'দিন বাবুয়াও রাখীর কাছে কাছে ছিল। দু-চার দিন কলেজ গেছে বটে, তবে ফিরেছে বারাসতেই। এটা রাখীর উপরি পাওয়া। বোধিসত্ত্ব একটিবারের জন্যও আসেনি, আসতে পারেনি। কাজের চাপ। এটা রাখীর মন্দভাগ্য।

ফেরার সময়েও একটু মনমরা ভাব ছিল রাখীর। নিজস্ব ঘরদোরে পা রেখেই তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেটে যাওয়ার কথা, কিন্তু তেমনটা হল না। উলটে এক বিচিত্র অনুভূতি হচ্ছিল। কোথায় যেন একটা তাল কেটে গেছে সংসারের। ছন্দপতনটা যে ঠিক কোথায় রাখী বুঝতে পারছিল না। এখানে সবই তো চলছে অভ্যস্ত নিয়মে, ভোরবেলা উঠছে বোধিসত্ত্ব, দিন শুরু হচ্ছে, রাখীর, বোধিসত্ত্বর ঘড়ির কাঁটায় একটু একটু করে দিন এগোচ্ছে তার, স্বামীর ঘড়ির কাঁটাতেই ফুরোচ্ছে সময়—তবে এমন অনুভূতি জাগে কেন?

কাজেকর্মে বেশ কয়েকবার দেশ বিদেশ গেছে বোধিসত্ত্ব, সেই সময়টুকু ছাড়া আর কখনও স্বামীর থেকে এত দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকেনি রাখী। বারাসতে অহরহই মন খচখচ করত, না জানি একা একা কেমন আছে বোধিসত্ত্ব। খাওয়া দাওয়া ঠিক হচ্ছে কিনা, হাতের কাছে ঠিক সময় ঠিক ঠিক জিনিস জুটছে কিনা, এই সময় রূপচাঁদ দুম করে কটা দিনের জন্য বাড়ি চলে গেল...!

রোজ রাত্রেই অবশ্য রাখী ফোনে খবর নিয়েছে, বোধিসত্ত্বর স্বরেও বিরক্তির আভাস পায়নি। তবু চিন্তাটা ছিল। মনে হত তাকে অস্বস্তিতে ফেলতে চায় না বলেই বুঝি বোধিসত্ত্ব নিজের অসুবিধের কথা এড়িয়ে যাচ্ছে। রূপচাঁদ ফেরার পর রোজ তাকে ফোনে নির্দেশ দিয়েছে রাখী। সকাল বিকেল। তবু নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। অথচ এখানে এসে কী দেখল? বোধিসত্ত্ব বেশ বহাল তবিয়তেই আছে। শীর্ণ মলিন স্ত্রীবিহনে দিশেহারা তো নয়ই, বরং যেন একটু বেশিই প্রাণোচ্ছল, চনমনে। কী অবলীলায় বলে দিল, আরও কটা দিন থেকে এলে পারতে রাখী, অন্তত ক্রিসমাস পর্যন্ত।

রাখীর অনুপস্থিতিতে বোধিসত্ত্বর কণামাত্র অস্বাচ্ছন্দ্য হয়নি, এই ভাবনা থেকেই কি বেদনা জাগছে রাখীর?

অন্য একটা সূক্ষ্ম অভিমান অবশ্য থাকতে পারে। যাব বলেও বোধিসত্ত্ব গেল না বারাসত! সূর্যকান্ত অসুস্থ হলেন, মারা গেলেন, তাঁর ক্রিয়াকর্ম হল। যত কাজই থাকুক, এক বেলার জন্যও কি ও বাড়িতে গিয়ে দাঁড়াতে পারত না বোধিসত্ত্ব? কর্তব্য বলেও তো একটা কথা আছে। শ্রাদ্ধের দিন রাখীর শ্বশুরবাড়ির সবাই এল, শ্বশুর শাশুড়ি শান্ত দীপালি জুলি মিলি, একমাত্র বোধিসত্ত্ব বাদ। আত্মীয়স্বজনদের কাছে কম কৈফিয়ত দিতে হয়েছে রাখীকে! এখানে ফিরে রাখী বার কয়েক মৃদু অনুযোগও জানিয়েছিল, বোধিসত্ত্ব আমলই দিল না। কী করব বলো, কাজে আটকে গেলাম। তোমরা তো ছিলে, তোমরা থাকা মানেই আমার থাকা...!

কিন্তু শুধু ওই কারণেই কি এমন বিচিত্র অনুভূতি জাগে? রাখী তো জানেই তার স্বামী একজন মহৎ মানুষ, জগৎ সংসারের স্বাভাবিক রীতিনীতি তার জন্য প্রযোজ্য নয়, তার ওপর অভিমান করা রাখীকে মোটেই মানায় না। এই অভিমান মূল্যহীনও বটে। হিমালয় কি তরুলতার দীর্ঘশ্বাস শুনতে পায়? ওই দীর্ঘশ্বাসটুকু গোপন রেখেই তো গড়ে উঠেছে রাখীর সংসারের সুর তাল লয় ছন্দ। তুচ্ছ কারণে ওই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটবে কেন?

শীত জাঁকিয়ে এসে গেছে। ক্যাম্পাস টাউনে ঠাণ্ডা ভালই পড়ে, এবার যেন মাত্রাটা হঠাৎই খুব চড়া। দুপুরের পর থেকে সূর্যের তেজ মরে যায় একদম। হাওয়া বয় থেকে থেকে। কনকনে উত্তুরে হাওয়া, হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দেয়।

মনের অস্থির অস্থির ভাবটাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছিল রাখী। সংসারে ডুবছিল, চোখ কান বুজে। একদিন বাগান নিয়ে পড়ল। রূপচাঁদকে সঙ্গে নিয়ে সারাদিন চলল মাটির পরিচর্যা। নিজে থেকে কিছু ডালিয়া আর গাঁদার চারা এনে বসিয়েছে রূপচাঁদ, এখনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুল ফোটেনি, শুধু চন্দ্রমল্লিকাতেই আলো হয়ে আছে বাগান। গাছগুলোকে স্নান করাল প্রাণ ভরে, গোড়ায় সার দিল, ছাঁটল অবাঞ্ছিত ডালপালা। সে চিনা প্রবাদটা অক্ষরে অক্ষরে মানে, জীবনভর সুখ চাইলে বাগান নিয়ে থাকো।

ক'দিন পর টাউনে গেল রাখী। ক্যাম্পাসের বাজার বড্ড ছোট, তেমন বড় একটা কিছু মেলে না, পছন্দসই জিনিস কিনতে টাউনের মার্কেটই ভরসা। টাউনে হরেক কিসিম মানুষের বাস। তেলেগু ওড়িয়া পাঞ্জাবি মারোয়াড়ি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান...। তাদের রুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পণ্যও মেলে হরেক রকম। বিশেষত রেলবাজারে।

সারা বিকেল গোটা বাজারটাই চষল রাখী। টাটকা ভেটকি মাছের ফিলে কিনল বেশ খানিকটা। পরশু বড়দিন, বাবুয়া এলেও আসতে পারে, ফিশফ্রাই খেতে খুব ভালবাসে বাবুয়া। নলেন গুড় নিল কেজিখানেক, ওই গুড়ের গন্ধ বোধিসত্ত্বর খুব প্রিয়। ক্রিসমাসে কেক তো বানাতেই হয়, তারও উপকরণ কিছু কম নয়, চকোলেট পাউডার, আইসিং সুগার, ক্রিম, মাখন, ভ্যানিলা...। ডালিয়া চারার জন্য খোলও কিনল মনে করে। এছাড়া সংসারের টুকিটাকি তো আছেই, চিজ মার্মালেড আচার আপেল আঙুর কমলা... দিনেশ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে, একের পর এক মাল জমা করে আসছে গাড়িতে। আগরওয়ালদের বিশাল দোকানে বিপুল শীতবস্ত্রের সম্ভার, সেখানেও রাখী দাঁড়াল কিছুক্ষণ। দোনামোনা করতে করতে বোধিসত্ত্বর জন্য একটা পুলওভারও কিনে ফেলল। আকাশনীল। আকাশের রং বোধিসত্ত্বকে টানে বেশি, রাখী জানে।

সওদা সেরে মুচমুচে কটা প্যাটিস নিয়ে গাড়িতে উঠছে, কল্পনার সঙ্গে দেখা। কেমিস্ট্রির ডক্টর তিমির হাজারির স্ত্রী। থাকে রাখীদের লাইনেই, দুটো বাংলো পর। বয়সে রাখীর চেয়ে বছর কয়েকের ছোট, রূপটান আঁকা মুখে পড়ন্ত যৌবনের আভা।

কল্পনাই দেখে এগিয়ে এল,—কবে ফিরলেন রাখীদি?

—এই তো, গত বেস্পতিবার।

— স্যাড নিউজটা শুনেছি। উনিই বলছিলেন...। কী রকম বয়স হয়েছিল বাবার?

—সাতাত্তর।

—স্ট্রোক, না?

—সেরিব্রাল। কয়েক সেকেন্ড চুপ রইল রাখী। বুঝি বা বাবাকে মনে পড়ল। একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে সরে এল প্রসঙ্গ থেকে,—আপনিও কি মার্কেটিং?

—এখানে তো আমাদের একটাই রিক্রিয়েশান। বাজারে ঘোরা। কল্পনা হাসল,—আপনার ছেলে আসছে ছুটিতে?

—আসার তো কথা।

টুকটাক ছেঁড়া ছেঁড়া বাক্যালাপ চলল খানিকক্ষণ। উদ্দেশ্যহীন প্রশ্ন, দায়সারা গোছের উত্তর। যেমনটা ক্যাম্পাস টাউনের রেওয়াজ। তাছাড়া কল্পনা রাখীর প্রতিবেশী বটে, তবে এমন কিছু সখী নয়। পথেঘাটে দেখা হলে এরকমই কুশল বিনিময় হয় তাদের।

হঠাৎই কল্পনা জিজ্ঞাসা করল,—আপনাদের কোনও রিলেটিভ এখানে পড়ছে নাকি এখন?

রাখী থমকে গেল,—রিলেটিভ? কই, না তো!

—ও, তাহলে ছাত্রী টাত্রী হবে... ক'দিন ধরে প্রায়ই দেখছি ডক্টর মজুমদারের সঙ্গে আসছে, রাত্তিরবেলা ডক্টর মজুমদার পৌঁছে দিয়ে আসছেন...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখী রীতিমতো চমকিত। কোনও ছাত্রীকে বাড়িতে সন্ধেবেলা পড়ানোর মানুষ তো বোধিসত্ত্ব নয়। নতুন কোনও রিসার্চস্কলার জয়েন করেছে কি? এক শামিমই আসে মাঝে মাঝে, সেও তো ছুটিছাটার সকালে, সন্ধেবেলা কখনওই নয়।

মনে একটু খটকা লাগলেও বেশি কথায় গেল না রাখী। ক্যাম্পাস টাউন মোটেই সুবিধের জায়গা নয়। কোন কথার কী অর্থ হবে, কী ভাবে তা পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে, তার ঠিক কী!

টাউন থেকে ক্যাম্পাস অনেকটা পথ। রেললাইনের ধার ঘেঁষে রাস্তা, অন্য দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। অন্ধকার নেমে গেছে বহুক্ষণ, মাঠ এখন কুচকুচে কালো।

রাখী অন্ধকারটাকে দেখছিল। ড্রাইভারের লাগোয়া জানলা ওঠায়নি দিনেশ, ছুরির ফলার মতো ঢুকছে বাতাস, বিঁধে যাচ্ছে নাকে মুখে। শাল মোড়া রাখী সিটে জবুথবু। ভাবছিল। কোন মেয়ে পড়তে আসে বোধিসত্ত্বর কাছে? সেই যে একটা মেয়ে বোধিসত্ত্বর সঙ্গে সঙ্গে আসত, সেই কি কিছু বুঝতে টুঝতে...? কী যেন নাম মেয়েটার? কী যেন? রাখী একটুক্ষণ স্মৃতি হাতড়াল, তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে হাসছে মিটিমিটি। আপন মনে। বোধিসত্ত্ব বলেছিল না, মেয়েটা তার প্রতি ইনফ্যাচুয়েটেড? উঁহুঁ, ইনফ্যাচুয়েটেড বলেনি, বলেছিল লাইক করে। করতেই পারে। বোধিসত্ত্বর মতো শিক্ষককে কোন ছাত্রছাত্রী না ভালবাসে? ওই মেয়েটাই যদি হয়, বোধিসত্ত্ব বলল না কেন? ভুলে গেছে? যেতেই পারে। অত ছোটখাটো ব্যাপার বোধিসত্ত্ব মাথায় রাখে না। মেয়েটা যদি ইউএফও টিউএফও কিছু হত, তাহলে হয়তো বোধিসত্ত্বর মাথায় ঘুরত সর্বক্ষণ।

সামনে ক্যাম্পাস টাউনের আলো। হঠাৎ উলটো দিক থেকে ভীমবেগে একটা ট্রাক ছুটে এল, রাখীদের সাদা অ্যাম্বাসাডারকে প্রায় ছুঁয়ে গেল গাড়িটা। একটু বুঝি বেসামাল ভাবে। পলকের জন্য কেঁপে উঠল রাখী। চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে ছত্রখান, ত্রস্ত চোখে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে বিলীয়মান যন্ত্রদানবটাকে।

দিনেশ খেঁকিয়ে উঠল,—দেখেছেন, কী বিশ্রী ভাবে গাড়ি চালায়?

রাখী অস্পষ্ট ভাবে বলল,—হুঁ।

—ড্রাইভারটাকে ধরে চাবকানো উচিত। লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া উচিত। ভেবেছে কী, অ্যাঁ? আমরা তো আমাদের লাইনেই চলছি, বলুন?

গজগজ করে চলেছে দিনেশ। রাখী হেসে ফেলল,—এত চটে যাচ্ছ কেন? অমন ড্রাইভার তো থাকেই দু-চারটে! অন্যদেরই সাবধান হয়ে চলতে হয়।

—বারে বা, আমি বেপরোয়া চলব, তার জন্য অন্যদের সিঁটিয়ে থাকতে হবে?

রাখী আর কিছু বলল না। তাদের এই মধ্যবয়সী পার্টটাইম ড্রাইভারটি এমনিতে শান্তশিষ্ট, কিন্তু একবার খেপে গেলে একে চুপ করানো কঠিন। বকবক বকবক চলবে তো চলবেই।

বেশিক্ষণ অবশ্য গজরানোর সুযোগ পেল না দিনেশ, অচিরেই বাংলো এসে গেল। গাড়ির আওয়াজ পেয়েই ছুটে এসেছে রূপচাঁদ, মালপত্র নামাচ্ছে। একে একে, দেখে দেখে।

বাড়ির ভেতর থেকে যেন বোধিসত্ত্বর গলা শুনতে পেল রাখী। অবাক হয়ে ঘড়ি দেখল। ছটা চল্লিশ।

জিজ্ঞাসা করল,—তোর বাবু এসে গেছে?

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—অনেকক্ষণ। দিদিমুনিও এসেছে।

—কে দিদিমণি?

—ওই যে, লিখাপড়া করে।

রাখী আরও অবাক। আজই মেয়েটার কথা শুনল, আজই মেয়েটা বাড়িতে...! একেই কী নাটকীয় ঘটনা বলে?

দ্রুত পা চালিয়ে দরজায় এল রাখী। দরজাতেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। ও মা, এ তো একেবারে বাচ্চা মেয়ে। পরনে ব্লু জিনস, বহুবর্ণের চকরাবকরা পুলওভার, গোছা গোছা চুল কাঁধ অবধি ছড়ানো। রঙটা তেমন ফর্সা নয়, তবে মুখখানা ভারী ঢলঢলে। মায়া মাখানো।

রাখীকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা। উলটো দিকের সোফা থেকে বোধিসত্ত্ব বলে উঠল,—এ দয়িতা।

দয়িতা! দয়িতা! নামটা মনে পড়ে গেছে। রাখী মধুর হাসল,—তুমি এর কথাই বলেছিলে? এই মেয়েটাই আসে তোমার সঙ্গে?

বোধিসত্ত্ব আলগা মাথা নাড়ল। দয়িতা হাত জোড় করে নমস্কার করল রাখীকে। সামান্য কুণ্ঠিত ভঙ্গি।

একটু যেন খারাপই লাগল রাখীর। ছাত্রছাত্রীরা বাড়ি এলে প্রণামই করে তাকে, এই রীতিতেই সে অভ্যস্ত। মুখে অবশ্য ছায়াটা পড়তে দিল না রাখী। কত ধরনেরই যে ছেলেমেয়ে আছে, প্রণাম না করা মানেই কিছু অসম্মান দেখানো নয়।

হাসিমুখেই রাখী বলল,—চা টা কিছু খেয়েছ?

বোধিসত্ত্বর দিকে তাকাল দয়িতা। রাখী লক্ষ করল মেয়েটির চোখ দুটি ভারী বাঙ্ময়। বোধিসত্ত্বই তাড়াতাড়ি বলে উঠল,

—ও চা বেশি খায় না।

—তার মানে কিছু দাওনি, তাই তো? রূপচাঁদকে বলতে পারতে, কফি করে দিত। কী, তুমি কফি খাও তো?

দয়িতা বসে পড়েছে। আবার বোধিসত্ত্বর দিকে চোখ। বোধিসত্ত্ব হাসল,—খায়। দুধে কফি মিশিয়ে। বেশি চিনি দিয়ে।

এতক্ষণ পর এই বুঝি প্রথম সত্যিকারের খটকা লাগল রাখীর।

ছাত্রীর সম্পর্কে কি একটু বেশিই জেনে গেছে বোধিসত্ত্ব? এবং ঠিকঠাক মনেও রেখেছে? বোধিসত্ত্বর স্বভাবের সঙ্গে এটা তো ঠিক মেলে না। বোধিসত্ত্ব কি বলতে পারবে রাখী চা কফিতে আদৌ চিনি খায় কিনা?

ধোঁয়াটাকে বাড়তে দিল না রাখী। স্মিত মুখে বলল,—দাঁড়াও, আমিই করে আনছি।

এবার মেয়েটার কথা ফুটেছে। স্পষ্ট রিনরিনে স্বরে বলল,—শুধু কফি কিন্তু, আর কিচ্ছু না।

—ও মা, সে কী কথা? আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হল...গরম প্যাটিস এনেছি, একটা অন্তত খাও।

—থ্যাঙ্কস। আমি বিকেলে টিফিন করেছি।

—তা হোক। তুমি বাচ্চা মেয়ে, একটা প্যাটিস ঠিক খেতে পারবে। বলেই লঘু রঙ্গ জুড়বার চেষ্টা করল রাখী,—কিচ্ছু না খাওয়ালে তুমি হোস্টেলে ফিরে বলবে, ম্যাডামটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব কিপটে...

আশ্চর্য, মেয়েটা হাসল না।

বোধিসত্ত্বই আবার বলল,—ওকে জোর করছ কেন? কফি যদি করে দিতে পারো তো দাও, নইলে ঘরে রেস্ট নাও গিয়ে।

বোধিসত্ত্বর স্বর কঠিনও নয়, কোমলও নয়, বড় বেশি যান্ত্রিক শোনাল রাখীর কানে। উষ্মা গোপন করতে ওই স্বরই ব্যবহার করে বোধিসত্ত্ব।

আহত মুখে রান্নাঘরে ঢুকে গেল রাখী। দুধ বসিয়েছে গ্যাসে। রান্নাঘর থেকেই কানে এল বোধিসত্ত্ব বলছে,—স্টাডিতে চলো। হাটের মাঝে কথা বলতে আমার অসুবিধে হয়।

ইচ্ছে করেই কি জোরে বলল কথাটা? রাখীকে শোনাতে?

রাখীর মুখ ছোট্ট হয়ে গেল। একটু কি অস্বাভাবিক আচরণ করছে না বোধিসত্ত্ব? ছাত্রীর সামনে স্ত্রীকে অপমান করলে যে নিজেরও সম্ভ্রমহানি হয়, এই শালীনতাবোধটুকুও কি ভুলে গেল?

রূপচাঁদ ডিপফ্রিজে ভেটকি মাছের ফিলে ঢোকাচ্ছে। রাখী হাত নেড়ে ডাকল তাকে। ফিসফিস করে বলল,—মেয়েটা আগেও এসেছে, না রে?

—আজ্ঞা।

—তুই আমায় বলিসনি তো?

—জিজ্ঞেস করেননি যে!

অকাট্য যুক্তি। যেচে কিছু বলার যে স্বভাব নেই রূপচাঁদের, রাখীর তাও অজানা নয়।

রাখী আবার প্রশ্ন করল,—রোজ আসত মেয়েটা? আমি যখন ছিলাম না...

—হ্যাঁ আজ্ঞা।

—বাবুর সঙ্গে আসত?

—হ্যাঁ আজ্ঞা।

—কোথায় বসে পড়াশুনা করত? পড়ার ঘরে? না বসার ঘরে?

—ঠিক নেই। বসার ঘরেও থাকত, পড়ার ঘরেও থাকত।

—যেত কখন?

—ঠিক নেই। কখুনো আগে যেত, কখুনো রাতে খেয়ে যেত।

—খেয়ে যেত?

—আজ্ঞা। নিজের হাতেও এক দিন রান্না করেছিল। চাউচাউ।

রাখীর হঠাৎ সম্বিত ফিরল। এ কী করছে সে? নগণ্য একটা কাজের লোককে জেরা করে করে কী জানতে চাইছে? বোধিসত্ত্ব মেয়েটাকে স্নেহ করে, মেয়েটা বোধিসত্ত্বর কাছে আসতেই পারে। স্যারের কাছে বসে পড়াশুনোও করতেই পারে। প্রিয় অধ্যাপক একা রয়েছেন দেখে তাঁকে একদিন চাউমিন করে খাওয়ানোও এমন কিছু গর্হিত অপরাধ নয়। কিন্তু রূপচাঁদের কী ধারণা হচ্ছে রাখী সম্পর্কে? তার আধবুড়ি মালকিন বুড়ো বাবুটাকে সন্দেহ করে...? ছি ছি, রাখী কেন নিজেকে এত ছোট করে ফেলছে?

কফি নিয়ে স্টাডিরুমের দরজায় গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল রাখী। পর্দা ফেলা, ভেতরে অনুচ্চ স্বরে কথা বলছে বোধিসত্ত্ব, তার থেকেও নিচু গলায় কী যেন উত্তর দিচ্ছে দয়িতা। ছাত্রছাত্রীকে পড়ানোর সময়ে বোধিসত্ত্বর গলা এত নিচু গ্রামে থাকে কি? পড়ানো ছাড়া অন্য কী কথা বলতে পারে বোধিসত্ত্ব? পলকের জন্য রাখীর গা শিরশির করে উঠল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবিষ্টের মতো কান পেতেছে দেয়ালে। নাহ্, কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না।

পিছনে মৃদু শব্দ। চমকে ঘাড় ফেরাতেই রূপচাঁদ। দৃষ্টি কেমন বিস্ফারিত রূপচাঁদের, যেন রাখী কোনও হিয়েরোগ্লিফিক।

তবে সন্দেহ বুঝি আরও আদিম ভাষা, আরও দুর্বোধ্য।

রাখী মরমে মরে গেল, ছেলেমানুষির একটা সীমা আছে। মুহূর্তে নিজেকে শক্ত করে ঢুকল স্টাডিরুমে।

টেবিলের দু পারে বসে আছে দুজন, মাঝে কফির ট্রে নামাল রাখী।

ট্রে রাখার সময় শব্দটা কি জোর হয়েছিল? মেয়েটা যেন কেঁপে উঠল?

রাখী চলে যেতে গিয়েও গেল না। এক অজানা তরঙ্গ যেন ঘুরছে ঘরের বাতাসে, বিকর্ষণ করছে রাখীকে, তবু জোর করে বসে পড়ল ডিভানে। এই ডিভানে কালেভদ্রে ঘুমোয় বোধিসত্ত্ব।

স্বর কোমল করে রাখী জিজ্ঞাসা করল,—তোমার সঙ্গে তো আলাপই হল না ভাল করে। বাড়ি কোথায় তোমার?

দয়িতা গলা ঝাড়ল,—কলকাতা।

—কলকাতার কোথায়?

—নর্থে। শোভাবাজার।

—কে কে আছেন বাড়িতে?

—সবাই আছে। বাবা মা...

—একমাত্র মেয়ে তুমি?

—না, ভাই আছে।

বোধিসত্ত্বর চোখ যেন টেবিল টেনিস বল। একবার দয়িতা, একবার রাখী...।

অসহিষ্ণু স্বরে বলে উঠল,—ওর বায়োডাটা জেনে তোমার কী হবে?

—এমনি। এত মিষ্টি মেয়েটা...। রাখী হাসল,—ওকে আমার খুব ভাল লাগছে।

বোধিসত্ত্ব চোখ সরিয়ে নিল,—ঠিক আছে, এবার তুমি যাও। লেট মি ফিনিশ মাই টপিক।

—ও, সরি।

রাখী উঠে সোজা শোওয়ার ঘরে চলে এল। কাপড় বদলাচ্ছে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। কাচে বিম্বিত ওই নারী এখন যথেষ্ট পৃথুলা, দুই গালে স্পষ্ট দেখা যায় বয়সের ভাঁজ, কপালে হানা দিতে শুরু করেছে বলিরেখা। দু যুগ হল বিয়ে হয়েছে তার, ছেলের কুড়ি বছর পূর্ণ হয়ে গেল, এখন কোন রন্ধ্রপথে ঢুকে পড়ার সাহস পায় কূট সন্দেহের বীজ? নিজের ওপর বেশ বিরক্ত হল রাখী। কত ছাত্রীই তো আছে বোধিসত্ত্বর, কতবার কত দেশে একাই গেছে তার স্বামী, কখনও তো তাকে পাহারা দেওয়ার কথা মনে হয়নি রাখীর। যৌবন ফুরিয়ে এলে আত্মবিশ্বাসও কি চলে যায়?

ঘরোয়া শাড়ি পরে রাখী শালে আষ্টেপৃষ্টে মুড়ে নিল নিজেকে। এটা ওটা কাজ সারছে সংসারের। বালিশের ওয়াড় বদলাল, মনে করে করে আজকের খরচের হিসেবটা লিখল ডায়েরিতে, ইস্ত্রি করা জামাকাপড় আলমারিতে গুছিয়ে তুলল...। শীতটা বাড়ছে, এবার রুমহিটার চালাতে হবে, আলমারির মাথা থেকে পাড়ল রুমহিটারটা। প্লাগ লাগিয়ে দেখে নিল যন্ত্র ঠিক আছে কিনা, তারপর বেরিয়ে এল ঘর থেকে। রূপচাঁদের সঙ্গে সঙ্গে রাতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রান্নায় হাত লাগিয়েছে।

সাড়ে আটটা নাগাদ দয়িতাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল বোধিসত্ত্ব, ফিরল আধ ঘণ্টার মধ্যেই। শীতের রাত, রূপচাঁদ তাড়াতাড়িই নৈশাহারের টেবিল সাজিয়েছে, রাখী খেতে ডাকল বোধিসত্ত্বকে।

বোধিসত্ত্ব বড় গম্ভীর হয়ে আছে। রাখীর কোনও আচরণে রুষ্ট হয়েছে কি? ভয় ভয় করছিল রাখীর। জোর করে সহজ করতে চাইল পরিবেশটাকে।

স্বামীর প্লেটে স্যালাড তুলে দিতে দিতে বলল,—একটা কথা বলব?

—হুঁ।

—মেয়েটার টাইটেল কী গো?

—কোন মেয়েটা?

— যে গো, তোমার ওই স্টুডেন্টটা। দয়িতা।

—কেন?

—বলো না, দরকার আছে। রাখীর চোখে রহস্য খেলে গেল। মুচকি মুচকি হাসছে,—রণ্টুর বউ একটা ভাল মেয়ে খুঁজছিল। ছোট ভায়ের জন্য। তুমি তো দেখেছ ইন্দ্রনীলকে। ব্রিলিয়ান্ট ছেলে। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, যাদবপুরের। এম বি এ করে স্টিফেনস ইন্ডিয়ার টপ এগজিকিউটিভ। বছরে মাইনেই শুধু সাড়ে তিন লাখ। ওর সঙ্গে এই মেয়েটির সম্বন্ধ করা যায় না?

বোধিসত্ত্ব চোখ তুলেই নামিয়ে নিল। বাইরের শীতলতার থেকেও হিম গলায় বলল,—তুমি আজকাল ঘটকালি করছ না কি?

—না করার কী আছে? আত্মীয়স্বজনের জন্য তো লোকে চেনাজানা মেয়েই খোঁজে। ইন্দ্রনীলদের দুবাইএ অফিস আছে, মাস কয়েকের মধ্যেই সেখানে চলে যাবে, তার আগে বিয়েটা...। মেয়েটা কী গো? ব্রাহ্মণ, না কায়স্থ?

বোধিসত্ত্বর স্বর আরও শীতল,—ছাত্রছাত্রীদের সম্বন্ধ করে বেড়ানো আমার কাজ নয়।

—তুমি কেন করবে? আমি করব। কাল এনো তো মেয়েটাকে, ঠিকানা টিকানা সব জেনে নেব।

—ও কাল বাড়ি চলে যাবে।

—ও।... তাহলে নয় ক্রিসমাসের পরই...

—তোমার কি আর কোনও কাজ নেই? বোধিসত্ত্বর গলায় যেন সামান্য ঝাঁঝ—মেয়েটাকে নিয়ে পড়লে কেন? আজকালকার মেয়ে, দে ক্যান চুজ দেয়ার ওন লাইফপার্টনার।

—আমার মনে হয় না ওই মেয়ের পছন্দ করা কেউ আছে। রাখী হাসল,—যদি থাকতই, মাস্টারমশায়ের ওপর এত বেশি টান থাকত না। দেখছিলাম তো, কী মুগ্ধ চোখে তোমার কথা শুনছিল...

—উইল ইউ প্লিজ স্টপ দিস ননসেন্স? বোধিসত্ত্ব বিস্ফোরিত হল,—আমাকে শান্তিতে খেতে দেবে, না উঠে যাব?

রাখী নিশ্চুপ হয়ে গেল। চোরা চোখে দেখছিল স্বামীকে। সহসা যেন বদলে গেছে মানুষটার মুখচোখ। বড় বড় নিশ্বাস ফেলছে বোধিসত্ত্ব, খাবার খুঁটছে, এক দানাও মুখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলছে না।

বাইরে তীক্ষ্ণ হুইসিলের শব্দ। ইদানীং দু একটা চুরি ঘটেছে ক্যাম্পাসে, পাহারাদারির বন্দোবস্ত করেছে কর্তৃপক্ষ, সন্ধে গাঢ় হলেই নাইটওয়াচম্যানরা বেরিয়ে পড়ে।

হুইসিলের শব্দটা দূরে চলে গিয়েও ফিরে এল। বাজছে রাখীর কানে। একটানা।

এগারো

বিছানা জুড়ে ছড়িয়ে আছে রাশি রাশি সামগ্রী। মনোরম কারুকাজ করা দামি লেপ রঙে রং মিলিয়ে নামি কোম্পানির পিলোকভার, বেডশিট, চোখ ধাঁধানো মখমলের বেডকভার, তুলতুলে কম্বল, টুকটুকে শাল, বাহারি কার্ডিগান, অজস্র দেশি-বিদেশি কসমেটিক্স...। শাড়ি হবে কম করে ডজন খানেক। বালুচরী, জামদানি, বমকাই, কাঞ্জিভরম, নারায়ণপেট, গাদোয়াল, ঘটচোলা, চিনন সিল্ক, কলাক্ষেত্রম...। আছে বর্ণময় সালোয়ার-কুর্তা, আছে মেখলা, আছে কামনামদির নাইটি। বিয়ের কার্ডও উপস্থিত, শোভা পাচ্ছে খাটের একধারে।

আয়োজন দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছিল দয়িতা। মা মাঝে মাঝেই ফোনে বলত বটে মাসির সঙ্গে কেনাকাটা করতে বেরচ্ছে রোজ, তা বলে এতদূর এগিয়ে গেছে! মাঘ মাসের ন তারিখ তো এখনও অনেক বাকি!

দয়িতা বিছানার কোণে বসে পড়ল। ক্রিসমাস ইভের সন্ধেটা পাঁশুটে ঠেকছে সহসা, ঘরে ফ্লোরেসেন্ট বাতি তেমন দ্যুতিহীন। এইমাত্র সে ক্যাম্পাসটাউন থেকে ফিরল, পথশ্রমের ক্লান্তি আছে বটে, কিন্তু এমন ঘোর ঘোর তো লাগার কথা নয়।

মণিদীপার চোখ জ্বলজ্বল করছে,—কী রে মুনিয়া, খুশি তো?

দয়িতা উত্তর দিল না।

—সবই তোর পছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে কিনেছি। রেভলনের সেট, ল্যাকমের সেট...। শুধু তোমার পারফিউম আর বেনারসিটা আমি কিনিনি, ওগুলো তুমি নিজে পছন্দ করে কিনবে।

দয়িতা এবারও উদাস।

মণিদীপা অধৈর্য হয়ে বলল,—কিছু একটা কমেন্ট কর। ভাল লাগছে, কি পছন্দ হচ্ছে না...। শাড়িগুলো চয়েসেবল হয়েছে?

দয়িতা মুখ খুলল,—এত তাড়াহুড়ো করার কী দরকার ছিল?

—কোথায় তাড়াহুড়ো! আর তো একমাসও হাতে নেই। এর পর তো নেমন্তন্নয় ছুটতে হবে। আর বাজার করার সময় পাব?

—আমি এলে করতে পারতে। যদি এখন বিয়েটাই না করি?

হুঁহ্, বিয়ে আবার করবে না! মণিদীপা এক গাল হাসল,—অমন ছেলের জন্য যে কোনও মেয়ের নোলা সপসপ করবে। আহা, কী ছেলে, লাখে একটা মেলে। কপাল করে এসেছিলি বটে!

দয়িতার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।

—ও হ্যাঁ, আর একটা জিনিস দেখানো হয়নি। বলতে বলতে আলমারি খুলল মণিদীপা। চ্যাপটা পিজবোর্ডের একটা বাক্স বার করেছে,—এই দ্যাখ, এই জামেওয়ারটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোর বউভাতের, শ্বশুরবাড়ির থেকে দেবে। কালারটা খুব গর্জাস, না? টারকোয়েজ ব্লু! কাল পরশু ব্লাউজপিস কেটে শাড়িটা কবিতাদিকে ফেরত পাঠাতে হবে।

দয়িতা শাড়িটাকে ছুঁল না, শাড়িটার দিকে তাকিয়েও দেখল না। উঠে চলে যাচ্ছিল, মণিদীপা খপ করে চেপে ধরেছে হাত,—অ্যাই, তোর কী হয়েছে রে?

—ভাল্লাগছে না। গা গুলোচ্ছে।

—সে কী! শরীর খারাপ?

—না।

মণিদীপা মুচকি হাসল,—বুঝেছি, টেনশন হচ্ছে। বিয়ের আগে এরকম হয়। তোর বাবার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হওয়ার পর তো আমার সারাক্ষণ বুক কাঁপত।

—আমার বিয়েটাই করতে ইচ্ছে করছে না, মা।

দয়িতার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল চমকাতে বাধ্য হল মণিদীপা। মুখের উচ্ছল হাসি হাসি ভাব উবে গেছে, তীক্ষ্ণ চোখে নিরীক্ষণ করছে মেয়েকে। গলা একটু ভারী করেই বলল,—ইচ্ছের কারণটা জানতে পারি?

—শুনতে তোমার ভাল লাগবে না।

—তবু শুনি?

—তোমাদের চয়েসের ছেলেটাকে আমার পছন্দ হয়নি।

—কেন?

—সব কেনর উত্তর হয় না মা। আই ডিসলাইক হিম, ব্যস।

—যত সব ঢঙের কথা! তুমি তোমার ডিসলাইক নিয়েই থাকো এখন। বিয়ের পর বর নিয়ে আহ্লাদীপনা করলে তখন স্মরণ করিয়ে দেব। মেয়ের হাত ছেড়ে সরে যেতে গিয়েও দাঁড়াল মণিদীপা,—ও হ্যাঁ, কবিতাদি তোকে জানিয়ে দিতে বলেছে, তোদের হানিমুন হবে গোয়ায়। আই টি ডি সি-র হোটেলও বুক করা হয়ে গেছে। ভালই হল, কী বল? গোয়া তো তুই যাসনি।

দরজায় প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিল দয়িতা। চোখের পলক না ফেলেই বলল,—তোমরা কি আমায় জোর করে বিয়ে দিতে চাও মা? আমার আপত্তি শুনবে না?

—ও কী অলুক্ষুনে কথাবার্তা! এখন আপত্তি থাকবেই বা কেন? তোমাকে তো না জানিয়ে কিছু ঠিক করা হয়নি!

—আমার মতামত চাওয়া হয়নি।

—অমত থাকলে জানাতেই পারতিস। তোর কাছে আমরা কোনও কথাই লুকিয়ে রাখিনি।

—এখন জানাচ্ছি।

—এখন! সমস্ত ঠিক হয়ে যাওয়ার পর?

—বিয়েটা তো হয়ে যায়নি মা। বিয়েটা আমার, আমি যখন ইচ্ছে অবজেকশান দিতে পারি। আমি যদি না চাই, তোমরা আমার ঘেঁটি ধরে বিয়ের পিঁড়িতে বসাতে পারবে না।

মণিদীপার দু চোখ ক্রমশ বিস্ফারিত। যেন দয়িতার কথাগুলো কানেই ঢুকছে, মগজে নয়। পায়ে পায়ে মেয়ের কাছে এল আবার। হাত রেখেছে মেয়ের কাঁধে। ধরা ধরা গলায় বলল,—কী হয়েছে আমায় খুলে বল তো মুনিয়া? পাগলামি করছিস কেন?

—আমি সুস্থই আছি। তোমরাই পাগলের মতো সাততাড়াতাড়ি সব কিছু...। রুক্ষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতে না চেয়েও রুক্ষ হয়ে গেল দয়িতা। মণিদীপার হাত কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে বলল—আমি এখন শুতে যাচ্ছি। ডোন্ট ডিসটার্ব মি, আমি রাতে খাবও না।

মণিদীপার গেঁথে থাকা চোখ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে দয়িতা নিজের ঘরে চলে এল। দরজা ভেজাল, আলো জ্বালল না, গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। অবরুদ্ধ কথাগুলোকে অর্গলমুক্ত করে একটু কি মুক্তির স্বাদ পাচ্ছে দয়িতা? বুকটা ছুঁয়ে দেখল দয়িতা, হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে ধড়াস ধড়াস। কেন এই উত্তেজনা, একসময় না একসময় কথাটা তো বলতেই হত! এরা সব কিছু মিলিয়ে এমন জট পাকিয়ে ফেলেছে জানলে হয়তো আগেই...।

কেন সে বিয়ে করবে সৌমিককে? একটা সুন্দর অ্যাপার্টমেন্টে থাকতে পারবে বলে? বছরে দুবার করে পছন্দ মতো জায়গায় বেড়াতে যেতে পারবে, সেই জন্য? দামি দামি আসবাবে সংসার সাজানোর মোহে? একটা প্রেমহীন রতিসম্ভোগের আশায়? ছি ছি, সে তো পশুর জীবন।

সব চেয়ে বড় কথা সেই মায়াবী পুরুষটাকে ভুলে যেতে হবে, যাঁর হাতে অনন্ত মহাশূন্যের চাবিকাঠি? ওই রহস্যময় মানুষটাকে ছেড়ে কোন বানানো স্বর্গে সুখ পাবে দয়িতা?

ঘরের আঁধার গাঢ়তর হচ্ছে ক্রমশ, দয়িতার সঙ্কল্পও দৃঢ় হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। চোখ বুজে অনুভব করছে বোধিসত্ত্বর স্পর্শ। শিরায়, ধমনীতে, রক্তকণিকায়, প্রতিটি রোমকূপে। তীব্র আবেগে তিনি চুম্বন করলেন দয়িতাকে, গাছের গুঁড়ি হয়ে আশ্রয় দিলেন আবিষ্ট তরুলতাকে। আগুন, মূর্তিমান বৈশ্বানর! শিশুর মতো কী খুঁজছিলেন তিনি দয়িতার দেহে? দয়িতা কি আকাশ হয়ে গিয়েছিল? অচেনা ব্রহ্মাণ্ডকে প্রাণ ভরে দেখছিলেন বোধিসত্ত্ব? সৃষ্টিরহস্যের মূলে পৌঁছতে চাইছিলেন?

অপরূপ এক প্রশান্তিতে ছেয়ে যাচ্ছিল দয়িতা। বোধিসত্ত্বই তার প্রেম, তার জীবনে প্রথম পুরুষ, তার ঈশ্বর। দয়িতা শুধুই তার ঈশ্বরে নিবেদিতপ্রাণ, সেখানে আর কারও স্থান হতেই পারে না।

—মুনিয়া, অ্যাই মুনিয়া...।

প্রবীরের গলা। ফিরল দয়িতা।

দরজা ঠেলে ঢুকে আলো জ্বালিয়েছে প্রবীর, পিছনে বুমবা।

দয়িতা চোখ কুঁচকে উঠে বসল। শালটা আলগা জড়িয়ে নিল গায়ে। অপ্রসন্ন মুখে বুমবার দিকে দৃষ্টিপাত করল। কী বুঝল কে জানে, সব সময়ে বড় বড় হাবভাব করা বুমবাও থতমত মুখে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

প্রবীর বিছানায় এসে বসল। দয়িতার সামনে। একটু লঘু সুরেই বলল,—মা কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে...কী ভয় দেখিয়েছিস মাকে?

—ভয় তো দেখাইনি। দয়িতার স্বরে এখন আর কোনও জড়তা নেই,—আমার মনের কথা সাফ বলে দিয়েছি।

—প্রবলেমটা কী? হোয়াটস রং উইথ সৌমিক?

—সে তুমি বুঝবে না বাবা।

—বোঝাও। যদি আমায় কনভিন্স করতে পারো, আমি তোমার পাশে থাকব।

—আমাদের মেন্টাল লেভেল এক নয় বাবা।

—তুমি জানলে কী করে? তুমি কি তাকে মিট করেছ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—করেছি। আমার তাকে পছন্দ হয়নি।

একটু বুঝি থমকে গেল প্রবীর। তারপর বলল,—কবে দেখা করেছিস?

—অনেক দিন আগে। প্রথম যখন বিয়েটা ঠিক হয়েছিল।

—তখনই বলিসনি কেন?

—তোমরা তো কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করোনি বাবা। আমার যে একটা মতামত আছে, আমি যে সাবালিকা হয়েছি, এ সব কথা তোমাদের মনেই হয়নি।

—শুধু এই কারণেই ওয়েট করছিলি? আমাদের অকওয়ার্ড সিচুয়েশানে ফেলার জন্য? প্রবীরের হালকা স্বর ক্রমশ ভারী,—সেবারের পরেও দু দুবার তুই কলকাতায় এসেছিস, আমরা তোর সঙ্গে ফোনে রেগুলার কথাও বলেছি...।

দয়িতা চুপ করে রইল।

প্রবীর সিগারেট ধরাল। অপাঙ্গে দেখছে মেয়েকে। নীরস স্বরে বলল,—সৌমিকের শর্টকামিংসটা কি জানতে পারি? আমি নিজে সৌমিকের সঙ্গে মিশেছি, ও যে শুধু এক্সটারনালি ভাল তা নয়, অ্যাট হার্টও সৌমিক ইজ আ নাইস চ্যাপ।

দয়িতা এখনও চুপ।

প্রবীর গলা নরম করে বলল,—দ্যাখ মুনিয়া, বিয়ের আগে থেকেই একটা ছেলে একটা মেয়ের মেন্টাল লেভেল এক হবে, এটা টু মাচ অব এক্সপেক্টেশান। হয় না, হতে পারে না। আফটার অল দুজনে দুটো আলাদা আলাদা পরিবারে বড় হয়ে ওঠা মানুষ তো। এই ধর না, আমি আর তোর মা। বিয়ের আগে আমরা তো এক ছাঁচের মানুষ ছিলামই না, এমনকি বিয়ের পরও নেই। এখনও তো কত কিছু আমাদের মেলে না। এই ঠাকুরদেবতা গুরুদেব... তোর মা মানে, আমি মানি না। তা সত্ত্বেও কি আমরা এক সঙ্গে থাকি না? ডু উই লুক আনহ্যাপি কাপল? বরং বলতে পারি, উই আর দা বেস্ট অফ পেয়ারস। যে যার মতে চলি, কিন্তু সংসারের সঙ্কটে এক সঙ্গে থাকি। সৌমিকের মধ্যে এই গুণটা আছে, আই ক্যান অ্যাশিওর ইউ। সৌমিক খুব অ্যাডজাস্টেবল ছেলে।

দয়িতা মনে মনে বলল, ব্যক্তিত্বহীন।

মুখে বলল,—হাজারটা খরগোশ জোড়া লাগিয়েও ঘোড়া হয় না বাবা। পছন্দ অপছন্দ তো ভেতরের জিনিস, সে কি তোমার যুক্তি মেনে চলে?

—এ কথা তো বললে চলবে না মুনিয়া। যুক্তিগ্রাহ্য কোনও কারণ না থাকলে আমাদের কথা তোমায় মানতেই হবে। অন্তত এই মুহূর্তে, যখন আমাদের আর ফেরার পথ নেই। তুমি দেখেছ বিয়ের কেনাকাটা হয়ে গেছে, ফার্নিচারের অর্ডার আমি দিয়ে এসেছি, তোমার মা গয়না গড়াতে দিয়ে দিয়েছে, এবং নিজের চোখে পর্যন্ত দেখেছ বিয়ের কার্ডও ছাপা হয়ে গেছে। তোমার রায়গড়ের মামা, কানপুরের পিসি, সকলের কাছে চিঠিও পোস্ট করা হয়ে গেছে...। সুবীর শুধু তোমার বিয়ে উপলক্ষেই অত দূর থেকে আসছে। বাসুদেববাবুরাও কত খরচাপাতি করে ফেলেছেন...

দয়িতার অস্বস্তি হচ্ছিল। বাবা যেন কথার পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলছে তাকে, দুর্বল করে দিচ্ছে। বন্ধ জানলার কোনও এক ফাঁক দিয়ে কনকনে বাতাস আসছে, তবু যেন গরম লাগছে দয়িতার। ক্রুদ্ধ বাবার চেয়ে অসহায় বাবার সঙ্গে লড়া অনেক বেশি কঠিন, দয়িতার মনে হচ্ছিল।

খানিক ইতস্তত করে দয়িতা বলল,—ওদের অসুবিধে হবে কেন বাবা? অন্য কোনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়ে দেখে ছেলের বিয়ে দিয়ে দেবে, তাকেই না হয় ও সব জিনিস...

—আর সৌমিকের স্যুটের অর্ডার যে দেওয়া হয়ে গেছে, তার কী হবে? মণিদীপা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে পিতাপুত্রীর কথা গিলছিল, বাজপাখির মতো ধেয়ে এসেছে ঘরে,—আংটি? ঘড়ি? বোতাম? পাঞ্জাবি? ওগুলো কি বুমবা পরে ঘুরবে?

চরম থমথমে পরিবেশেও দয়িতার হাসি পেয়ে গেল। মার সমস্ত শোক এখন শুধু ওইটুকু অপচয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে! এমনটাই বুঝি হয়। বড় বড় দুঃখের সময়ে অতি তুচ্ছ কারণ নিয়ে বিলাপ করে মানুষ।

মণিদীপা ছাড়ার পাত্রী নয়। প্রবীরকে বলল,—ওকে পাত্তা দিয়ো না তো। বেশি দিগ্‌গজ হয়ে বেশি পাখনা গজিয়েছে, না?

—আহ্, তুমি যাও তো। মণিদীপাকে প্রায় ঠেলে বাইরে পাঠিয়ে দিল প্রবীর। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে আবার বসেছে মেয়ের পাশে। বন্ধুর স্বরে বলল,—দেখছিস তো, তোর মা কেমন খেপে গেছে! মন থেকে সব ঝেড়ে ফ্যাল, নরমাল হ।

দয়িতা কষ্ট করে হাসল,—প্লিজ বাবা, এ বিয়ে আমি করতে পারব না।

—তুই আমাদের মানসম্মানের কথাও ভাববি না মুনিয়া? প্রবীরের দু চোখ করুণ হয়ে গেল। যেন মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির জাঁদরেল অফিসার প্রবীর মিত্র নয়, যেন এক দীনহীন বাপ মেয়ের কাছে ভিক্ষে চাইছে,—আমাদের মুখটা তুই রাখ মুনিয়া।

—তুমিও কেন বুঝছ না বাবা, আমার পক্ষে সৌমিককে বিয়ে করা সম্ভব নয়। আমার উপায় নেই।

প্রবীরের ভুরুতে ভাঁজ পড়ল। মুখ চোখের ভাষা বদলে গেছে। গলার স্বরও,—তুই কি আর কাউকে ভালবাসিস?

দয়িতা চমকে বাবার দিকে তাকাল। পরক্ষণে মাথা নামিয়ে নিয়েছে। মৃদু স্বরে বলল,—হুঁ।

—কে সে?

উত্তর নেই।

—আমাদের চেনা কেউ?

—না।

—তোর ইউনিভার্সিটির ছেলে?

—না।

—তা হলে কলকাতার?

—না।

—তবে কে সে?

আবার দয়িতার মুখে শব্দ নেই।

এতক্ষণে বুঝি প্রবীরেরও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল,—হেঁয়ালি করছিস কেন? যাকে ভালবাসিস তাকে নিয়ে আয়।

দয়িতার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল,—তাকে আনা যাবে না।

—কেন, সে কি হিমালয় পর্বত?

দয়িতা আবার চুপ করে গেল। মনে মনে বলল, তার চেয়েও বড়।

প্রবীর সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল,—কী করে সে? রাস্তার লোফার টোফার নাকি?

দয়িতা মুখে কুলুপ এঁটে রইল। মনে মনে বলল, ছি বাবা, ও কথা বললে তোমার জিভ খসে যাবে।

প্রবীর আর থাকতে পারল না, বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। পায়চারি করছে ঘরে। উত্তেজিত স্বরে গজগজ করছে,—আমি বুঝতে পারছি না হোয়াট ননসেন্স ইজ গোয়িং অন! আমাদের পছন্দ করা ছেলেকে তুমি বিয়ে করবে না, তোমার পছন্দের ছেলেকে তুমি নিয়ে আসবে না, তা হলে ডেডলক অবস্থাটা কাটবে কী করে? আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শিদের যে বলব বিয়েটা ভেঙে দিচ্ছি, তার তো একটা গ্রাউন্ড লাগবে, না কি?

দয়িতা পুট করে বলে উঠল,—ছেলেটার নামে যা হোক কিছু রটিয়ে দাও। বলে দাও, আগে জানতে না, এখন জেনেছ!

—ছিঃ, ছি মুনিয়া, একটা নিরীহ ভাল ছেলের নামে আমি বদনাম রটাব, এই পরামর্শ দিচ্ছ? এই শিক্ষা পেয়েছ তুমি?

প্রবীরের ধিক্কার তীক্ষ্ণ শলাকার মতো বিঁধল দয়িতাকে। একটুক্ষণ মাথা হেঁট করে রইল দয়িতা। তারপর ভার গলায় বলল,—তা হলে সত্যি কথাটাই বোলো বাবা। বোলো, তোমার মেয়ে অন্য কাউকে ভালবাসে, সে এ বিয়ে করতে চাইছে না।

প্রবীর মেয়ের পাশে এসে বসল আবার। হাত রাখল মেয়ের মাথায়,—লোক জানাজানির দরকারটা কী? কাকে তুই ভালবাসিস আমায় খুলে বল, আমি তার সঙ্গেই তোর বিয়ে দেব। হ্যাঁ, বাসুদেববাবুদের কাছে আমাদের একটু ছোট হতে হবে, কিন্তু কী আর করা...! বুঝছিসই তো, অলরেডি লাখ টাকার ওপর খরচা হয়ে গেছে...খেটে রোজগার করা পয়সা...

প্রবীরের স্পর্শে বুকটা টলমল করে উঠল দয়িতার। ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলল,—তার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না বাবা। হতে পারে না।

—কেন?

দয়িতার গলা কেঁপে গেল,—হি ইজ অলরেডি ম্যারেড।

—মানে? চাবুক খেয়ে যেন ছিটকে সরে গেল প্রবীর,—তুই একটা বিবাহিত লোকের সঙ্গে প্রেম করছিস? ভেবেছিস কী তুই, অ্যাঁ? স্বাধীনতা দিয়েছি বলে মাথায় চড়ে বসেছিস? এটা স্বাধীনতা, না স্বেচ্ছাচার? তোর এত বড় আস্পর্ধা, সেটা আবার তুই আমার সামনে উচ্চারণ করিস?

দয়িতা মিনমিন করে বলল,—আমি তো বলতে চাইনি বাবা, তুমি জোর করলে।

—ফের কথা। চুপ। চুপ। প্রবীর গর্জে উঠল,—কে সেই লোক, যে আমার মেয়ের সঙ্গে অ্যাডাল্টারি করছে? আমি পুলিশে খবর দেব, তার কোমরে দড়ি দিয়ে রাস্তায় ঘোরাব...

প্রবীরের চিৎকারে মণিদীপা আর বুম্‌বাও ছুটে এসেছে ঘরে। তাদের উপেক্ষা করে দয়িতা বেপরোয়ার মতো বলে উঠল,—যাকে চেনো না, তার সম্পর্কে তুমি উলটোপালটা কথা বলতে পারো না বাবা। আমি তাকে ভালবাসি, সেটা আমার ব্যাপার। তাকে জড়াচ্ছ কেন?

ক্রোধে বিমূঢ় হয়ে গেছে প্রবীর, মুখে আর কথা ফুটছে না।

মণিদীপা হাউমাউ করে উঠল,—কী হয়েছে গো? কাকে কী জড়ানোর কথা হচ্ছে?

—আর কী, আমাদের বংশের মুখে চুনকালি পড়ে গেল। প্রবীরের গলা ঘড়ঘড় করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠল,—তোমার গুণধর মেয়ে কোন এক বিয়েথা করা বজ্জাতের সঙ্গে প্রেম করছে। সেই জন্যই তিনি বিয়ে করতে পারবেন না।

—ও মা, এ কী সর্বনেশে কথা গো! মণিদীপা ডুকরে উঠল, মেয়েকে ঝাঁকাচ্ছে দু হাতে,—এই মুনিয়া, কী বলছিস তুই...!

দয়িতার আর লজ্জাসংকোচ নেই। দ্বিধা কেটে গেছে তার, স্পষ্ট গলায় বলল,—তোমরা এমন করছ, যেন এই ঘটনা পৃথিবীতে প্রথম ঘটল? হ্যাঁ, আমি একজনকে ভালবাসি। ইন্সিডেন্টালি অর অ্যাক্সিডেন্টালি হি ইজ ম্যারেড। যেহেতু একজন বিবাহিত লোককে বিয়ে করা আইন পারমিট করে না, সেহেতু আমি বিয়েই করব না। এতে তোমাদের এত গায়ে লাগছে কেন? আমি কীভাবে আমার জীবনটাকে লিড করব, সেটাও কি আমার বেছে নেওয়ার অধিকার নেই?

—চোওওপ। যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। বুনো ষাঁড়ের মতো তেড়ে এল প্রবীর। এখন তার আর হিতাহিত জ্ঞান নেই, সপাটে চড় কষিয়েছে মেয়েকে। দাঁত দাঁত ঘষে বলল,—তোমার ভালবাসা আমি ঘুচিয়ে দেব। কোনও বাঁদরামি আমি সহ্য করব না। সৌমিককেই তোমায় বিয়ে করতে হবে। আজ থেকে তুমি বাড়ি থেকেই বেরোবে না। টিল ইওর ম্যারেজ।

খাটের কোণে ছিটকে পড়েছিল দয়িতা। বুঝি বা বাবার চণ্ডমূর্তিতে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল কয়েক মুহূর্ত। কখনও কোনওদিন বাবা তার গায়ে হাত তোলেনি, আজই প্রথম...। হতচকিত দশা কাটিয়েই ফুঁসে উঠেছে আবার,—তোমরা কি ভেবেছ ফোর্স করে আমার বিয়ে দেবে? পারবে না।

—দেখি পারি কি না। দেখি তোর কোন লাভার আটকায়!

—লাভার আটকাবে কেন? আমিই আটকাব। আমিই পুলিশে খবর দেব। দেখব একটা সাবালিকা মেয়েকে কী করে বিয়েতে বসাও।

—শুনছ? শুনছ? মেয়ের কথা শুনছ?

—কিছু বলার নেই, কিচ্ছু বলার নেই...। মণিদীপা কেঁদে ফেলল,—এই মেয়েকে আমি গর্ভে ধারণ করেছিলাম? কেন আঁতুড়েই নুন খাইয়ে মেরে ফেলিনি।

—ও মরে গেছে। আমার চোখে মরে গেছে। আজ থেকে ভাবব আমার মেয়ে নেই। বলতে বলতেই আবার প্রবীর তেড়ে এসেছে মেয়ের দিকে। আগুনের গোলার মতো বনবন ঘুরছে তার দু চোখ,—স্বাধীনতা দেখাচ্ছ? সাবালিকা দেখাচ্ছ? আমারই পয়সায় খাবে, আর আমারই বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবে? শে-এ-ষ বারের মতো বলছি, মুনিয়া...

শেষ বারের মতো কী বলছে প্রবীর শোনা হল দয়িতার। বুম্‌বা টেনে সরিয়ে নিয়ে গেছে বাবাকে।

—ছি ছি ছি ছি মুনিয়া, তুই তাহলে এএই! মণিদীপা দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে, দু দিকে মাথা ঝাঁকাচ্ছে,—তোর বাবা তোকে কত ভালবাসে, তাকে তুই এইভাবে আঘাত দিলি? তোর নরকেও ঠাঁই হবে?

বুম্‌বার গম্ভীর স্বর শোনা গেল,—মা, চলে এসো।

প্রবল ঝড়ের পর নিথর হয়ে গেছে গোটা বাড়ি। যেন শ্মশানভূমি। কিংবা কবরখানা। আধুনিক ফ্ল্যাটজীবনের সুবিধে আছে, কেউ কারও অন্দরমহলে উঁকি দেয় না, এই চিৎকার কান্নাতেও টনক নড়েনি কোনও প্রতিবেশীর। হয়তো তারা আড়ালে ফিসফিস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবে, তবে মুখে কিছু বলবে না। আজ অবশ্য সেই সম্ভাবনাও কম, আনন্দের ফোয়ারা ছুটছে বাইরে। পাশের ফ্ল্যাটে ক্রিসমাস ইভের পার্টি চলছে, হঠাৎ হঠাৎ শোনা যাচ্ছে হর্ষধ্বনি। দেয়াল ফুঁড়ে আসা ওই আওয়াজ আঘাত করছে এ ফ্ল্যাটের নৈঃশব্দ্যকে, আরও প্রকট হয়ে উঠছে শব্দহীনতা।

দয়িতা বসে আছে, বসেই আছে। যেন সে এক দারুভূত প্রতিমা, নড়বেই না কোনওদিন। চোখের কোলে শুকনো জলের রেখা, গা থেকে খসে পড়া শাল লুটোচ্ছে বিছানায়, তাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে কনকনে হাওয়া। এখন আর শীত তাপ কোনও কিছুরই অনুভূতি নেই দয়িতার।

রাতটা কেটে গেল। কী করে কাটল দয়িতা নিজেও জানে না। মগ্ন চৈতন্যের ওপার থেকে বুম্‌বা বুঝি ডেকেছিল একবার, খেতে বলেছিল, দয়িতা সাড়াও দেয়নি। একসময়ে জড়িয়েও এসেছিল দু' চোখ, অজান্তেই।

তন্দ্রা ছিঁড়তেই টানটান হল দয়িতা। পলকের জন্য বোধিসত্ত্বর মুখটা মনে পড়ল। পরক্ষণে বাবা-মার মুখ, কালকের ঘটনার অনুপুঙ্খ। ফোঁস ফোঁস করে বড় বড় কয়েকটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, আপন মনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল কিছুক্ষণ।

...নাহ্, বোধিসত্ত্বকে ছাড়া দয়িতা বাঁচবে না...

অচঞ্চল পায়ে বাথরুম থেকে ঘুরে এল দয়িতা। কালকের কিটসব্যাগটা বিছানাতেই পড়ে আছে, এখনও খোলা হয়নি, ওয়ার্ড্রোব থেকে আরও দুটো সালোয়ার কামিজ বের করে চেপে চেপে ভরে নিল তাতে। শান্ত মাথায় টেবিল চেয়ারে বসে চিঠি লিখল একটা। বাবার উদ্দেশে। সে যে ক্যাম্পাস টাউনেই ফিরছে, সেটা বাড়ির লোকের জানা দরকার, না হলে থানা পুলিশের হুজ্জোত হতে পারে। তা ছাড়া যাদের সে কোনওভাবেই সুখী করতে পারল না, তাদের উতলা করে কী লাভ!

চিঠিটাকে টেবিলে খোলা অবস্থায় রেখে দয়িতা কিটসব্যাগ কাঁধে তুলে নিল। মায়াভরা চোখে ক্ষণিক তাকিয়ে রইল বিছানার দিকে, ঘরটাতেও চোখ বুলোল। আর হয়তো কোনওদিনই এখানে ফেরা হবে না।

ড্রয়িংস্পেসে এসেও পা আচমকা মাটিতে গেঁথে গেল দয়িতার। বাড়ির সকলে এখন গাঢ় ঘুমে। দয়িতা চোখ বুজে কান খাড়া করল। নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায় কি?

বাঁ হাতের চেটোয় চোখের কোণ মুছে নিল দয়িতা। নিঃসাড়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল।

দয়িতার সামনে এখন এক অন্ধকারমাখা ভোর। কুয়াশায় ঢাকা।

বারো

স্লিপ পাঠিয়ে হোস্টেলের বাইরের গেটে অপেক্ষা করছিল সৌমিক। সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা টেনশানেও ভুগছিল। দুম করে এভাবে চলে আসাটা কি উচিত হল তার? যদি এখন দয়িতা দেখা না করে? যদি দরজা থেকেই হাঁকিয়ে দেয়?

বছরের শেষ দিন আজ। জব্বর ঠাণ্ডায় কলকাতার চেয়েও শীতটা এখানে অনেক বেশি, সম্ভবত খোলামেলা বলেই। প্রায় একটা বাজে এখন, অর্থাৎ প্রখর মধ্যাহ্ন, অথচ রোদ্দুরের তেজ দেখে তা টের পাওয়ার উপায় নেই, কেমন যেন মরা মরা ভাব। তাপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই, শুধু রংটাই আছে। বইছে হিমমাখা কনকনে হাওয়া, জামা সোয়েটার ভেদ করে ঢুকে যাচ্ছে হাড়গোড়ে। ঠাণ্ডার ঝাপটায় চারদিকের গাছপালা কাঁপছে ঠকঠক।

প্রতীক্ষার প্রতিটি মুহূর্ত অনন্ত দীর্ঘ মনে হয়। মাত্র পাঁচ মিনিটেই হাঁপিয়ে উঠেছিল সৌমিক, ঝোঁকের মাথায় ছুটে আসার মূর্খামির জন্য নিজেকেই ধমকাচ্ছিল। এমন সময়ে ফিরল মহিলাটি।

দরজা থেকেই ঘোষণা করল,—দয়িতা মিত্র নেই।

সৌমিক এগিয়ে গেল। সন্দিগ্ধ স্বরে বলল,—তা কী করে হয়? হোস্টেলেই তো থাকার কথা।

—একটু আগেও ছিল। এখন ঘর তালাবন্ধ।

—গেছে কোথায়?

—বলতে পারব না।

—আপনাদের...খাবার ঘরে নেই তো?

—মেয়ে কম, খাওয়া দাওয়া অনেকক্ষণ চুকে গেছে।

—ও।

—এলে কিছু বলতে হবে?

সৌমিক একটুক্ষণ ভাবল। যদি দেখাই না হয়, মিছিমিছি আগমনবার্তা জানিয়ে লাভ কী? নিজেকে কী তাতে আরও খেলো করা হবে না? এমনিতেই হয়তো দয়িতা হাসছে মনে মনে, বিয়ের শখ উথলে ওঠা ছেলেটাকে জব্দ করতে পেরেছে বলে...।

গলা ঝাড়ল সৌমিক—থাক, দরকার নেই।

—আপনি আসছেন কোথ্‌থেকে?

যাক, শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা করেছে তা হলে! সৌমিক উত্তর দিল না, ঘুরে হাঁটা শুরু করল। অন্যমনস্ক মুখে, ফাঁকা চোখে। টানটান স্নায়ুতন্ত্রী ঝিমিয়ে পড়েছে সহসা। সেই কোন ভোরে ওঠা, এতটা পথ আসা, এত আশঙ্কা উদ্বেগ প্রশ্ন উত্তেজনা, সবই অর্থহীন মনে হচ্ছে এখন। দয়িতা মিত্র প্রত্যাখ্যান করেছে বলে কি সৌমিক বসুরায়ের জীবন অন্ধকার হয়ে গেল? ফুঃ। আছেটা কী দয়িতার মধ্যে? রূপ? গুণ? ফিগার? স্মার্টনেস? সবেতেই তো মেরে কেটে অ্যাবাভ অ্যাভারেজ। সৌমিক টুসকি বাজালে ওর থেকে ঢের ঢের গুণবতী মেয়ে সৌমিকের দরজায় লাইন লাগাবে। তা হলে সৌমিক সত্যিই এল কেন? কবিতা বসুরায় তো বলেইছে, ওই বিশেষ দিনে যেখান থেকে হোক এক হুরিপরি জোগাড় করে আনবে...।

কথাটা মনে পড়তেই সৌমিকের গা গুলিয়ে উঠল। আবার সেই কবিতা বসুরায়ের চক্কর! একটি বারের জন্য হলেও সে কবিতা বসুরায়ের পাতা ফাঁদে প্রলুব্ধ হয়েছিল, ওই মেয়ে পুতুলখেলার আয়োজন লাথি মেরে ভেঙে দিয়েছে। শুধু এই জন্যই তো দয়িতার কাছে সৌমিকের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু সেই বোধই বা জাগে কই! উলটে এক হীনম্মন্যতাবোধ সর্বক্ষণ কুরে কুরে খেয়ে চলেছে সৌমিককে। বুক আচ্ছন্ন হয়ে আছে তীব্র অপমানে। ঝোড়ো মেঘের দাপাদাপি চলছে সেখানে, গর্জন বাজছে, বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে...। এক এক বার মনে হচ্ছে মেয়েটাকে সামনে পেলে গলা মুচড়ে মেরে ফেলে, পরক্ষণে এক অন্তিম হাহাকারে ছেয়ে যাচ্ছে হৃদয়। কান্না পাচ্ছে সৌমিকের।

কেন এমন হল সৌমিকের? কী হল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৌমিক হাঁটছে। উদ্দেশ্যহীন। শরীর ছেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ, পেট চুঁইচুঁই করছে। ইউনিভার্সিটির মেন গেটের সামনে এসে এদিক ওদিক দেখল। পথ প্রায় সুনশান, একটি পড়ুয়াও চোখে পড়ে না। ছুটি বলেই কি? এত ঝকঝকে রাস্তাঘাট, সার সার বৃক্ষরাজি, এত সুন্দর সুন্দর ছড়ানো ছেটানো বিল্ডিং, সবই বড় নিঝুম। দেখে মনে হয় কোনও জাদুছোঁয়ায় ঘুমিয়ে আছে জায়গাটা। এই নিদ্রিত পুরীতে কোথায় একা একা ঘুরে মরছে দয়িতা?

মেন গেট ছাড়িয়ে খানিক গেলে চায়ের দোকান। খদ্দেরহীন ফাঁকা বেঞ্চি হু হু করছে, ঝাঁপের ভেতর আলোয়ান মুড়ি দিয়ে ঢুলছে দোকানদার।

সৌমিক পায়ে পায়ে দোকানে এল,—চা হবে ভাই?

—শুধু চা?

—আর কী আছে?

লোকটা চোখ কচলাল,—রুটিটোস্ট হবে। ডিমভাজা হবে। বিস্কুট আছে...

—টোস্ট ডিমভাজাই দাও। সৌমিক বেঞ্চিতে বসল,—আগে এক কাপ চা।

স্টোভ জ্বালিয়ে কেটলি বসাল লোকটা। ডিম গুলছে বাটিতে, পেঁয়াজ লঙ্কা কুচোচ্ছে। রাস্তা কাঁপিয়ে, ধুলো উড়িয়ে একটা ট্রাক ছুটে গেল। উড়ন্ত ধুলো থিতিয়ে আসার আগেই সৌমিকের চোখের মণি স্থির। দয়িতা না?

হ্যাঁ, দয়িতাই তো। ইউনিভার্সিটি মেনগেটের পাশের ছোট্ট দরজাটা দিয়ে বেরিয়েছে দয়িতা, মাথা নিচু করে হোস্টেলের দিকে চলেছে। পরনে কালো জিনস্, গায়ে কালো শাল, চুল খোলা। যেন মূর্তিমতী শোকপ্রতিমা।

সৌমিক কিছুতেই সুস্থির বসে থাকতে পারল না। চেঁচিয়ে ডাকল—দয়িতা?

দয়িতা চমকে দাঁড়াল। চোখ কুঁচকে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। সৌমিককে চিনতে যেটুকু সময় লাগল সেটুকুই বুঝি স্থাণু ছিল দয়িতা, তারপর এগিয়ে এল অনাড়ষ্ট ভঙ্গিতে। ভুঁরু বেঁকিয়ে কৈফিয়তের সুরে জিজ্ঞাসা করল,—তুমি এখানে?

সরাসরি আপনি থেকে তুমি। সম্ভাব্য সম্পর্ক ছিঁড়ে যাওয়ার সূত্রেই কি এই তাচ্ছিল্য?

সৌমিকের গলা আপনা-আপনি তেতো হয়ে গেল,—বুঝতেই পারছ কেন এসেছি।

—না, বুঝলাম না।

কথা সাজানোই ছিল, সৌমিক অভিভাবকের সুরে উগরে দিল,—তুমি কিন্তু ভারী অন্যায় কাজ করেছ।

—কী অন্যায়? কীসের অন্যায়? আমার জীবন আমার মতো করে চালাব, এতে ন্যায় অন্যায়টা কী আছে শুনি?

কী তেজ! কী ঔদ্ধত্য! স্বাভাবিক নার্ভাসনেসটা উবে গেল সৌমিকের। রুক্ষ স্বর বেরিয়ে এল,—বলতে চাও, তোমার ওভাবে বাড়ি থেকে চলে আসাটা ঠিক কাজ হয়েছে? জানো, তোমার বাবা-মার কী অবস্থা এখন!

—অনুমান করতে পারি। কিন্তু আমি হেল্পলেস। ওদের হ্যাঁ-তে হ্যাঁ মিলিয়ে চলা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

—তুমি আমায় বলতে পারতে। আমিই নয় বিয়েটা...

—তুমি বিয়ে ভেঙে দিতে? দয়িতার ঠোঁট বেঁকে গেল,—আমি তোমায় অ্যাপ্রোচ করিনি?

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—সে তো কপট অ্যাপ্রোচ। সৌমিক ফস করে বলে ফেলল,—তুমি আমায় মিথ্যে বলেছিলে।

—মিথ্যে?

—নয়? আমি তোমাকে স্পেসিফিকালি জিজ্ঞেস করিনি, তুমি কাউকে পছন্দ করো কি না? তুমি না বলেছিলে বলেই না আমি...। কথাগুলো বলতে পেরে অনেকটা যেন তৃপ্তি বোধ করল সৌমিক। হাত উলটে বলল,—নিজে দোষ করলে, আর শাস্তি পাচ্ছে বাবা-মা! আশ্চর্য!

—ডোন্ট টক লাইক এ গুরুঠাকুর। দয়িতা তর্জনী নাড়াল,—আমি পছন্দ করি না।

চা বানিয়ে ডাকছে লোকটা। ঘুরে গিয়ে গ্লাস হাতে নিল সৌমিক। খানিক তফাত থেকে নিষ্পলক চোখে দেখছে দয়িতাকে। ওই রাগ রাগ মুখেও কী অপরূপ শিশুর সারল্য। বিচিত্র এক মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল সৌমিক। মেয়েটা নেশার মতো টানছে, এখনও! বোকা বোকা মুখে হাতের গ্লাস নেড়ে জিজ্ঞাসা করল দয়িতাকে চা খাবে কি না, অবাধ্য ঘোটকীর মতো দু দিকে মাথা নাড়ল দয়িতা।

নরম গলায় সৌমিক ডাকল,—ঠিক আছে, খেতে হবে না। এ দিকে এসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

দয়িতা এল বটে, তবে বেশ খানিকটা ব্যবধান রেখে দাঁড়াল। অবজ্ঞার স্বরে বলল,—আমার কিন্তু তোমার সঙ্গে কোনও কথা নেই।

সৌমিক মনে মনে বলল, জানি তো।

ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল,—বাবা-মার সঙ্গে তুমি মিটমাট করে নাও। আমাকে তোমায় বিয়ে করতে হবে না।

দয়িতা কূট চোখে তাকাল,—তুমি কি বাবা-মার দূত হয়ে এসেছ?

—না। কেউ জানেই না আমি এখানে এসেছি।

—ও। মহৎ সাজার শখ হয়েছে?

টিটকিরিটা হজম করে নিল সৌমিক। এর চেয়ে অনেক বড় অপমানই তো সে আত্মস্থ করেছে। নয় কি? গলা নামিয়ে বলল,—আমার কিছু সাজারই বিন্দুমাত্র শখ নেই। আমি শুধু চাই আমাকে কেন্দ্র করে একটা ফ্যামিলিতে বাবা-মার সঙ্গে মেয়ের রিলেশান নষ্ট না হোক।

—ধন্যবাদ। আমার সঙ্গে আমার বাবা-মার কী রিলেশান হবে, সেটা আমিই বুঝে নেব। এ ব্যাপারে বাইরের লোকের নাক গলানোর প্রয়োজন নেই।

কথাগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে বলল দয়িতা, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাঁটা দিয়েছে। তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুক ভারী হয়ে এল সৌমিকের। অর্থহীন মন-কেমন করা, যুক্তিহীন বিষাদ। দয়িতার কাছ থেকে অন্য কোনও ব্যবহার কি প্রত্যাশিত ছিল? সৌমিক কি ভেবেছিল তাকে দেখে উদ্বাহু নৃত্য করবে দয়িতা?

টোস্ট অমলেট রেডি। সৌমিককে ডাকছে লোকটা। বেঞ্চিতে এসে বসল সৌমিক। খিদে মরে গেছে, জিভ বিস্বাদ। পাউরুটির কোণ খুঁটল একটু, মুখে তুলতে পারল না। প্লেট সরিয়ে পার্স বের করল,—কত হয়েছে ভাই?

—খেলেন না দুটো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ভাল্লাগছে না।

লোকটা চোখ পিটপিট করল,—চার টাকা দিন।

দাম মিটিয়ে উঠে পড়েছে সৌমিক, আবার দয়িতা। যেভাবে হনহন চলে গিয়েছিল, সেভাবেই ফিরে আসছে গটগটিয়ে। সৌমিকের সামনে এসে ঝপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল,—অ্যাই, তুমি কি শুধু বাবা-মার কথা শোনাতে এসেছিলে?

সৌমিক থমকে গেল। সত্যি তো, কী কথা বলতে এসেছিল সে? তার ছুটে আসাটা তো নেহাতই এক অন্ধ আবেগের তাড়না। কেন দয়িতা বিয়েটাকে এগোতে দিয়েও ভেঙে দিল, কেন তাকে শুধুমাত্র অপমান করল, এ সব প্রশ্ন আর করার কি কোনও মানে হয়? আসল সত্যিটা হল, সে মেয়েটাকে ভালবেসে ফেলেছে, পতঙ্গের মতো ছুটে এসেছে আগুনের দিকে। কিন্তু এ কথাও কি আর উচ্চারণ করা যায়?

সৌমিক ঢোক গিলে বলল,—যা বলার তুমি তো বলেই দিয়েছ। আমার আর কী বলার থাকতে পারে?

কথাটায় চোরা ক্ষোভ ছিল, বুঝি অনুভব করতে পারল দয়িতা। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। তারপর হাঁটা শুরু করল। পাশাপাশি।

অপাঙ্গে এক ঝলক সৌমিককে দেখে নিয়ে হঠাৎ নরম গলায় বলল,—আমি বুঝতে পারছি কাজটা আমার ঠিক হয়নি। তুমি হিউমিলিয়েটেড ফিল করছ। তোমার জায়গায় আমি থাকলে আমিও হয়তো...। সরি, আয়াম এক্সট্রিমলি সরি।

সৌমিক নীরব।

দয়িতা আবার একটু সময় নিয়ে বলল,—তুমি খুব ভাল ছেলে সৌমিক। তোমাকে রিজেক্ট করার কোনও কারণ আমার কাছে নেই। কিন্তু কোনও কোনও ব্যাপারে মানুষ কখনও কখনও খুব অসহায় হয়ে পড়ে। আয়াম রিয়েলি হেলপ্‌লেস।

প্রায় বিড়বিড় করে সৌমিক প্রশ্ন করে ফেলল,—ভাগ্যবানটি কে জানতে পারি?

দয়িতা ঝটিতি মুখ তুলেছে। ভুরু কুঁচকে সৌমিককে দেখে নিল একটু। তারপর বলল,—তোমাকে বলাই যায়। ইউ হ্যাভ সাম রাইট টু নো। আমি একজন অধ্যাপককে ভালবাসি। প্রফেসার বোধিসত্ত্ব মজুমদার। নামটা শুনেছ?

—সেই বিজ্ঞানী? কদিন আগে কাগজে যাঁর বিরাট ইন্টারভিউ বেরিয়েছিল?

—হুঁ। শুধু বিজ্ঞানী নন, তিনি একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল সৌমিক—কিন্তু তিনি তো অনেক সিনিয়ার লোক। এজেড মানুষ।

—ভালবাসার সঙ্গে বয়সের কী সম্পর্ক? দয়িতার স্বরে সামান্য বিরক্তি যেন,—তিনি মোটেই বুড়ো নন। ফিজিকালি মেন্টালি অনেকের থেকে ইয়াং।

—তাঁর ফ্যামিলি নেই?

—অফকোর্স আছে। বউ আছে, কলেজে পড়া ছেলে আছে...। তাতে আমার কী আসে যায়? আমি তাঁকে ভালবাসি, তিনি আমাকে ভালবাসেন...ব্যাস।

সৌমিকের বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছিল না। মেয়েটা পাগল, না নির্বোধ? বয়স্ক অধ্যাপকরা বেশির ভাগই ধোঁয়াটে স্বভাবের মানুষ হয়। বিশেষ করে বিজ্ঞানীরা। সৌমিক যদ্দূর জানে, এদের সাংসারিক জ্ঞানগম্যিও অত্যন্ত কম। এমন একটা লোকের পায়ে মন প্রাণ নিবেদন করে কী পাবে দয়িতা? সেই অধ্যাপকই বা কী? একটা বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীতিজ্ঞান বিবর্জিত হয়ে লটঘট চালিয়ে যাচ্ছে!

দয়িতা চুল দুলিয়ে হাসল,—আমি জানি তুমি কী ভাবছ। আমাদের সম্পর্কের পরিণতি কী, তাই তো? বলতে বলতে হঠাৎ দয়িতা উদাস। দূরমনস্ক। শীতের বাতাসের মতো ফিসফিসে স্বরে বলে চলেছে,—সব সম্পর্কেরই কি একটা নিখুঁত গোল পরিণতি থাকে? তাঁরও কিছু হেলপ্‌লেস্‌নেস্‌ আছে, বাইন্ডিং আছে। আমার ফিউচার আমি এখন তাঁর ওপরেই ছেড়ে রেখেছি। জানি, কনভেনশনাল বাবা মার পক্ষে এটা হজম করা কঠিন। কঠিন কেন, অসম্ভব। অ্যান্ড ফর দ্যাট রিজন্‌ আমি তাদের ছেড়ে চলেও এসেছি। ধরে নিতে পারো চিরকালের জন্য।...এই যে হোস্টেল, এখানেও আমি বেশি দিন থাকব না। দরকার হলে টাউনে চলে যাব। টিউশনি খুঁজছি, নিজের খরচা নিজে চালাব। ফাইনাল পরীক্ষা অব্দি অবশ্য এভাবেই দাঁতে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকতে হবে, তার পর একটা চাকরি ঠিক জোগাড় করে নেব। বিপুলা এই ধরণীতে একটা মানুষের পেটের ভাত জোগাড় করার মতো বিদ্যে আমার আছে।...বুঝতে পারছ, কথাগুলো তোমায় কেন বলছি?

সৌমিক শুকনো গলায় বলল,—কেন আর! আমাকে শোনাতে ইচ্ছে করছে, তাই।

—আজ্ঞে না স্যার। আমি চাই আমার প্রতিটি কথা তুমি বাড়িতে গিয়ে রিপোর্ট করো। নট অ্যাজ এ খোঁচড়, বাট অ্যাজ এ মেসেঞ্জার। বাবাকে বোলো, যখন তাদের কথা শুনলামই না, তখন তাদের ওপর আর ডিপেন্ডেন্টও থাকতে চাই না। এটাই তো লজিকাল, নয় কি?

সৌমিকের মুখ গোমড়া হল,—আমি কেন তাঁদের বলতে যাব? আগেই তো বললাম, কেউ আমাকে এখানে পাঠায়নি, আমিও কাউকে বলে আসিনি।

—তাহলে তুমিই জেনে রাখো। আমার সিচুয়েশানটা তো বুঝলে, অতএব নো মোর হার্ড ফিলিংস। বলেই দয়িতা হাত বাড়িয়ে দিল,—তুমি কি এখন থেকে আমার বন্ধু হতে পারো না?

সৌমিক সম্মোহিতের মতো ধরে ফেলল হাতখানা। খুব কোমল হাত নয়, তবে বেশ উষ্ণ। ছুঁলেই যেন শিরা ধমনীতে বহমান রক্তকণিকারা চঞ্চল হয়ে ওঠে।

হাতটা হাতে রেখেই সৌমিক অস্ফুটে বলল,—তোমায় একটা কথা বলব?

—কী?

—তোমার কি মনে হয় না, তুমি ভুল করছ?

—জীবনে কোনটা ভুল, কোনটা ঠিক, সেটা কি এত সহজে হিসেব করা যায়? আমি মুহূর্ত নিয়ে বাঁচতে ভালবাসি, সৌমিক। আমার কাছে এই মুহূর্তটাই সত্যি। তাঁকে ভালবাসাটাই একমাত্র ট্রুথ। ফিউচারে কী হবে, না হবে ভেবে আমি এই মুহূর্তগুলোকে নষ্ট করব কেন?

সৌমিকের বুক চিনচিন করে উঠল। এই যে এখন দয়িতার হাতে হাত, এই যে এখন বিন্দু বিন্দু দয়িতা চারিয়ে যাচ্ছে তার গভীরে, এক আশ্চর্য মানবীর ঘ্রাণে সুরভিত হয়ে উঠছে শীতের দুপুর...এই মুহূর্তটাও কি সত্যি নয়?

হোস্টেলের গেট এসে গেছে। দাঁড়িয়ে পড়েছে দয়িতা,—তুমি কি এক্ষুনি ফিরে যাবে?

সৌমিক হাতটা ছেড়ে দিল,—যাই।

ভারী মধুর হাসল দয়িতা,—রাগ নেই তো আর?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—নাহ্। সৌমিক দুদিকে মাথা নাড়ল। মনে মনে বলল, তোমার সঙ্গে সে সম্পর্ক গড়ে উঠল কই!

দয়িতা হাসিটা ধরেই আছে। বলল,—আমাকে ভুলে যেও প্লিজ। মনে কোরো একটা খুব যাচ্ছেতাই মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিক হয়েছিল, কপালজোরে বেঁচে গেছ।

সৌমিক ভারী নিঃশ্বাসটাকে বেরোতে দিল না বাইরে। মৃদু হেসে বলল,— তিনটে কতয় একটা ট্রেন আছে না?...ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

হাঁটতে হাঁটতে মোড়ের মাথায় এসে একবার ফিরে তাকাল সৌমিক। মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল হয়তো দাঁড়িয়ে আছে দয়িতা! নেই।

স্টেশনে পৌঁছে সৌমিক দেখল এখনও কিছুটা সময় আছে। টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মের বাইরে এল সৌমিক। আবেগ, অভিমান অনেকটা থিতিয়ে এসেছে, মনে এখন ভর করেছে এক অদ্ভুত নির্লিপ্তি। দয়িতার কথা যেন আর ভাবতেই ইচ্ছে করছে না, বরং খিদেটা চাগাড় দিচ্ছে।

এদিক ওদিক খুঁজল সৌমিক। দূর একটাও ভাল রেস্টুরেন্ট নেই। যা আছে সবই ছোটখাটো পাইস হোটেল। অপরিচ্ছন্ন চেহারা, ম ম করছে আঁশটে গন্ধ। দোকানি ব্যাপারিরাই এই সব রদ্দি খাবার দোকানে ভিড় করে।

চিন্তাটা মাথায় আসতেই সৌমিক নিজের ওপর রেগে গেল খুব। এই বিরাগ, এই অপশ্রদ্ধা, এও তো সেই কবিতা বসুরায়ের দান। কী বিষাক্ত এক নাগপাশে তাকে বেঁধে ফেলেছে কবিতা বসুরায়। নিজের অজান্তে সৌমিকের রুচিবোধ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয় ওই কবিতা বসুরায়ের শেখানো নিয়মে।

প্রায় জোর করে একটা হোটেলে ঢুকল সৌমিক। ভিড়ের মধ্যেই বসল, কষা মাংস নিল এক প্লেট, সঙ্গে রুটি, ঠেসে ঝাল দিয়েছে মাংসে, খেতে খেতে চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে। একা মনে হেসে ফেলল সৌমিক। ব্যর্থ প্রেমের হতাশা কিনা শেষে মাংসের ঝোলের মধ্যে দিয়ে ফুটে বেরল। রাগটাও, কান্নাটাও। সামনের বেঞ্চি থেকে একটা হাটুরে লোক জুলজুল চোখে দেখছে সৌমিককে, বোধহয় ওই মিটিমিটি হাসির অর্থ নিরূপণের চেষ্টা চালাচ্ছে। সৌমিকের ভ্রূক্ষেপই নেই, কচকচ পেঁয়াজ চিবোচ্ছে, এক চুমুকে গ্লাসের জল শেষ করে ফেলল। কবিতা বসুরায় যে মতলবই ভাঁজুক, সৌমিক আর বেলতলায় যাচ্ছে না। কনের বেনারসিটা মায়ের ভাগ্যেই নাচছে! হা হা!

ড্রামের ঘোলাটে জলে মুখ ধুয়ে কাউন্টারে পয়সা মেটাল সৌমিক, পরিতৃপ্ত মেজাজে মৌরি চিবোচ্ছে। সহসা চোখ আটকাল দোকানের বাইরে। সেই বারাসতের ছেলেটা! কাঁধে কিটস্ব্যাগ নিয়ে অলস মেজাজে স্টেশনের দিকে যাচ্ছে।

সৌমিক এগিয়ে গিয়ে ধরল ছেলেটাকে,—তুমি এখানে কোথায়?

বাবুয়াও অবাক হয়েছে। বলল,—আমার তো এখানেই বাড়ি। ক্যাম্পাস টাউনে। আপনি এখানে কোথায় এসেছিলেন?

—ওই ক্যাম্পাস টাউনেই। এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। বলেই সৌমিকের মগজ-কম্পিউটার জোর ঝাঁকুনি খেল একটা। জিজ্ঞাসা করল,—তোমার নামটা যেন কী বলেছিলে সেদিন?

—শুদ্ধসত্ত্ব। শুদ্ধসত্ত্ব মজুমদার।

—তুমি প্রফেসার বোধিসত্ত্ব মজুমদারের ছেলে?

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবুয়া হঠাৎই যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। দায়সারা ভাবে বলল,—হ্যাঁ।

সৌমিকের হৃৎপিণ্ড ধক ধক করে উঠল। হাঁটছে বাবুয়ার সঙ্গে সঙ্গে। কৌতূহলের কারণটা যেন অনুমানও না করতে পারে বাবুয়া, এমন ভাবে কথা শুরু করল,—তোমার বাবা তো বিখ্যাত ব্যক্তি।

বাবুয়া টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়েছে। আলগা চোয়াল ফাঁক করল শুধু।

সৌমিক ফের বলল,—আগের দিন যখন আলাপ হল, কই তখন তো বাবার কথা কিছু বলোনি? এত পণ্ডিত মানুষ...

—পরিচয় তো হয়েছিল আপনার সঙ্গে আমার। বাবা সেখানে আসবে কেন?

—তা বটে। সৌমিক মাথা দোলাল,—তোমার মা সেই দাদুর মৃত্যুর সময়ে গেছিলেন...চলে এসেছেন নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ। অনেক দিন।

—আমার সায়েনটিস্টদের সম্পর্কে ভীষণ কিউরিয়সিটি। সৌমিক হাসি হাসি ভাব ফোটাল মুখে,—কত গল্প শুনি সায়েনটিস্টদের...তোমার বাবা কী রকম? রাশভারী, অ্যাবসেন্ট-মাইন্ডেড?

—আমায় জিজ্ঞেস করছেন কেন? বাবুয়া একটু বিরক্ত মুখেই টিকিট কাউন্টার থেকে বেরিয়ে এল,—জানতে ইচ্ছে থাকলে আমার বাবাকে গিয়েই প্রশ্ন করুন।

—না, তুমি তো অনেক ক্লোজ থেকে দ্যাখো, তাই...। সৌমিক আবার খোঁচাল, তোমার বাবা খুব বইয়ের পোকা, তাই না?

—হুঁ।

—আমার বন্ধু বলছিল ইউনিভার্সিটিতে নাকি প্রফেসার মজুমদার সকলের প্রিয়, বাড়িতে নিশ্চয়ই ছাত্রছাত্রীদের খুব উৎপাত হয়?

—না। বাবা একা থাকাই পছন্দ করে।

—তুমি কি প্রত্যেক উইকেই বাড়ি আসো?

—না।

—কলকাতায় তুমি কী নিয়ে পড়ছ যেন?

—ইংলিশ।

—কেন, সায়েন্স পড়লে না কেন?... এত বড় একজন বিজ্ঞানীর ছেলে হয়ে...

বাবুয়া প্রশ্নটার উত্তর দিল না। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল,—আপনি কি এই ট্রেনেই ফিরছেন?

—হুঁ।... তোমার বাবা যেন এখন কী নিয়ে কাজ করছেন?

বাবুয়া এবারও উত্তর দিল না। ব্যস্ত মুখে ঘড়ি দেখছে। তাড়াহুড়ো করার ভঙ্গিতে বলল,—আমি একটু জল খেয়ে আসছি।

সৌমিক টের পাচ্ছিল বাবার প্রসঙ্গ ভাল লাগছে না বাবুয়ার। বোধিসত্ত্ব মজুমদারকে কি পছন্দ করে না ছেলেটা? কেন করে না? দয়িতাকে নিয়ে ওদের এখানেও অশান্তি বেধে গেছে কি?

নাহ্, ছেলেটাকে ছাড়লে চলবে না, ট্রেনে যেতে যেতে আরও ভাল করে ভাব জমাতে হবে। আপন মনে মাথা দোলাল সৌমিক। দয়িতার প্রেমিকটিকে অন্য আলোকেও চিনে রাখা দরকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেরো

অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখছিল বোধিসত্ত্ব। কুচকুচে কালো অনন্ত মহাশূন্যে জীবন্ত মহাকাশযান হয়ে ছুটছে সে। তীব্র বেগে। অজানা পথে। বিপরীত দিক থেকে অবিরাম ধেয়ে আসছে ধূলিকণার মেঘ, অন্ধকারেও বোধিসত্ত্ব টের পাচ্ছে তাদের অস্তিত্ব। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাচ্ছে একটা চাপা শব্দও। একঘেয়ে। একটানা। হঠাৎ ঝলসে ওঠে আলো, চোখ ধাঁধিয়ে যায়। পরক্ষণেই আবার ঘন অন্ধকার।

আঁধার এক সময়ে ফিকে হয়ে এল। এবার কী যেন এক আলোময় বস্তু এগিয়ে আসছে বোধিসত্ত্বর দিকে। ধূমকেতু? হ্যাঁ, ধূমকেতুই। নিকট থেকে নিকটতর হল ক্রমশ। অবয়ব স্পষ্ট হল। কোমাটা ভারী উজ্জ্বল... আরে, এ যে দয়িতার মুখ! অসীম শূন্যে ভাসমান মুখ প্রায় আলোর গতিতে কাছে এসে গেছে, বোধিসত্ত্বর সঙ্গে মিলিত হচ্ছে ধূমকেতুরূপী দয়িতা। কী প্রচণ্ড উত্তাপ! বোধিসত্ত্ব ক্ষয়ে যাচ্ছে দ্রুত, ছোট হয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে বোধিসত্ত্ব-দয়িতা অতি ক্ষুদ্র হয়ে গেল। ওই বিন্দুভরের কী মারাত্মক টান, বিচ্ছুরিত আলোর কণাগুলোকে শুষে নিচ্ছে, শূন্য থেকে বেমালুম হারিয়ে গেল আলোর অস্তিত্ব। আঁধারের ঘনত্ব বাড়ছে, বাড়ছে...

বোধিসত্ত্বর রাতের প্রথম তন্দ্রাটা ছিঁড়ে গেল। অন্ধকারের এত গাঢ় রূপ আগে কখনও দেখেনি বোধিসত্ত্ব, ধকধক করছে বুক। টের পেল এই শীতেও ঘেমে গেছে খুব। লেপ সরিয়ে উঠে বসল বিছানায়। ঘরেও এখন গাঢ় আঁধার, কিছুই ঠাহর হয় না। একটুক্ষণের জন্য বোধিসত্ত্ব বুঝতেই পারল না সে ঠিক কোথায়। ক্ষণপরে সম্বিতে ফিরল, হাতড়ে হাতড়ে টিপল বেডসুইচটা, জ্বলে উঠেছে হালকা সবুজ নাইটবাল্‌ব। পাশেই রাখী। ঘুমোচ্ছে। দেয়ালের দিকে ফিরে। এক ঝলক তাকে দেখে খাট থেকে নামল বোধিসত্ত্ব। চেয়ারের গা থেকে শাল টেনে জড়াল, পায়ে পায়ে এসেছে স্টাডিরুমে। আরামকেদারায় বসে সিগারেট ধরাল একটা।

স্বপ্নটা এখনও কাঁপছে বুকে। বোধিসত্ত্ব আর দয়িতার মিলনে সৃষ্টি হচ্ছে কৃষ্ণগহ্বর? এমন স্বপ্নের অর্থ কী? দয়িতা কি তার জীবনে ধূমকেতু? অনন্ত এক দূরত্ব থেকে ক্ষণিকের জন্য কাছে আসবে, আবার মিলিয়ে যাবে মহাশূন্যে? এখন আর তা কী করে হয়? বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভাঙিয়ে মেনকা কক্ষনও ফিরে যেতে পারে না। দ্বিধাসঙ্কোচের কাল পেরিয়ে গেছে, শুধু বোধিসত্ত্বর জন্যই সব ছেড়ে চলে এসেছে দয়িতা, এখন আর তাকে কোন অছিলায় ফেরাবে বোধিসত্ত্ব? কেনই বা ফেরাবে? এই প্রৌঢ় বয়সেও তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে তেইশ বছরের তরতাজা যৌবন, ভাবনাটুকুতেই রোমে রোমে হর্ষ জাগে, শরীরের প্রতিটি কোষ যেন নতুন করে প্রাণ পায়।

সিগারেটে বড় করে একটা টান দিল বোধিসত্ত্ব। তামাকের ধোঁয়ায় ভরে নিল ফুসফুস। দয়িতা বয়সে তার কন্যাসম, কী আসে যায়? পুরুষ আর নারীর সম্পর্কের মাঝে বয়সটা কোনও ব্যবধানই নয়। মুগ্ধ ছাত্রী তার জীবনে অনেক এসেছে, কিন্তু এমন ব্যাকুল আত্মনিবেদন আগে কখনও ঘটেনি। দয়িতাই তাকে জাগিয়ে দিল, বুঝিয়ে দিল তার যৌবন এখনও ফুরোয়নি। শরীরী কামের অসহ্য তাড়নায় এখন পুড়ছে বোধিসত্ত্ব, এ কথাই বা সে অস্বীকার করে কী করে? যদি এর জন্যে মহাশূন্যে কৃষ্ণগহ্বর হয়ে যেতে হয়, তো সেও ভি আচ্ছা। তবু দয়িতাকে হারিয়ে ফেলার মতো মূর্খামি সে কিছুতেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে পারবে না।

রাত্রির এক অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা আছে। সে শুধু চরাচরে আঁধার নামিয়েই ক্ষান্ত হয় না, মনের গোপন অন্ধকারকেও সে প্রকট করে দিতে পারে। এই প্রায়ান্ধকার স্টাডিরুমে বসে গবেষণার কথা আর ভাবছিল না বোধিসত্ত্ব, ঘরের নীলাভ শূন্যস্থানে এখন শুধু দয়িতার হলোগ্রাম। নগ্ন দয়িতা। বাদামের মতো দেহের রং, কচি লেবুপাতার পেলবতা ত্বকে, উদ্ধত দুটি স্তন টানটান হয়ে আছে কামনায়, স্তনবৃন্তে হাত ছোঁয়ালে যেন কোটি ভোল্টের শক লাগে। কী মসৃণ নাভি, কী অপরূপ জঙ্ঘা, কী মোহময়ী ঊরুসন্ধি! বোধিসত্ত্বর শরীরের চাপে মোমের প্রতিমা গলে গলে যাচ্ছিল। বোধিসত্ত্বর মধ্যেও আগুন আছে তা হলে? এখনও? শরীর অস্থির অস্থির লাগছে বোধিসত্ত্বর। হাত বাড়িয়ে দয়িতাকে ছুঁতে চাইল বোধিসত্ত্ব, জিভ দিয়ে স্পর্শ করতে চাইল, মুখ ডোবাতে চাইল দয়িতার বুকের উপত্যকায়। নেই। কিচ্ছু নেই। বেবাক শূন্যতা। অতৃপ্তি বেড়ে গেল বহুগুণ।

বোধিসত্ত্ব কাঁপছে জ্বোরো রুগীর মতো। ওই মাদক যৌবন কি এক-দুবার ভোগ করে তৃষ্ণা মেটে? আরও চাই, আরও চাই, অনন্ত বারের জন্য চাই, চিরকালের জন্য চাই...

কিন্তু তাদের দুজনের সম্পর্কটা কী হবে? দয়িতা রোজ ছলছল চোখে বলছে সে আর হোস্টেলে থাকতে চায় না, বাবা মার অর্থে এক মুহূর্তের জন্যও আর প্রতিপালিত হওয়ার ইচ্ছে নেই তার। টাউনে ঘর খুঁজছে দয়িতা, কিন্তু চালাবে কী করে? বোধিসত্ত্ব টাকা দেবে? দিতেই পারে। অর্থটা কোনও সমস্যাই নয়। দয়িতা কি নিতে রাজি হবে? বোধিসত্ত্বই বা তখন দয়িতার কাছে যাবে কোন পরিচয়ে? তাদের সুন্দর সম্পর্কের মাঝে একটা ইতর গন্ধ এসে যাবে না?

ঘরের বড় আলোটা জ্বলে উঠল। ঘোর ঘোর ভাব কেটে গেল বোধিসত্ত্বর। পিছনে রাখী।

জড়ানো স্বরে বোধিসত্ত্ব বলল,—কী হল? আলো জ্বাললে কেন?

—অন্ধকারে এসে ভূতের মতো বসে আছ কেন?

—ইচ্ছে হচ্ছে, বসে আছি।

—মানুষ বটে একটা...! এই শীতে... রুমহিটার জ্বালিয়ে নাওনি কেন? বলতে বলতে সুইচ অন করে বোধিসত্ত্বর পিছনে এসে দাঁড়াল রাখী। আলগা হাত রেখেছে বোধিসত্ত্বর পিঠে। নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল,—ঘুম আসছিল না বুঝি?

রাখীর হাত অস্বস্তিকর রকমের ভারী ঠেকল বোধিসত্ত্বর। উত্তর না দিয়ে সরিয়ে দিল হাতখানা।

রাখী ঝুঁকে বোধিসত্ত্বকে দেখল,—কাজ নিয়ে বসবে এখন?

বোধিসত্ত্ব এবারও কোনও উত্তর দিল না। আর একটা সিগারেট লাগিয়েছে ঠোঁটে, দেশলাই জ্বালল। অভ্যাস মতো তাড়াতাড়ি অ্যাশট্রে বাড়িয়ে দিয়েছে রাখী, অভ্যাস মতোই বোধিসত্ত্ব সেখানে গুঁজে দিল কাঠিটা। রাখীর উপস্থিতি সচেতনভাবে উপেক্ষা করে ধোঁয়ার বৃত্ত রচনা করছে।

রাখীই গায়েপড়া হয়ে টানল বোধিসত্ত্বকে,—ওঠো, চলো। রাত দুটো বাজে, এখন আর কাজ নিয়ে পড়তে হবে না।

—আহ্, যাও তো। জ্বালিয়ো না।

—আমি বুঝি শুধু জ্বালাই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধিসত্ত্ব ভুরু কুঁচকে তাকাল। রাখীর মুখে হাসি হাসি ভাব, ভঙ্গিটাও চপল। চোখে কী যেন ইশারা করতে চাইছে। ওই বেঢপ পঞ্চাশ বছরের বুড়িটা কি বোঝে না তার মধ্যে কোনও রহস্যময়তা নেই? এই মহিলার সঙ্গে রমণও যা, পাশবালিশের সঙ্গে খেলা করাও তাই। মুহূর্তের জন্য নিজের ওপর ধিক্কার জাগল বোধিসত্ত্বর। এই স্থূল রমণীটিকে দেখে এই কদিন আগেও কী করে সে বেসামাল হত? শরীর মনের ক্লান্তি কাটানোর জন্য এই কি একটা উপকরণ? ছিঃ!

বোধিসত্ত্বর বিরক্তিটা পড়তে পারেনি রাখী। স্বামীর একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা দেখে বুঝি বা একটু বিহ্বলই হয়ে গেছে সে। আদুরে ভঙ্গিতে আরও একটু ঘনিষ্ঠ হল। বোধিসত্ত্বর মাথা টেনে নিয়েছে বুকে,—চলো চলো, ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি এখানে।

ঝট করে মাথা ছাড়িয়ে নিল বোধিসত্ত্ব,—যাও না, তোমায় বারণ করেছে কে?

কখনও কখনও এমন অপমানে মাথা নিচু করে চলে যায় রাখী, আজ কিন্তু নড়ল না। অপলক চোখে দেখছে বোধিসত্ত্বকে,—তোমার কী হয়েছে বলো তো?

—কী আবার হবে! কিচ্ছু না।

—উহুঁ, আমাকে তুমি লুকোতে পারবে না। কদিন ধরেই দেখছি কেমন মনমরা হয়ে আছ, ভাবছ কী যেন...। ছেলেটা মাত্র দু দিনের জন্য এল, তার সঙ্গে পর্যন্ত ভাল করে কথা বললে না...

বোধিসত্ত্ব ঠোঁট বেঁকাল,—আমার ভাবনার কথা তুমি যদি টেরই পেয়ে যেতে, তা হলে তুমি তুমি হতে না, আমিও আমি হতাম না।

—সে তো বটেই। আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ...। তোমার বড় বড় ভাবনার আমি কীই বা বুঝি!

—জানোই যখন, প্রশ্ন করছ কেন? বোধিসত্ত্ব ভারিক্কি স্বরে বলল,—যাও, গিয়ে শুয়ে পড়ো।

রাখী ঘর ছাড়ল না। বোধিসত্ত্বকে অবাক করে ডিভানে গিয়ে বসেছে। বোধিসত্ত্বর চোখে চোখ রেখে বলল,—আমি মূর্খই হই, আর যাই হই, ঠিক এই মুহূর্তে কী ভাবছ আমি কিন্তু বলে দিতে পারি।

—কী ভাবছি?

—ওই মেয়েটার কথা। দয়িতা।

—কেন, ওই মেয়েটার কথা ভাবব কেন? বোধিসত্ত্ব বুঝি একটু চেঁচিয়েই ফেলল। শীতল বন্ধ বাড়িতে নিজের উচ্চকিত স্বর প্রতিধ্বনিত হল নিজেরই কানে। বড় শূন্যগর্ভ লাগল চিৎকারটা, উষ্ণ হয়ে উঠল বোধিসত্ত্ব।

রাখীর মুখ আবার সহজ স্বাভাবিক। হাসছে মিটিমিটি,—না, এমনিই মনে হল...। যাক গে যাক... মেয়েটা অনেকদিন আসছে না। কেন গো?

—আমি কী করে বলব?

—না, সেই কবে যেন... হ্যাঁ, ক্রিসমাসের দিন থমথমে মুখ করে এল, এ ঘরে বসে কাঁদছিল... তোমায় জিজ্ঞেস করলাম, তুমি বললে কী সব ফ্যামিলি প্রবলেম হচ্ছে...

—হচ্ছে তো। চলছে তো।

—তোমার সঙ্গে আর দেখা হয়েছে ওর?

—না হওয়ার কী আছে! ইউনিভার্সিটি খুলে গেছে, ক্লাস হচ্ছে...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—প্রবলেমটা কী গো?

—এই নিশুত রাতে সেটা জানা কি খুব জরুরি?

—না, এমনিই... কৌতূহল। ওইটুকু মেয়ে, পড়াশুনো করছে, ওর আবার ফ্যামিলি প্রবলেম... শুনতে খুব অবাক লাগে। কী ধরনের সমস্যা? বাবা-মার ঝামেলা? নাকি কোনও ছেলেকে পছন্দ করেছে, বাড়িতে রাজি হচ্ছে না?

বোধিসত্ত্ব আর মাথা ঠিক রাখতে পারল না। গর্জে উঠল, এত কথা বলছ কেন তুমি, অ্যাঁ? দয়িতার প্রবলেম জানার জন্য যদি এত ছটফটানি থাকে, যাও, ওর হোস্টেলে চলে যাও। অ্যান্ড আস্ক হার। আমাকে ওই ধরনের সিলি প্রশ্ন করবে না।

—রেগে যাচ্ছ কেন? রাখী আহত মুখে বলল,—তোমার সঙ্গে মেয়েটার এত ভাব আছে বলেই না...

—ভাব? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ভাব? তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছে বোধিসত্ত্ব। টাট্টুঘোড়ার মতো পা ঠুকছে মেঝেতে,—ভেবেছটা কী? যা খুশি তাই বলে যাবে! মুখে একটা লাগাম নেই! অশিক্ষিত মেয়েছেলেদের মতো ভাষা...

রাখী যেন হতবাক। বোধিসত্ত্বর ক্রোধের অভিঘাতটা সামলাতে দু-এক সেকেন্ড বুঝি সময় লাগল তার। মুখ লাল হয়ে গেছে। অস্ফুটে বলল,—কী এমন বললাম যে গায়ে ফোসকা পড়ে গেল?

—সে বোঝার বুদ্ধি কি তোমার ঘটে আছে?

—বটেই তো। বটেই তো। তুচ্ছ একটা শব্দ নিয়ে মেজাজ দেখানো তোমারই সাজে বটে। রাখীর স্বর নীরস। বুঝি বা ঈষৎ রুক্ষও,—এই যে, আমি যখন বাপের বাড়ি গেলাম, তখন রোজ যে সকাল সন্ধে মেয়েটা আসত...তোমায় রান্না করে খাওয়াচ্ছে, সারাদিন এ বাড়িতে থাকছে...। তুমি আমাকে এ সব বলোনি, গল্প করেও না। পাড়া প্রতিবেশীদের মুখে আমায় শুনতে হয়েছে। তাও আমি সে নিয়ে তোমায় একটিও প্রশ্ন করিনি...

—তুমি কী বলতে চাও, অ্যাঁ? রাখীর কথা মাঝপথে থামিয়ে দিল বোধিসত্ত্ব,—তুমি কি আমায় সন্দেহ করো?

—আমি কিছুই করি না। ঘটনাটা বলছিলাম, আর বুঝতে চাইছিলাম তুমি অত রেগে যাচ্ছ কেন?

কথাটার অন্তর্নিহিত খোঁচাটা আরও উসকে দিল বোধিসত্ত্বকে। হিংস্র চোখে রাখীকে দেখল । গরগর করতে করতে বলল,— হ্যাঁ, তুমি যা ভাবছ তাই। তাইই। আমি ভালবাসি দয়িতাকে। কেন ভালবাসি শুনবে? সহ্য করতে পারবে? বিকজ, তুমি আমার জীবনে অসহ্য হয়ে উঠেছ। তোমার সঙ্গে আমার কিছু মেলে না। নাথিং। থট নয়, ওয়েভলেংথ নয়...। আমার মতো লোকের একটা ইন্টেলেক্টের ক্ষুধা থাকে, কোনও দিন তুমি সেটা মেটাতে পারোনি...

—বিয়ের এতকাল পরে তুমি এ সব কী বলছ? রাখীর চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে,—আমাদের একটা বিশ বছরের ছেলে আছে!

—সো হোয়াট? যা সত্যি, তা কোনও না কোনওদিন তো বলতেই হবে। তুমি একটি আদ্যন্ত বোদা, নগণ্য মহিলা। তোমার সঙ্গে দুটো মিনিট কথা পর্যন্ত বলা যায় না। ইউ ডোন্ট ডিজার্ভ টু বি মাই কম্প্যানিয়ন। তোমাকে যে এত বছর আমি টলারেট করেছি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটা তোমার বাপ চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি। দয়িতার কথা বলে আমায় উত্তেজিত কোরো না, তুমি দয়িতার পায়ের নখের যোগ্যও নও। এ বাড়িতে থাকতে হলে মুখ বুজে থাকবে, দয়িতাকে নিয়ে কখনও আর একটা প্রশ্নও নয়। ঢুকছে মাথায় কথাগুলো?

রাখী যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, চোখের পাতাও পড়ছে না তার। বজ্রাহত পোড়া গাছের মতো দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর প্রায় টলতে টলতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বোধিসত্ত্ব ফিরে তাকানোরও প্রয়োজন মনে করল না। আবার আরামকেদারায় বসেছে। এক ঝটকায় কথাগুলো বলে ফেলে চাপা একটা মুক্তির উল্লাস জাগছে ভেতরে। আর অনাবশ্যক গোপনীয়তার খেলা খেলতে হবে না। বিবেকের কামড় থেকেও রেহাই মিলল যেন। তবু কী যেন একটা ফুটছে! রাখীকে তো কথাগুলো বুঝিয়েও বলা যেত, এত রূঢ় হওয়ার প্রয়োজন ছিল কি? একটু আবরণ থাকলে রাখী হয়তো যন্ত্রণা কিছু কম পেত।

রাতে আর ঘরে গেল না বোধিসত্ত্ব। রুমহিটারের তাপে স্টাডিরুম বেশ উষ্ণ হয়ে গেছে, ডিভানে একটা কম্বল রাখাই থাকে, কম্বলটা জড়িয়ে শুয়ে পড়ল গুটিসুটি মেরে। মাথা গরম হয়ে আছে, ঘুম আসতে চাইছে না। একটু তন্দ্রা আসে, ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়, আবার কখন যেন জড়িয়ে আসে চোখ। বার কয়েক উঠল, বাথরুমে গেল, অপাঙ্গে দেখল নিজেদের শোওয়ার ঘর। দরজা ভেজানো, ভেতরে কোনও সাড়াশব্দ নেই। কান্নারও না।

ভোররাতে ঘুমিয়ে পড়ল বোধিসত্ত্ব।

চোখ খুলল রূপচাঁদের ডাকে,—বাবু, চা।

ধূমায়িত পেয়ালা হাতে বোধিসত্ত্ব ড্রয়িংরুমে এল। রাখী উঠে পড়েছে, কাজ করছে রান্নাঘরে। অন্য দিন এ সময়ে রাখী অন্তত একবার এসে বসে সোফায়, এক সঙ্গে চা খায়, আজ এল না। অভিমান হয়েছে খুব? তুচ্ছ অনুভূতিকে প্রশ্রয় দেওয়া বাহুল্য মনে হল বোধিসত্ত্বর। থাক, দু দিন গেলে আস্তে আস্তে সয়ে যাবে।

চা শেষ করে বাথরুমে ঢুকল বোধিসত্ত্ব। গিজার অন করাই ছিল, জলে পরিমিত উত্তাপ। তোয়ালে সাবান দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম সব কিছুই নিখুঁতভাবে সাজানো, যেমন থাকে। দরজায় রবারের চটিটাও। স্নান সেরে বেরিয়ে দেখল ব্রেকফাস্ট রেডি। টোস্ট পোচ কলা, যা নিত্যদিন খেয়ে মর্নিং সেশনে ইউনিভার্সিটি ছোটে বোধিসত্ত্ব। শোওয়ার ঘরের বিছানাতেও বোধিসত্ত্বর শার্ট ট্রাউজার্স সোয়েটার রাখা আছে অন্য দিনের মতো। একটু বেশি নীরবতা ছাড়া সংসারের কোথাও কোনও ছন্দপতন নেই, সবই বাঁধা লয়ে বহমান।

ফুলস্লিভ সোয়েটারটা গলিয়ে বোধিসত্ত্ব ডাইনিং টেবিলে এল। হাতে খবরের কাগজ, হেডিংয়ে চোখ বোলাচ্ছে। কাগজের ওপার থেকে হঠাৎই রাখীর গলা শুনতে পেল,—তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

বোধিসত্ত্ব কাগজ সরিয়ে রাখল। ঝলক দেখল রাখীকে। বাসি খোঁপা এলোমেলো, কয়েকটি রুপোলি চুল এসে পড়েছে কপালে। অসম্ভব শুকনো লাগছে রাখীর লাবণ্যহীন মুখ। শীতের খড়ি ওঠা ওঠা। তবে মুখটা বড় শান্তও লাগে, একটি রেখারও ওঠাপড়া নেই সেখানে।

বোধিসত্ত্ব গলা ঝাড়ল,—বলো।

—দুপুরের খাবারটা ঢাকা দেওয়া থাকবে। রূপচাঁদকে বলে রেখেছি গরম করে দেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে।

বোধিসত্ত্ব চোখ কুঁচকে তাকাল। কিছু বলার আগেই রাখী আবার বলে উঠল,—আমি দশটা একান্নর ট্রেনে চলে যাচ্ছি।

—কোথায়?

রাখী উত্তর দিল না। বুঝি প্রয়োজন মনে করল না। রান্নাঘরে গিয়ে কফি করে আনল। পেয়ালায় মেপে আধ চামচ চিনি দিল। নাড়ছে। একটু যেন অনাবশ্যক দীর্ঘ সময় ধরে।।

হাতে এক পিস টোস্ট তুলেও নামিয়ে রাখল বোধিসত্ত্ব,—লেক টেরেসে যাচ্ছ?

—উত্তর নেই।

—ফিরছ কবে জানতে পারি?

—জানার কি তোমার প্রয়োজন আছে?

—একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

রাখী গলা নামিয়ে বলল,—মেয়ের বয়সি একটা মেয়ের সঙ্গে নোংরামি করার থেকে এটা অনেক কম বাড়াবাড়ি।

অজান্তেই মুঠো শক্ত হয়ে গেল বোধিসত্ত্বর। শব্দ করে চেয়ার সরিয়ে উঠে পড়েছে। স্টাডিরুমে ঢুকল একবার, তারপর হনহনিয়ে বেরিয়ে গেল রাস্তায়।

মর্নিং-এ আজ একটাই ক্লাস। এম এসসি ফার্স্ট ইয়ার। ক্লাসটা মন দিয়ে করতে পারল না বোধিসত্ত্ব, ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। কোনওক্রমে বেল পড়া অবধি কাটিয়ে ফিরে এল নিজের রুমে, ঝিম ধরা মুখে বসে রইল সারা সকাল। শামীমের সঙ্গে বসার কথা ছিল আজ, নিজের রুমেই। শরীরে জুত নেই, এই অজুহাতে কাটিয়ে দিল ছেলেটাকে। বাড়ি তাকে টানছে, অথচ যেতে পা সরছে না। বড় বিচিত্র অনুভূতি! বোধিসত্ত্বর কি ভয় করছে? বিবেকের দংশন হচ্ছে? নাকি নিছকই এক আশঙ্কা তাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে? একটা দীর্ঘকালীন অভ্যাস তাকে ছেড়ে চলে যাবে, এই ভাবনাতে বুঝি এতটুকু স্বস্তি নেই!

সত্যি সত্যি বাড়ি ফিরল যখন, অন্য এক অনুভবে ছেয়ে গেল হৃদয়। নির্জন বাংলো মহাশূন্যের মতো খাঁ খাঁ লাগছে। কত সময় তো থাকে না রাখী, কই তখন তো এমন লাগে না। চলে যাবে, এই ঘোষণাটাই কি বাড়িটাকে ফাঁকা করে দিয়েছে আজ? চতুর্দিকে শুধু রাখীর ছোঁয়া। সোফায়, পরদায়, মেঝেয়, ডাইনিং টেবিলে, বাথরুমে, শোওয়ার ঘরে, এমনকি স্টাডিতেও। দেখতে দেখতে শরীরের সমস্ত উদ্যম নিঃশেষ হয়ে আসছিল বোধিসত্ত্বর। দয়িতাকে নিয়ে বেশ কিছুদিন চনমনে ছিল দেহ, আজ আবার অবসন্নতাটা ফিরে আসছে।

খেয়ে উঠে নিয়ম ভাঙল বোধিসত্ত্ব, আর ইউনিভার্সিটি গেল না। সারা দুপুর নিঝুম শুয়ে রইল বিছানায়। শীতের বাতাস সরসর ধ্বনি তুলছে বাইরের শুকনো পাতায়, বোধিসত্ত্ব শুনছিল। জানলায় চোখ রাখলেই দৃষ্টি যায় বড় বড় ডালিয়ায়। সাদা হলুদ খয়েরি মেরুন। দেখলেই বুক ব্যথিয়ে ওঠে।

...সত্যিই চলে গেল রাখী। ...বোধিসত্ত্বকে ছেড়ে চলেই গেল।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল এল। বিকেল আর কতটুকু এখন, আসতে না আসতেই সন্ধে। বোধিসত্ত্ব সুস্থিত হচ্ছিল ক্রমশ। অন্য এক নারী চুম্বকের মতো টানছে এবার। চৌম্বক আকর্ষণ নয়, এ যেন মহাকর্ষ, অসীম দূরত্ব থেকেও যা টের পাওয়া যায়।

হৃদয়ের দোদুল্যমানকে ভেঙে ফেলল বোধিসত্ত্ব। রূপচাঁদকে ছুটি দিয়ে বেরিয়ে পড়ল পথে। সোজা লাইব্রেরি গিয়ে নিজের কিউবিকলে বসে রইল খানিকক্ষণ। ঘড়ি দেখছে ঘন ঘন। দ্রুতগামী সময় আজকেই বা এত ধীরে চলে কেন?

সাড়ে সাতটা নাগাদ ছায়া পড়ল কিউবিকলে। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানী বোধিসত্ত্ব মজুমদারের চোখের মণি জ্বলজ্বল, বুকে লাবডুব লাবডুব। কী অপরূপ আজ সেজেছে দয়িতা! সালোয়ার কামিজ নয়, শাড়ি পরেছে আজ। গাঢ় নীলরং জরিপাড় শাড়ি, গায়ে নীল শাল, কপালে নীল টিপ। এ কি অভিসারের সাজ? নাকি দয়িতা আজ আকাশ হয়েছে?

আজই কেন শাড়ি পরল দয়িতা?

সংখ্যা আর অক্ষরের অরণ্যকে সরিয়ে রাখল বোধিসত্ত্ব, বেরিয়ে পড়েছে দয়িতার সঙ্গে। হাঁটছে কুয়াশামাখা শীতার্ত পথ ধরে।

চুপচাপই ছিল দুজনে। এক সময়ে বোধিসত্ত্বই কথা বলল,—তোমার কি আজ ফেরার তাড়া আছে?

—আমার তো কোনও দিনই তাড়া থাকে না। দয়িতা ঝকঝকে দাঁত মেলে হাসল—আমার সময় তো আপনার হাতে।

—আহ্, আপনি কেন? কতদিন না বলেছি, তুমি বলবে!

দয়িতা কুলকুল হাসল,—আমি তো বলেইছি সময় লাগবে।

আবার গাঢ় নৈঃশব্দ্য। আবার নির্জন কুয়াশা মাখা পথ বেয়ে বহে চলা।

এক সময়ে বোধিসত্ত্ব বলল,—তোমাকে আর টাউনে ঘর দেখতে হবে না।

—কেন?

—তুমি আমার কাছে থাকবে।... কী, থাকবে তো?

—আমি তো থাকতেই চাই। কিন্তু...

—কোনও কিন্তু নয়। তুমি আমার সঙ্গে, আমার বাড়িতে থাকবে।

দয়িতা কেঁপে উঠল,—তা কী করে সম্ভব?

অনেকটা শীতল বাতাস ফুসফুসে ভরে নিল বোধিসত্ত্ব। উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা। মৃদু স্বরে বলল,—রাখী নেই। চলে গেছে।

—সে কী! কেন? কবে?

—আজই।... আমি কাল রাত্রে তাকে সব বলেছি।

—কী বলেছেন?

—ট্রুথ। অ্যাবসোলিউট ট্রুথ। নাথিং বাট দা ট্রুথ।

কথাগুলো যেন দয়িতাকে নয়, নিজেকেই বলল বোধিসত্ত্ব।

দয়িতা সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেছে। মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে কী যেন। বাড়ির সামনেটায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল স্থাণুবৎ।

বোধিসত্ত্ব হাত ধরল দয়িতার,—এসো। থামলে কেন?

বাধ্য মেয়ের মতো বোধিসত্ত্বর হাত ধরে ভেতরে এল দয়িতা। আলো জ্বালল বোধিসত্ত্ব, দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর দয়িতার দু কাঁধ ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে দিল ড্রয়িংরুমের মধ্যিখানে। ঠোঁটে আলতো চুমু খেয়ে বলল,—আজ থেকে এটাই তোমার বাড়ি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দয়িতা কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। যেন ব্যাপারটা ঠিক অনুধাবন করতে পারছে না। সন্দিগ্ধ চোখে তাকাচ্ছে চার দিকে। বুঝি বা তার মনে হচ্ছে এক্ষুনি কোনও ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে রাখী, ঘাড় ধরে বলবে, বেরোও।

অস্ফুটে বলে উঠল,—আমার খুব ভয় করছে।

—কীসের ভয়?

— জানি না...

—আমি তো আছি।

আবার দয়িতার ঠোঁটে ঠোঁট রাখল বোধিসত্ত্ব। প্রখর হচ্ছে কামনা, বোধিসত্ত্বর ওষ্ঠ শুষে নিচ্ছে দয়িতার প্রাণরস। দু হাতে আঁকড়ে ধরেছে দয়িতাকে, জিভে জিভে ঘর্ষণ হচ্ছে। টের পাচ্ছে দয়িতার হাতও উঠে এসেছে তার পিঠে, সেও যেন ছটফট করছে তৃষ্ণায়।

বোধিসত্ত্ব মুখ সরিয়ে নিল। গাঢ় চোখ রেখেছে দয়িতার চোখের মণিতে,—ভয় কাটছে?

মাথা দোলালো দয়িতা,—জানি না।

—এই তো চেয়েছিলে তুমি, নয় কি?

চোখ নামিয়ে নিল দয়িতা,—জানি না।

বোধিসত্ত্বর স্বর গাঢ়তর হল,—তুমি আমার জন্য সবাইকে ছাড়তে পারো, আমি তোমার জন্য কিছু ছাড়তে পারি না?

—কিন্তু এটা কি উচিত হল? কেন তুমি ওঁকে চলে যেতে বললে? নয় আমি তোমায় দূর থেকেই...

—এখন কি ও সব ভাবার সময় দয়িতা? অতীত কবরে যাক, আমাদের সামনে এখন শুধুই ভবিষ্যৎ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি রাখীর কাছে ডিভোর্স চাইব। আশা করি ও কোনও ঝঞ্ঝাট পাকাবে না। বড় জোর কিছু অ্যালিমনি চাইতে পারে, সে নয় দিয়ে দেওয়া যাবে। চাইলে বাবুয়াও আমার পয়সাতে পড়াশুনো কন্টিনিউ করতে পারে...

দয়িতা বোধিসত্ত্বর মুখে হাত চাপা দিল। সরেও গেল একটু।

বোধিসত্ত্ব অবাক হল। দয়িতাকে প্রসন্ন করার জন্যই তো জানিয়ে দিতে চাইছে আগামী পদক্ষেপগুলোর কথা, তবু কেন দয়িতা...?

ভুরু নাচিয়ে বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করল,—কী হল?

—কিছু না। আজ ও সব কথা থাক।

বোধিসত্ত্ব নিশ্চুপ হয়ে গেল। পলকের জন্য রাখীর মুখ ভেসে উঠেছে সামনে, এক ঝলক যেন বাবুয়াকেও দেখতে পেল।

দু দিকে জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল বোধিসত্ত্ব। বিড়বিড় করে বলল,—থাক তবে। এসো...কাছে এসো।

চোদ্দো

ক্যাম্পাস টাউন থেকে সোজা বাপেরবাড়ি এসে উঠেছে রাখী। না, ঠিক সোজা নয়, প্রথমে একবার লেক টেরেসে গিয়েছিল। বাবুয়ার কাছে। স্বামীকে ছেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের সান্নিধ্যটুকু বড়ো প্রয়োজন ছিল তার। থাকব না থাকব না করেও সেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে গেল একটা রাত। বাবুয়া যথেষ্ট বুদ্ধিমান, মার ঘন মেঘে ছাওয়া মুখ দেখে সে বুঝি কিছু আন্দাজ করেছিল, এক বারের বেশি দু বার বলতে হয়নি বাবুয়াকে, একটিও প্রশ্ন না করে সে চলে এসেছে মার সঙ্গে।

মুখ ফুটে রাখী কাউকেই কিছু বলেনি। শ্বশুরবাড়িতেও না, বাপেরবাড়িতেও না। বিয়ের দু যুগ পর দেবতুল্য স্বামী এক হাঁটুর বয়সী মেয়েতে আসক্ত হয়েছে, এ কথা কী করে উচ্চারণ করে রাখী! তা বলে কি চাপা আছে ঘটনাটা? মোটেই না। সকলেই যে যার মতো করে বুঝে নিয়েছে। মারাত্মক কিছু না ঘটলে যে রাখীর মতো স্বামীঅন্তপ্রাণ মহিলা বোধিসত্ত্বকে ছেড়ে আসার পাত্রী নয়, এ কথা আত্মীয়মহলে না জানে কে! তা ছাড়া স্ক্যান্ডালের একটা নিজস্ব সৌরভ আছে, যতই গোপন রাখার চেষ্টা করা হোক, তা ছড়াবেই।

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। পৌষ ফুরিয়ে মাঘ এসে গেল। রন্টু মিত্রা এখানে আদরযত্ন করছে খুব। এবার যেন একটু বেশি বেশি। ভাইপো ভাইঝিরা বড্ড বেশি পিসিমণি পিসিমণি করে পায়ে পায়ে ঘুরছে। রাখীর ভাল লাগছে না, কিচ্ছু ভাল লাগছে না। জিভ বিস্বাদ, দিন বিবর্ণ, রাত অসহ্য। অপমানটা যেন সর্বক্ষণ পাঁকের মতো লেগে আছে গায়ে। উফ্, কী চূড়ান্ত নির্বোধ সে! কী অদ্ভুতভাবে বোকা বনে গেল! এতকাল ঘর করার পর অবলীলায় লোকটা বলে দিল তুমি আমার ইন্টেলেক্টের ক্ষুধা মেটানোর যোগ্য নও। ওই মেয়ের নখের যুগ্যিও নও তুমি! ছিঃ, ছিঃ, কী অপমান!

রাখীর এখন কেবলই মনে হয় জীবনের দু দুটো যুগ বেবাক নষ্ট হয়ে গেছে। তার ভালবাসা মিথ্যে, এতদিনকার সহবাস মিথ্যে, সম্পর্ক মিথ্যে, সত্যি শুধু ওই অপমানটুকু। মাগো।

আশ্চর্য, মনে এত রাগ, এত জ্বালা, তবু এর মধ্যেও হঠাৎ হঠাৎ রাখীর মনকেমন করে ওঠে বোধিসত্ত্বর জন্য! কী করছে এখন বোধিসত্ত্ব? কেমন আছে? ঠিকঠাক খাওয়া দাওয়া হচ্ছে তো? রূপচাঁদ পারছে কি সব দিক সামলাতে? সারাদিনে একবারও কি রাখীকে মনে পড়ে বোধিসত্ত্বর? আসার সময়ে একটি বারের জন্যও বলল না, থেকে যাও রাখী! তিন সপ্তাহের ওপর হয়ে গেল, কই একবারও তো ফোন করল না! দয়িতার মধ্যে এমন কী আছে যে, রাখীকে ভুলেই যেতে হল?

বাবুয়ার মধ্যেও ইদানীং একটা পরিবর্তন এসেছে, লক্ষ করে রাখী। টেস্ট পরীক্ষা, পার্ট ওয়ানের ফর্ম ফিল্‌আপ্ সবই হয়ে গেছে, কলেজ এখন বন্ধ, বাড়িতে থাকার সময়ে বই নিয়ে বসল তো ঠিক আছে, না হলে মার সঙ্গেই সারাক্ষণ গল্প করে আজকাল। কলেজের স্যারদের কথা বলে, সহপাঠীদের গল্প শোনায়, কোথায় যেন একটা টিউশনি করছে, সেই বাচ্চা ছাত্রছাত্রীদের কাহিনীও শোনায় মাকে। এত কথা বলে যে, রাখীর মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় তাকে বুঝি ভুলিয়ে রাখতে চাইছে ছেলে। মার ভেতরটা যে পুড়ে যাচ্ছে, তা কি বাবুয়া বোঝে?

সরস্বতী পুজোর আগে দুম করে ঠাণ্ডাটা কমে গেল।

সেদিন সকাল থেকে একটু গা হাত পা ম্যাজম্যাজ করছিল রাখীর, দুপুরে শুয়ে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

মিত্রা এসে ঠেলল হঠাৎ। হাসি হাসি মুখে বলল,—দিদি, তোমার দেওর এসেছে।

বোধিসত্ত্বর সঙ্গে যাই হোক, শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে রাখীর যোগাযোগ এখনও অক্ষুণ্ণ

আছে। দীপালি আর শান্তশীল তো প্রায় একদিন ছাড়া ছাড়াই ফোন করে, সেও তখন খবর নেয় শ্বশুর-শ্বাশুড়ির। বাইশ বছর ধরে যে পরিবারের সে অংশ হয়ে ছিল, দুম করে কি সেই পরিবারকে পুরোপুরি মুছে ফেলা যায়? মুছবেই বা কেন? তাদের সঙ্গে তো রাখীর কোনও বিবাদ নেই।

তবু শান্তশীলের আগমনে খানিকটা অবাকই হয়েছে রাখী। জিজ্ঞাসা করল—একা এসেছে?

—হুঁ। মনে হয় অফিস থেকে। সঙ্গে গাড়ি আছে। মিত্রা চোখ ঘোরাল—দ্যাখো, কী বলে!

মিত্রার মুখভঙ্গিটা রাখীর ভাল লাগল না। পঞ্চাশ বছর বয়েসে পৌঁছে প্রায় চল্লিশের ভ্রাতৃবধূর এই ধরনের কৌতূহল অস্বস্তিকরও বটে। বিরক্ত হয়েও লাভ নেই, হয়তো এটাই স্বাভাবিক। মিত্রার জায়গায় রাখী থাকলে সে কি অন্যরকম আচরণ করত?

একতলায় রন্টুর চেম্বারের লাগোয়া বৈঠকখানা আছে একটা। শান্তশীলকে সেখানে বসায়নি মিত্রা, ওপরের ড্রয়িংরুমে নিয়ে এসেছে। নিজেকে যথাসম্ভব স্থিত রেখে সেই ঘরে এল রাখী।

শান্ত সোফায় বসে সিগারেট খেতে খেতে ম্যাগাজিন উলটোচ্ছিল। গম্ভীর মুখে। রাখীকে দেখে ফ্যাকাশে হাসল। এ দিক ও দিক তাকিয়ে বলল,—বাবুয়াকে দেখছি না যে? পড়ছে?

রাখী কেজো গলায় বলল,—না, বেরিয়েছে। আজ ওর টিউশানির দিন।

—বাবুয়া টিউশানি করে? শান্তশীল বিস্ময় লুকোতে পারল না,—কোথায়? কবে থেকে?

—অনেকদিনই করছে। প্রায় মাস দেড়েক।

—স্ট্রেঞ্জ! বলেনি তো! ওর টিউশানি করার কী দরকার?

—তা তো বলতে পারব না। ওকেই জিজ্ঞেস কোরো।

শান্তশীল মাথা নামাল। চোখ থেকে হাই পাওয়ারের চশমা খুলে মুছছে। আবার পরে নিল। হঠাৎ চোখ তুলে বলল,—তুমি যাচ্ছ কবে?

—কোথায়?

—বাড়ি।

শান্ত কোন বাড়ির কথা বলছে? রাখীর ভুরুতে ভাঁজ।

ঝটিতি নিজেকে সংশোধন করে নিয়েছে শান্তশীল, —অনেক দিন তো বাপেরবাড়ি হল, এবার লেক টেরেস চলো।

ও। তার মানে বোধিসত্ত্ব তাকে ফেরত আনার জন্য পাঠায়নি। রাখী স্থির চোখে তাকাল,—কেন?

—কেন আবার কী? আমরা তোমাদের মিস করছি। দীপালি আমি বাবা মা জুলি মিলি সক্কলে।

এবারও বোধিসত্ত্বর নাম করল না। রাখী মলিন হাসল,—এই কথা বলতে এত দূর দৌড়ে এলে? ফোনেই তো বলা যেত।

মিত্রা চা এনেছে। সঙ্গে প্লেটে সন্দেশ রসগোল্লা আঙুর কাজুবাদাম চানাচুর। শান্তশীল হাঁ হাঁ করে উঠল, আমলই দিল না মিত্রা, মুচকি হেসে চলে গেল ঘর ছেড়ে। অন্য সময়ে

শান্ত দীপালিরা এলে সামনে বসে মিত্রা, দুটো কথা বলে, আজ যে সে একটুক্ষণও থাকবে না, জানে রাখী।

আর এই জানাটাই রাখীকে পীড়া দিচ্ছিল। অস্বস্তিটা বেড়ে যাচ্ছিল আরও।

শান্তশীল প্লেটের দিকে তাকালই না, শুধু চায়ের কাপটা টেনেছে। চুমুক দিয়ে বলল,—বুঝতেই তো পারছ বউদি, কেন এসেছি!

—না। সত্যিই বুঝতে পারছি না।

—কামঅন বউদি, বি প্রাক্টিক্যাল। তুমি এ রকম অনির্দিষ্ট কাল ধরে এখানে থাকতে পারো না। শান্তশীল গলা নামাল,—এটা একটা ফ্যামিলি প্রেস্টিজের ব্যাপার। বাবুয়াটাকেও নিয়ে চলে এলে...

—বাবুয়াকে আমি আনিনি। রাখীর স্বর ভারী হল, —বাবুয়া স্বেচ্ছায় এসেছে।

—ও কে। ও কে।...এ কথা তো মানো, তোমরা এখানে পড়ে থাকলে আমাদের খারাপ লাগে?

কথাটা রাখীর পছন্দ হল না। সে যে এখানে কেন আছে, তা নিশ্চয়ই আর এখন শান্তর অজানা নয়। তারপর এই ঢঙের কথাবার্তার কোনও মানে হয়!

রাখী চোখ কুঁচকোল,—তোমাদের আর কিছু খারাপ লাগে না?

শান্তশীল একটু চুপ করে থেকে বলল,—দ্যাখো বউদি, খারাপ তো আমাদের অনেক কিছুই লাগে। কিন্তু সব কিছুর ওপর তো আমাদের হাত নেই। তাও হয়তো তুমি ইম্‌পাল্‌সের মাথায় না চললে...। শান্তশীল ঝুঁকে কাপটা নামিয়ে রাখল,—তুমি তোমার জমি কামড়ে পড়ে থাকলে সিচুয়েশানটাই হয়তো অন্যরকম হত। তা হলে হয়তো দাদা...

রাখী সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল,—তোমার সঙ্গে তোমার দাদার দেখা হয়েছে?

শান্তশীল চুপ।

—গেছিলে ওখানে?

এবারও উত্তর নেই।

—কী দেখলে? রাখী আর স্থৈর্য রাখতে পারল না,—চুপ করে থেকো না, বলো।

শান্তশীল অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

মুহূর্তে অসাড় হয়ে গেল রাখীর বুক। যে আশঙ্কাটা মনের মধ্যে ঘুরে মরছে অহরহ, সেটাই তবে সত্যি হল!

করতে না চেয়েও প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল রাখীর মুখ থেকে,—মেয়েটা তবে এখন তোমার দাদার সঙ্গেই আছে?

শান্তশীল হাত ওলটাল।

—বাবা-মা জানেন?

—শুনেছেন।

—কী বলছেন তাঁরা?

—আহ্ বউদি, ছাড়ো না ও সব কথা। শান্তশীল বাচ্চা ভোলানোর স্বরে বলল,—এটা কেন মনে রাখছ না, তুমি আমাদের বাড়ির বউ! বড় বউ! তোমার জায়গা আমাদের কাছে ঠিকই আছে।... চলো, ফিরে চলো।

শেষ কথাগুলো যেন কানেই গেল না রাখীর। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রুগির মতো বিকৃত হয়ে গেছে তার মুখ। হিসহিসিয়ে উঠল,—একটু আগে তুমি ফ্যামিলি প্রেস্টিজের কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলছিলে না? আমি এখানে থাকলে তোমাদের সম্মানহানি হয়, অ্যাঁ? তোমার দাদা যা করেছে তাতে বুঝি তোমাদের মুখে চুনকালি পড়ে না?

—দাদার কথা আলাদা বউদি।...আমরা কেউই দাদাকে সাপোর্ট করছি না। কিন্তু একটা কথা তো মানতেই হবে, হি ইজ আ জিনিয়াস। এবং জিনিয়াসদের এ রকম পদস্খলন ঘটেই থাকে। এমন ঘটাটা হয়তো অন্যায়। তবে আমাদের কমন নীতিবোধ দিয়ে এই সব মানুষদের বিচার করাও বোধহয় ঠিক নয়। এ ছাড়া আর একটা বাস্তব কথা বলি। এ সব ইনভল্‌ভ্‌মেন্ট বেশি দিন টেকেও না। দেখলাম তো মেয়েটাকে, ওই মেয়ে কদিন থাকবে দাদার কাছে? দু দিন বাদেই কেটে পড়বে।... এখন এই ক্রাইসিস মোমেন্টে তোমাকেই শক্ত হতে হবে। তুমি এই সময়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন?

বারে বা, জিনিয়াসের স্ত্রী হয়েছে বলে কি তাকে সর্বংসহা হতে হবে? অন্য এক মেয়ের সঙ্গে আশনাই চালাবে তার বর, আর তাকে গালে হাত দিয়ে অপেক্ষা করতে হবে কখন মতি ফিরবে স্বামীর? একটা শিক্ষিত মানুষ হয়ে এ কথা কী করে বলছে শান্তশীল? রাখীর অসম্মানটাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনছে না?

শান্তশীল সিগারেট ধরাল আর একটা। আবার বলল,—দ্যাখো বউদি, দাদাকে তো আমি কম দিন দেখছি না...তোমাকে আমি অ্যাশিওর করতে পারি, দাদার কাছে তোমার একটা স্পেশাল পজিশান আছে। দাদা এখনও তোমার কথা ভাবছে, বাবুয়ার কথা ভাবছে...। হি হ্যাজ আ জেনুইন ফিলিং ফর বোথ অফ ইউ। ইনফ্যাক্ট, দাদার রিকোয়েস্টেই তোমার কাছে আজ এসেছি।

রাখীর ঠোঁট বেঁকে গেল,—আমাকে লেক টেরেসে থাকার নির্দেশটা কি তোমার দাদারই দেওয়া?

—উঁহুঁ, ওটা আমরাই চাইছি। দীপালি বলছিল, ওতে তোমার নিজের জায়গাটা সিকিওরড্ থাকবে।

—সরি শান্ত। আমি অতি নগণ্য মানুষ, তোমার দাদার তুলনায় কিচ্ছু না, কিন্তু একটা মানুষ তো বটে। যেখানে তোমার দাদার সঙ্গেই আমার কোনও সম্পর্ক এগ্‌জিস্ট করে না, আই মিন সম্পর্ক থাকছে না, সেখানে ওইভাবে জমি আঁকড়ানোর চেষ্টা করে কী লাভ? আমাকে অন্তত এইটুকু আত্মসম্মান বজায় রাখতে দাও।

—তুমি কি ডিসিশান নিয়েই ফেলেছ?

—ডিসিশান নেওয়ার আমি কে! রাখীর স্বরে বিদ্রূপ ফুটল,—ডিসিশান তো তোমার দাদাই নিয়েছে। আমি শুধু নিজের মান বাঁচানোর চেষ্টা করছি।

—দ্যাখো, যা ভাল বোঝ করো।...আমার শুধু খারাপ লাগছে বাবুয়ার কথা ভেবে। আফটার অল ও আমাদের বাড়ির ছেলে...

—না। বাবুয়া আমার ছেলে।

—এ সব কিন্তু জেদাজেদির কথা। তুমি চাইলেই কি বাবুয়ার পিতৃপরিচয় বংশপরিচয় সব মুছে যাবে? খ্যাতিমান বাবায় তারও কিছু অধিকার আছে, সেটা তুমি কেড়ে নিতে পারো না।

—আমি কেন কাড়তে যাব। বাবুয়া বড় হয়ে গেছে, যা ভাল বোঝে তাই করবে। তোমাদের কাছে যেতে চাক, কি তোমার দাদার কাছে, আমি বাধা দেব না।

শান্তশীল মাথা নাড়ল। আর কথা খুঁজে পাচ্ছে না। চেপে চেপে সিগারেট নেভাল

অ্যাশট্রেতে। হঠাৎ ব্রিফকেস খুলে একটা বাদামি খাম বার করেছে। সামান্য ইতস্তত করে বাড়িয়ে দিল রাখীর দিকে,—এটা রাখো।

—কী আছে এতে?

—টাকা। তিন হাজার। দাদা পাঠিয়েছে।

—হঠাৎ।

—তোমার একটা খরচখরচা আছে না? বলেছে, প্রত্যেক মাসে পাঠাবে।

রাখীর কান্না পেয়ে গেল। এখনই তাকে খোরপোষ দিতে চায় বোধিসত্ত্ব? মানে তাকে পাকাপাকিভাবেই জীবন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে! টাকার তার প্রয়োজন আছে ঠিকই, কদিনই বা এসেছে রন্টুর বাড়ি, এখনই মনে হয় ভায়ের ঘাড়ে বসে খাচ্ছে। রন্টুর অবস্থা অবশ্য যথেষ্ট সচ্ছল, সে মোটেই দিদিকে বোঝা বলে মনে করে না, অন্তত এখনও পর্যন্ত। তবু এখানে এসে নিজের হাতে আগের মতো একটু আধটু খরচাপাতি করতে পারলে এ সঙ্কোচটা হয়তো রাখীর কেটে যেত। তা বলে রাখী ওই টাকা স্পর্শ করবে?

শুকনো গলায় রাখী বলল,—তোমার দাদা মহৎ মানুষ। তার অপার করুণা।...তাকে বোলো তার দয়া ছাড়াও আমি বেঁচে থাকতে পারব।

—ছেলেমানুষি কোরো না বউদি। টাকার ওপর রাগ করতে নেই। রেখে দাও।

—শান্ত, প্লিজ...

শান্তশীল থমকে গেল। সবার কাছে চিরটাকাল রাখী ব্যক্তিত্বহীন বলেই পরিচিত, কিন্তু এই মুহূর্তে তার স্বরে এমন এক অস্বাভাবিক দৃঢ়তা ছিল, যা তার সমবয়সী দেওরটিকে থমকাতে বাধ্য করল। ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে খাম ভরে রাখছে ব্রিফকেসে।

উঠে পড়ল,—তুমি কিন্তু আমায় ভুল বুঝো না বউদি। আমি তোমার ভালর জন্যই...

রাখী কথা বাড়াল না। গাড়ি অবধি এগিয়ে দিয়ে এল দেওরকে। পায়ে পায়ে ফিরল।

ঘরে ঢুকতেই মিত্রা উড়ে এসেছে যেন,—সত্যিই তা হলে জামাইবাবু মেয়েটাকে নিয়ে আছেন! ছি ছি ছি...

আড়াল থেকে তবে সব শুনেছে মিত্রা! যেটুকু জানত না, সেটুকু শূন্যস্থানও পূরণ হয়ে গেল আজ! এই কদিন সব কথাই রাখা রাখা ঢাকা ঢাকা ছিল, শান্তশীল এসে আবরণটা ঘুচিয়ে দিয়ে গেল।

মিত্রা বলেই চলেছে,—তুমি মেয়েটাকে দেখেছ? তখনই মুড়ো ঝ্যাঁটা দিয়ে ও মেয়ের বিষ ঝেড়ে দিতে পারোনি? জামাইবাবুরও বলিহারি যাই! বুড়ো বয়সে ভীমরতি! তোমার কিন্তু আরও শক্ত হওয়া উচিত ছিল দিদি।

রাখীর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছে না মিত্রা, নিজে নিজেই বকে যাচ্ছে। তার ক্ষোভটা খুব স্বতঃস্ফূর্ত, টের পাচ্ছিল রাখী। একই সঙ্গে মনে মনে সিঁটিয়েও যাচ্ছিল। এ বাড়িতে তার যথেষ্ট সম্মান আদর। শুধু রন্টুর দিদি, বা সূর্যকান্ত চৌধুরীর মেয়ে বলেই নয়, ওই বোধিসত্ত্ব মজুমদারের স্ত্রী বলেও এখানে তার একটা বিশেষ আসন আছে। আজ সেই মানুষটাকেই প্রাণ ভরে গাল পাড়ছে মিত্রা। অর্থাৎ রাখীরও এ বাড়িতে মর্যাদাটা কমে এল।

সন্ধ্যেবেলা রন্টুও এসে ঘরে দাপাতে শুরু করল,—দিদি, মিত্রা যা বলছে সেটা কি ঠিক?

ছ বছরের ছোট ভায়ের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলতে প্রবৃত্তি হচ্ছিল না রাখীর। তবু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘাড় নাড়ল।

—তুই আমায় কথাটা আগে বলিসনি কেন? দেখতাম জামাইবাবুর কত সাহস তোকে বাড়ি থেকে তাড়ায়!

রাখী মৃদু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল,—তোর জামাইবাবু আমায় তাড়ায়নি রে, আমি নিজেই চলে এসেছি।

—থাক থাক, আর জামাইবাবুকে গার্ড দিতে হবে না। এই করে করেই তো লোকটার মাথা খেয়েছিস। হুঁহ, বিজ্ঞানী! চোখের চামড়া নেই, বজ্জাতের ধাড়ি! এই যে সারাটা জীবন ধরে চোখ বুজে লোকটার সেবা করে গেলি, কী পেলি ভেবে দ্যাখ এবার!

কথাগুলো রাখীরও মনের কথা, তবু রন্টুর মুখে শুনতে মোটেই ভাল লাগছিল না। কিন্তু একবার যখন শুরু হয়ে গেছে, রন্টুকে আর থামায় কে! রীতিমতো জেরা শুরু করে দিয়েছে এবার,—তোকে নাকি টাকা পাঠিয়েছিল জামাইবাবু?

রাখী ঘাড় নাড়ল।

—আমার বাড়িতে আমার দিদি রয়েছে, সেখানে টাকা পাঠায়, অ্যাঁ? যদি সত্যি তোর টাকার দরকার হয়, ওই টাকা আমি গলায় গামছা দিয়ে বার করে আনব। দেব একটা অ্যাডাল্টারির মামলা ঠুকে, মাইনেটা পর্যন্ত অ্যাটাচড্ হয়ে যাবে। কী রে দিদি, দেব? পাঠাব একটা নোটিস?

রাখী সন্ত্রস্তভাবে বলল,—এক্ষুনি ও সব করার দরকার নেই, কটা দিন যাক।

—দ্যাখ তুই যা ভাল বুঝিস। তবে হ্যাঁ, ভাই হয়ে আমি তোর কাছে হাত জোড় করছি দিদি, ভুলেও আর তোর শ্বশুরবাড়িতে যাস না। শান্তদা এসে যাই বলে যাক, আমি তোকে লিখে দিতে পারি, আজ হোক কাল হোক ওরা ওদের দাদার পাশে গিয়েই দাঁড়াবে। আর তখন তোকে অনেক বেশি অপমানিত হয়ে ওই বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হবে। বাবুয়া ফিরুক, আমি বাবুয়ার সঙ্গেও খোলাখুলি কথা বলে নিচ্ছি। আমি শিওর, ও তোর দিকেই থাকবে।...ভাবনা করার তো তোর কিছু নেই। এ বাড়ি তো তোরও বাড়ি, এ বাড়িতে তোরও অংশ আছে, তুই তোর নিজের জোরে এখানে থেকে যা।

রন্টু কি একটু বেশি সহানুভূতি দেখাচ্ছে না? কেন ওই সহানুভূতিকে নাটুকে আস্ফালনের মতো শোনায়? কোথায় মনের জোর বাড়বে তা নয়, রাখীর মধ্যে চারিয়ে যাচ্ছে এক হীনম্মন্যতাবোধ। এ বাড়িতে তোরও অংশ আছে, কথাটা বলে কী স্মরণ করাতে চায় রন্টু?

রাখী তক্ষুনি কিছু বলল না ভাইকে। তবে একটা কথা উপলব্ধি করছিল, এ বাড়িতে আজ থেকে তার আর ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু থাকবে না। সবই নিয়ন্ত্রিত হবে রন্টু আর রন্টুর বউয়ের অঙ্গুলিহেলনে। এরা দুজনেই তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করে, নিশ্চিতভাবে তার ভালই চাইবে, তবুও...। হয়তো বাড়ির খানিকটা জায়গা পাকাপাকি ছেড়ে দিয়ে বলল, দিদি এটা তোর জন্যে, তুই এখানেই থাক! হয়তো হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে বলল, এটা রাখ দিদি, তুই আর তোর ছেলে খরচ কর! বলবে ভাল মনেই, কিন্তু রাখী কি তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারবে?

নিজের ওপর ধিক্কার জাগছিল রাখীর। এককালে ফিলজফিতে অনার্স নিয়ে পাশ করেছিল সে, ঘরকন্নার কাজ করতে করতে কবে যেন সেই শিক্ষা মূল্যহীন হয়ে গেছে। ইচ্ছে করলেও আজ আর তার অন্যের হাততোলা হয়ে থাকা ছাড়া বাঁচার উপায় নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই পঞ্চাশ বছর বয়সে কোথায় কী কাজ জোটাবে সে? পরভৃৎ জীবনকেই পরম মোক্ষ ভেবে এতদিন সুখে দিন কাটিয়েছিল রাখী, একটা মাত্র ঝড়ে এই দুর্দশা হবে কে ভেবেছিল?

বাবুয়া ফিরল সাড়ে আটটা নাগাদ। ফিরেই রাখীর কাছে এসেছে,—শুয়ে পড়েছ যে? জ্বরটর এল নাকি?

—না, এমনিই। মাথাটা টিপটিপ করছে...

—ওষুধ খেয়েছ?

—দরকার নেই, কমে যাবে।... তোর এত দেরি কেন? কী পড়াচ্ছিলি এতক্ষণ?

—আর বোলো না, দুটোর মাথাতেই গোবর পোরা। সামনে অ্যানুয়াল পরীক্ষা, এখন একটু ভাল করে ধোলাই না দিলে চলে! বাবুয়া হাসল—আজ ছেলেটার ইতিহাস পরীক্ষা নিচ্ছিলাম। কী লিখেছে জানো? আকবরের বাবার নাম শাজাহান। আর মেয়েটা তো অঙ্ক কষতে গিয়ে...

—তোর কাকা কিন্তু তোর টিউশানি করা পছন্দ করছে না।

বাবুয়ার হাসি হোঁচট খেয়ে গেল। চোখ কুঁচকে তাকিয়েছে।

রাখী বিছানায় উঠে বসল—আজ শান্ত এসেছিল। কথা হচ্ছিল তোকে নিয়ে।

—তাই বলো। কখন এসেছিল?

—এই তো বিকেলের দিকে। তিনটে চারটের সময়।...আমাদের ও বাড়ি চলে যেতে বলেছে।

—ও।

ছেলের গোমড়া মুখখানা একটু দেখে নিয়ে রাখী বলল—তোকে একটা কথা বলব বাবুয়া? রাগ করবি না তো?

—রাগ করার মতো কিছু বলবে নাকি?

—না। ভাল কথাই বলব।...বলি কি, তুই লেক টেরেসে ফিরে যা। হপ্তায় হপ্তায় আসবি, আমার সঙ্গে দেখা করে যাবি, ইচ্ছে হল, মাঝে মাঝে এখানে এক আধদিন রয়ে গেলি...

—হঠাৎ এ কথা উঠছে কেন মা?

—শান্ত খুব জোর করছিল। বার বার বলছিল, বাবুয়া আমাদের বাড়ির ছেলে...। আমিও ভেবে দেখলাম, তুই কেন মিছিমিছি এখানে...! ওটাই তো তোর নিজের বাড়ি, নয় কি?

—আমার কোনও বাড়ি নেই। ওটা আমার ঠাকুরদার বাড়ি।

—এটা কি যুক্তির কথা হল বাবুয়া? তুই কি অস্বীকার করতে পারিস তুই ওই মজুমদার বাড়ির ছেলে?

—আমি কোনও বাড়ির ছেলে নয়। আমি তোমার ছেলে। তুমি যদি ও বাড়ি না যেতে পারো, আমিও পারি না।

ছেলের মুখে এ কথাই শুনতে চাইছিল রাখী, তবু মিনতির সুরে বলল—আমার যাওয়ার উপায় নেই রে। নইলে আমি নিশ্চয়ই যেতাম।

—আমি তো তোমাকে একবারও যেতে বলিনি মা। আমি শুধু বলছি, তোমার যেখানে থাকার অসুবিধে, সেখানে আমিও থাকব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—সে তো আমার এখানেও থাকতে ভাল লাগছে না।

—থেকো না এখানে। বলো তো আমি কাল থেকেই বাড়ি খুঁজতে পারি।

—যাহ্, তা হয় নাকি? আমার টাকা কোথায়?

—ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয় মা। লকারে তোমার নিজের যা গয়নাগাঁটি আছে, তুলে নাও। তার থেকে কিছু বেচে আমরা কটা মাস চালাতে পারব না? এর মধ্যে আমার পরীক্ষাও হয়ে যাবে।... কিছু একটা আমি জোগাড় করে নেব, তুমি দেখো।

—তুই চাকরি করবি? পড়াশুনো ছেড়ে দিবি? রাখী প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

—আহ্ মা, পড়াশুনো আগে, না বেঁচে থাকাটা আগে? সময় সুযোগ পেলে পড়ব, নয়তো...। আগে আমায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

বাবুয়ার চোখমুখ ভাল ঠেকছিল না রাখীর। কেমন যেন অস্বাভাবিক রকমের জ্বলজ্বল করছে। মাকে খাওয়ানো পরানোর ভার নিতে চাইছে, কবে থেকে এত বড় হয়ে গেল বাবুয়া?

বাবুয়া পাশে এসে বসল—তুমি কিছু ভেবো না মা। এভরিথিং উইল বি ফাইন। আমি তো আছি।

রাখীর চোখে জল এসে গেল। তার কথা ভেবে ছেলে লেখাপড়া ছেড়ে দেবে, এ কথা যেন কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। ওইটুকু ছেলে কী চাকরি করবে? এ কী অসহায় অবস্থায় ছেলেকে ফেলে দিল রাখী?

বহুকাল পর বাবুয়া জড়িয়ে ধরেছে রাখীকে, সেই ছেলেবেলার মতো। গাল থেকে চোখের জল মুছে দিল, মাথায় হাত বোলাচ্ছে। মৃদু স্বরে বোঝাচ্ছে রাখীকে। যেন রাখী এখন বাচ্চা মেয়ে, বাবুয়া তার প্রাপ্তবয়স্ক অভিভাবক। যেন রাখী তার আশ্রয় নয়, সেই রাখীর আশ্রয়।

জীবন যে কাকে কখন কোথায় নিয়ে যায়।

পনেরো

—দয়ি, অ্যাই দয়ি...শোন...

প্র্যাকটিকাল ক্লাস শেষ হতেই ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে তড়িঘড়ি করিডর ধরে হাঁটা শুরু করেছিল দয়িতা, মৈত্রেয়ীর ডাক শুনে ফিরে তাকাল। মৈত্রেয়ী একা নয়, সঙ্গে শুভজিৎ আর তন্ময় আছে।

দয়িতা ঘড়ি দেখতে দেখতে বলল—কী বলছিস?

মৈত্রেয়ী এগিয়ে এল—তুই কর্নার টেবিলের জি এম কাউন্টারটায় কাজ করছিলি না?

—হ্যাঁ, কেন?

—তোর ডেটা দেখি। আমার রেজাল্টটা ঠিক আসছে না।

দয়িতা ব্যাগ থেকে খাতা বার করে মৈত্রেয়ীকে দিল। করিডরে আলো কম, ধারের জানলায় সরে গেল মৈত্রেয়ী, মন দিয়ে দেখছে খাতা। শুভজিৎও ঝুঁকে চোখ রাখল। দয়িতার রিডিংগুলো সাজানো গোছানো নেই, খুঁজে বার করতে অসুবিধে হচ্ছিল মৈত্রেয়ীর। নিজের নোটবই খুলল, মেলাচ্ছে।

তন্ময় আর দয়িতা কথা বলছিল। তন্ময় লেখাপড়ায় খুব সিরিয়াস, কথাবার্তার ভঙ্গিও

বেশ কেজো ধরনের। গ্রাম্ভারি মুখে সে জিজ্ঞাসা করল—তুই চলে যাচ্ছিস নাকি? আজও পি এসের ক্লাসটা করবি না?

—তুৎ, বোর লাগে। দয়িতা প্রসঙ্গটা এড়াতে চাইল।

—যেমনই লাগুক, পি এসের নোট কিন্তু সলিড। আর বই ঘাঁটার দরকার হয় না।

—নোট তো নিবিই, কাল তোর খাতা থেকে টুকে নেব।

—তা নিস। তন্ময়ের মুখ আরও গম্ভীর—তুই কিন্তু আজকাল খুব ক্লাস বাংক করছিস দয়ি, প্রবলেমে পড়ে যাবি।

—যাহ্, ওর আবার প্রবলেম কী! মৈত্রেয়ীর মন্তব্য উড়ে এল,—দয়ির এখন বড় নাওয়ে খুঁটি বাঁধা আছে। কিংবা বলতে পারিস বড় খুঁটিতে নাও বাঁধা আছে।

দয়িতা শুনেও না শোনার ভান করল। হোস্টেল ছেড়ে আসার পর থেকে সে আর বোধিসত্ত্ব এখন গোটা ক্যাম্পাস টাউনের চাটনি খবর, অহরহ এরকম ছুটকো ছাটকা টিপ্পনীর সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাকে। প্রাণপণে চোখ কান বন্ধ রেখে উপেক্ষা করার চেষ্টা করে দয়িতা, তবু কখনও কখনও গায়ে বিঁধে যায় বইকী। উপায় নেই, মাস দেড়েক আরও এভাবেই কাটাতে হবে, ফাইনাল পরীক্ষাটা না হওয়া পর্যন্ত।

মৈত্রেয়ীর চোখ আবার খাতায় নেমে গেছে। নির্লিপ্ত ভঙ্গি, কোনও তাড়াহুড়ো নেই যেন।

দয়িতা আর একবার কবজি উলটোল। দশটা পঁচিশ। অধৈর্য গলায় বলল—খাতাটা তুই রেখে দে, কাল নিয়ে নেব।

—না বাবা, তোর জিনিস তুই নিয়ে যা। আমার আবার কোথায় মিসপ্লেসড হয়ে যাবে...

—তা হলে একটু তাড়াতাড়ি কর, প্লিজ।

—হোয়াই সো হারি, অ্যাঁ? গিয়েই কি এখন স্যারের লুঙ্গি কাচতে বসবি?

দপ করে চোখে আগুন জ্বলে উঠল দয়িতার। চোয়ালে চোয়াল চেপে সামলাল নিজেকে, ছোঁ মেরে কেড়ে নিল খাতা। মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছে হনহন। পিছনে সমবেত হাসির রোল, দয়িতার কানে বিষ ঢালছিল।

অসহ্য! অসহ্য!

কোনওদিকে না তাকিয়ে দয়িতা ইউনিভার্সিটির গেট পেরল। মাথা রাগে ঝাঁ ঝাঁ করছে। দয়িতা বোধিসত্ত্বর সঙ্গে আছে কি নেই, দয়িতা বোধিসত্ত্বর ঘর ভাঙল কি গড়ল, তা নিয়ে তোদের এত কিসের মাথাব্যথা? উঁহু, মাথাব্যথা নয়, জ্বলুনি। হিংসে। হিংসেয় জ্বলছে সব। বোধিসত্ত্বর মতো এক বিশাল মাপের মানুষ এখন শুধু দয়িতার অধিকারে, এটাই কারও সহ্য হচ্ছে না। চিরশ্রী যে চিরশ্রী সে পর্যন্ত কথা বন্ধ করে দিল। হোস্টেল থেকে যে দিন বইপত্র জামাকাপড় নিয়ে বেরিয়ে এল দয়িতা, সে দিন কী তার জ্ঞান দেওয়ার বহর! ঠিক কাজ করছিস না দয়ি, মোহে তুই অন্ধ হয়ে গিয়েছিস! ওরে কী আমার ঠাকুমা রে! কথা বলবি না বলিস না, দয়িতার ভারী বয়েই গেল।

বাড়ি পৌঁছে দয়িতা দেখল রূপচাঁদ ভাত আর ডাল করে ফেলেছে। কপি আলু কড়াইশুঁটিও কেটেকুটে রেডি, দয়িতার প্রতীক্ষায়।

দয়িতা কোমর বেঁধে রান্নায় নেমে পড়ল। বইখাতা ঠাঁইঠুই ছুঁড়ে দিয়েছে সোফায়, সালোয়ার কামিজের ওপর বেঁধে নিয়েছে অ্যাপ্রন। ধোঁয়া ওঠা তেলে আলু কপি ছাড়ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাক কুঁচকে মাছটাকে দেখল একবার। কই মাছ। বিচ্ছিরি বাঁকা বাঁকা কাঁটা, গাটাও কেমন হড়হড়ে, কাঁচা অবস্থায় আঁশটে গন্ধও আছে। রোজ মুরগি খেলেই তো হয়, কেন যে বোধিসত্ত্ব এত মাছ খেতে ভালবাসে! নুন হলুদ মাখানোই আছে, কড়ায় একটা একটা করে মাছ ছাড়ছে দয়িতা, আর সভয়ে তিনপা করে পিছিয়ে আসছে। বাপস্, কী জোর জোর ফাটে! পরশু পোনা মাছ ভাজতে গিয়েই হাতে ইয়া বড় একটা ফোসকা পড়েছিল দয়িতার।

খুন্তি দিয়ে সন্তর্পণে একটা মাছ উলটে দিয়ে দয়িতা সরে এল। রান্না বেশ ঝকমারির কাজ। প্রথম প্রথম দয়িতার বেশ কাহিল দশা হয়েছিল। সে একেবারেই রান্নাবান্না জানে না তা নয়, শৌখিন দু-চারখানা পদ চমৎকার বানিয়ে ফেলতে পারে। দহিচিকেন, বাটার পনির মশালা, কপির রোস্ট, মালাই কোপ্তা...। কিন্তু এ সব রান্না কি রোজ চলে? বোধিসত্ত্বর তো একেবারেই চলে না, তেল মশলা কম হালকা হালকা রান্নাই তার বেশি পছন্দ। অগত্যা টাউন থেকে 'সহজ পাক প্রণালী' একখানা কিনে এনেছে দয়িতা। তাই দেখে দেখে বড়ির ঝাল, শুক্তনি, আলু কপির ডালনা, পালংবেগুন, পাতলা পাতলা মাছের ঝোল...— মোটামুটি রপ্তই হয়ে গেছে। শুধু নুনের আন্দাজটাই এখনও ঠিকঠাক হয়নি, এই যা।

কই মাছ রান্না অবশ্য আজ এই প্রথম। মনে মনে একটু সমস্যাই হচ্ছিল দয়িতার। ডাকল—রূপচাঁদ?

রূপচাঁদ ঘর ঝাড়ামোছা শুরু করেছিল। দৌড়ে এসেছে—আজ্ঞা দিদিমণি?

—তেলকই কী করে রাঁধে, জানো?

—না আজ্ঞা।

—মাছটা তা হলে কীভাবে করি বলো তো?

—আজ্ঞা, ঝোল করে দিন।

—পেঁয়াজ দিয়ে? না সর্ষেবাটা?

—আজ্ঞা, জিরেও দিতে পারেন, মা জিরে দিয়ে ফুলকপি দিয়ে রান্তেন।

কথাটা সচেতনভাবে বলেনি রূপচাঁদ, তবু দয়িতার কানে লেগে গেল। অজান্তেই গম্ভীর হয়ে গেল মুখ। রূপচাঁদ ঘাড় নিচু করে তার আদেশ পালন করে যায় বটে, তবু এখনও যেন মনে হয় এ বাড়িতে দয়িতার উপস্থিতি তার পুরোপুরি হজম হয়নি। নইলে কারণে অকারণে রাখীর প্রসঙ্গে তোলে কেন? মাঝে মাঝে কেমন যেন অদ্ভুত চোখে তাকিয়েও থাকে দয়িতার দিকে, যেন আজব গ্রহের জীব দেখছে। সরলতা মাখা দৃষ্টিও কখনও কখনও এত অসহনীয় মনে হয়!

রূপচাঁদের কথা মতো কপি দিয়ে ঝোল করলেই শর্টকাট হত, কিন্তু দয়িতা সে পথে গেল না। পেঁয়াজ আদা রসুন দিয়ে কষকষে করে রাঁধল মাছ, আলাদাভাবে আলু-কপির তরকারি। কেন করল? অদৃশ্য প্রতিপক্ষের সঙ্গে রেষারেষি? খেতে বসে পাছে বোধিসত্ত্বর রাখীর কথা স্মরণে আসে, এই আশঙ্কায়? দয়িতা নিজেও ঠিক ঠিক জানে না।

বোধিসত্ত্ব ফিরল নিজের সময় মতোই। সাড়ে এগারোটায়। এসেই জুতো মোজা ছেড়ে বাথরুমে ঢুকছে। সেখান থেকেই চেঁচাল—রূপচাঁদ? অ্যাই রূপচাঁদ? গিজার চালাসনি কেন?

রূপচাঁদ দৌড়ে গেল—মনে ছিল না আজ্ঞা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—মন তোমার থাকে কোথায়, অ্যাঁ? কান আমি ছিঁড়ে নেব।

—আহা, ওকে বকছ কেন? দয়িতা লঘু স্বরে বলল,—শীত তো কমে গেছে, একদিন ঠাণ্ডা জলে হাত-মুখ ধুলে কী এমন ক্ষতি হবে?

—আমার হ্যাবিট।

হ্যাবিটটা বদলাও। বলতে গিয়েও বলল না দয়িতা। কী যে সব আজেবাজে অভ্যেস তৈরি করে দিয়ে গেছে ওই মহিলা, কোনও কাজ লোকটা নিজের হাতে করতে পারে না। এক্ষুনি হাতের গোড়ায় তোয়ালে চাইবে, সাবান চাইবে, চটি চাইবে...। ভাবতে গেলে দয়িতার হাসিও পায়। লোকটা নামেই রাশভারী, ভেতরে ভেতরে এক্কেবারে শিশু, এখনও।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে খাবার টেবিলে বসেছে বোধিসত্ত্ব। মুখটা যেন একটু ভার ভার। দয়িতা ঝটিতি টক দই বার করল ফ্রিজ থেকে, স্যালাডের প্লেট সাজিয়ে দিল।

চামচে ভাত তুলতে তুলতে বলল—ওমনি বাবুর গোঁসা হল বুঝি?

—উঁ?

—বলছি, এত রাগ কেন?

বোধিসত্ত্ব চোখ তুলল—রাগ করিনি তো।

—কোরো না। অপাঙ্গে রূপচাঁদকে দেখে নিল দয়িতা, চাপা স্বরে বলল—তোমার রাগ দেখলে আমার বুক কাঁপে।

বোধিসত্ত্বর ঠোঁটে হাসি ফুটল। খাচ্ছে, তৃপ্ত মুখে। তবু যেন মাঝে মাঝে সামান্য অন্যমনস্ক, যেন মেঘলা ছায়া পড়ছে মুখে। আবার মিলিয়েও যাচ্ছে ছায়া। কই মাছটা কেমন হয়েছে জানতে খুব ইচ্ছে করছিল দয়িতার, জিজ্ঞেস করল না, বাধো বাধো ঠেকল। কেন নিজে থেকে কিছু বলে না বোধিসত্ত্ব?

দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে বোধিসত্ত্ব আবার ইউনিভার্সিটিতে যায়। এটাই রুটিন। আজ শুল না, স্টাডিরুমে বসে সিগারেট খাচ্ছে। দয়িতা খেয়ে উঠে স্নানে ঢুকেছিল, বেরিয়ে একটু অবাকই হল। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে স্টাডিরুমে এসেছে।

মুচকি হেসে বলল—বসে কেন? শোবে না?

—ইচ্ছে করছে না।

—ভাবছ কিছু?

—উঁ? নাহ্। বোধিসত্ত্ব হাত বাড়িয়ে দয়িতাকে কাছে টানল— তোমার আজ আর ক্লাস নেই?

—যাব না।

—কোনওদিনই তো সেকেন্ড হাফে যাচ্ছ না! আননেসেসারি ডুব মারছে কেন?

দয়িতা মনে মনে বলল, আমার আজকাল আর ইউনিভার্সিটি যেতেই ভাল লাগে না। সকাল বিকেল কক্ষনও না।

মুখে বলল—এখন সব থিয়োরির ক্লাস। না গেলেও চলে।

—সে কী কথা! ফিজিক্স নিয়ে পড়ছ, থিয়োরির ক্লাস না করলে চলবে?

—তুমি তো আছ। দয়িতা আদুরে বালিকার মতো বোধিসত্ত্বর কোলে বসল। দু হাতে গলা জড়িয়ে ধরেছে। ফিসফিস করে বলল—তুমি আমায় সব পেপার পড়িয়ে দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারো না?

দয়িতার মাদক গন্ধে চকিতে আচ্ছন্ন বোধিসত্ত্ব। কণ্ঠ থেকে অধ্যাপকের সুর হারিয়ে গেছে, চটুল স্বরে বলল—এখন কোন পেপারটা পড়বে?

—তুমিই বলো। বোধিসত্ত্বর চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিল দয়িতা।

বোধিসত্ত্ব আলগা চুম্বন করল দয়িতাকে। ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে চুম্বন, ঠোঁট ঘুরছে ঠোঁটে গালে কপালে চোখে গলায়। নাইটির ওপর হাউসকোট জড়িয়ে আছে দয়িতা, চপল হাতে আবরণ সরাচ্ছে বোধিসত্ত্ব। তার ঈষৎ খসখসে ত্বকের ছোঁয়ায় শিরশির করছে দয়িতার শরীর, বুজে গেছে দু চোখ, মাঘের দুপুরে আপ্লুত হচ্ছে চেনা ভাললাগায়।

হঠাৎই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ঝাঁকুনিতে সচকিত হল দয়িতা। স্টাডিরুমের দরজা ভেজানো নেই, পরদা দুলছে মৃদু মৃদু, ফাঁক দিয়ে এক ছায়ামূর্তি দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে দয়িতা ছিটকে সরে গেছে।

কামার্ত বোধিসত্ত্ব বিহ্বল মুখে বলল—কী হল?

দয়িতা দরজার দিকে ইশারা করল।

অমনি গর্জন করে উঠেছে বোধিসত্ত্ব—অ্যাই রূপচাঁদ, কী করছিস ওখানে?

স্থির দাঁড়িয়ে থাকা রূপচাঁদ নীরব।

—কী হল, জবাব দিচ্ছিস না কেন?

এতক্ষণে মিনমিনে গলা শোনা গেল—আজ্ঞা বাগানের কথা বলব ভাবছিলাম। গাঁদা সব মরে গেছে, ওগুলো তুলে ফেলে গোলাপের চারা লাগাব?

—এটা তোর বাগানের কথা বলার সময়? কোনও বাগান হবে না, ভাগ্, ভাগ্ এখান থেকে।

রূপচাঁদ সরে গেল বটে, কিন্তু দয়িতাতে আর ডুবল না বোধিসত্ত্ব। একটুক্ষণ বসে রইল ঝুম হয়ে, তারপর তেতো মুখে উঠে পড়েছে। চশমা পরল, ব্যাগ কাঁধে নিল, ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

দয়িতার ভারী অদ্ভুত লাগছিল। মানুষটা একটাও কথা না বলে চলে গেল কেন? নিজেই তো বলে রূপচাঁদ একটু হাবাগোবা ধরনের, কত সময়ই তো রূপচাঁদের অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করে দয়িতাকে আলগা আদর টাদরও করেছে, তা বলে এই মুহূর্তে এত খেপে গেল কেন? কিছু একটা হয়েছে! কিছু একটা হয়েছে! বাড়ি ফেরার পর বোধিসত্ত্ব আজ কি একটু বেশি আনমনা ছিল না?

দুপুরটা বড় নির্জন এখন। ঠাণ্ডা কমে গেছে ঠিকই, তবে রোদ্দুরের তেজ এখনও তেমন প্রখর নয়। বাতাসে বেশ একটা শীত শীত আমেজ আছে। শুকনো পাতারা কেঁপে কেঁপে ঝরে পড়ছে গাছ থেকে, উড়ছে হাওয়ায়। কোথায় যেন কুবো পাখি ডাকছে একটা, কুবকুব কুবকুব...।

গায়ে আলগা চাদর জড়িয়ে বাগানে এলোমেলো হাঁটছিল দয়িতা। ভাবছে। বাগানের কথা উল্লেখ করেই কি বোধিসত্ত্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল রূপচাঁদ? বাগান রাখীর অনেকখানি ছিল, দয়িতা শুনেছে। বাগানটা কি বোধিসত্ত্বকে রাখীর কথা মনে পড়িয়ে দিল?

রূপচাঁদ বারান্দায় ম্রিয়মাণ মুখে দাঁড়িয়ে। দয়িতা তার কাছে গিয়ে নরম গলায় বলল—ঠাণ্ডা তো কমে গেছে, এখন কি গোলাপফুল ভাল হবে, রূপচাঁদ?

রূপচাঁদ করুণ চোখে তাকাল—গোলাপ তো বারো মাসই হয় দিদিমণি।

—গোলাপের তো অনেক হ্যাপা। গোলাপগাছের যত্ন করতে জানো?

—আজ্ঞা, মা শিখিয়েছিল। মার বড় গোলাপের শখ ছিল।

এবার কি রূপচাঁদ ইচ্ছে করেই বলল কথাটা? দয়িতা বুঝতে পারল না। মা দিদিমণি শব্দগুলো কোন এক গ্রন্থিতে গিয়ে যেন আঘাত করে, মন বিস্বাদ হয়ে যায়।

ঘরে এসে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল দয়িতা। বাইরে হাওয়া বইছে এলোমেলো, মাঘের হাওয়া, আওয়াজ বাজছে সরসর। বাতাসটা যেন বুকের মধ্যেও ঢুকে পড়ছে। মাস খানেকের ওপর হয়ে গেল, এখনও এ বাড়ির সর্বত্র শুধু রাখী রাখী রাখী। রান্নাঘরের প্রতিটি হাতা চামচ থালা বাটিতে রাখীর ছোঁয়া, বাড়ির প্রতিটি দরজায় জানলায় দেয়ালে পরদায় রাখী প্রখরভাবে বিরাজমান। আলমারি খুললে রাখীর শাড়ি ব্লাউজ, ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ার টানলে রাখীর ক্লিপ কাঁটা ক্রিম পাউডার সিঁদুর। এমনকি এই যে এখন বিছানায় শুয়ে আছে দয়িতা, এখানেও দিনে রাতে সর্বক্ষণ কী তীব্র রাখী রাখী গন্ধ! আদ্যন্ত রাখীতে সম্পৃক্ত হয়ে থাকা এই সংসারে দয়িতা তা হলে কে? তার অবস্থানই বা কোথায়? বোধিসত্ত্বর হৃদয়েই বা ঠিক কোনখানটায় আছে সে? বোধিসত্ত্বকে সে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে, তার একটিমাত্র আহ্বানে আজন্মলালিত সংস্কার সম্পর্ক সব ত্যাগ করে চলে এসেছে...তবু এই মুহূর্তে সে বোধিসত্ত্বর কে? প্রেমিকা? রক্ষিতা? নর্মসহচরী? সে দিন বোধিসত্ত্বর ভাই এল বাড়িতে, তাকে দেখে সিঁটিয়ে রইল দয়িতা। কেন? দয়িতা কি তবে পাপবোধে ভুগতে শুরু করেছে? এখনই কি মনে হচ্ছে ভুল করে ফেলেছে সে?

এতাল বেতাল ভাবনার মাঝে কখন যেন জড়িয়ে এল দয়িতার চোখ। হালকা হালকা ঘুমের মাঝে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখছিল দয়িতা। কলকাতায় তাদের শোভাবাজারের ফ্ল্যাটটা প্রচুর আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। কী বিশাল হয়ে গেছে ফ্ল্যাটটা, এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো দেখা যায় না। কত অজস্র পরিচিত লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে। মাসি পিসি, কলেজের বন্ধু, ইউনিভার্সিটির বন্ধু, বাবা মা বুম্‌বা...। রাখীও আছে সেখানে। পরনে বেনারসি, খোঁপায় ফুল। বিয়ে হচ্ছে ফ্ল্যাটবাড়িটায়, বরের বেশে বোধিসত্ত্ব, কনের সাজে দয়িতা স্বয়ং। কী জোরে জোরে মন্ত্র পড়ছে পুরোহিত! যদিদং হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম...। হঠাৎ কোথ্‌থেকে রে রে করে তেড়ে এল বাবা । আঙুল তুলে শাসাচ্ছে বোধিসত্ত্বকে। রাখীও ছুটে এসেছে, বিয়ের পিঁড়ি থেকে টেনে তুলছে দয়িতাকে। বিপুল হট্টগোল শুরু হয়ে গেল, অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে লোকজন। দুম করে বিয়েবাড়ি উবে গেল, দয়িতা দেখল সে শুয়ে আছে শোভাবাজারের বাড়িরই নিজের ঘরে, নিজের বিছানায়। আশ্চর্য, ঘরটায় ক্যাম্পাস টাউনের এই শোওয়ার ঘরের সব আসবাব! বাবা ঘরে ঢুকল। কাঁদো কাঁদো গলা, তোর মনে শেষে এই ছিল মুনিয়া? রাখী এল ঘরে। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রুগির মতো চেঁচাচ্ছে, —এই ঘর আমার, বেরিয়ে যাও তুমি, দূর হয়ে যাও। দয়িতা প্রতিবাদ করতে চাইল, ঠোঁটে শব্দ ফুটছে না। চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে, হিহি হাসছে রাখী। দয়িতা উঠে বোধিসত্ত্বকে খুঁজতে শুরু করল। এ ঘর থেকে ও ঘরে যাচ্ছে, ও ঘর থেকে এ ঘর, বোধিসত্ত্ব কোথ্‌থাও নেই। ধোঁয়া ধোঁয়া আবছায়ায় বুম্‌বাকে দেখা যাচ্ছে, মাকে দেখা যাচ্ছে, বাবাকে দেখা যাচ্ছে...। বাবা এসে দয়িতার হাত জড়িয়ে ধরল, মুনিয়া রে, ফিরে আয়। বাবার হাতের চাপ বাড়ছে ক্রমশ...

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপ্ন ছিঁড়ে গেল। ঘুমটাও। চোখ বোজা অবস্থাতেই দয়িতা টের পেল সত্যি সত্যি তার হাত চেপে ধরেছে কেউ।

—কী হল দয়িতা, অসময়ে ঘুমোচ্ছ কেন?

বোধিসত্ত্বর গলা। দয়িতা চমকে উঠে বসল। কটা বাজে এখন? সন্ধে হয়ে গেছে নাকি? উঁহু, এখনও তো আলো দেখা যায়। বোধিসত্ত্ব আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরে এল যে?

দয়িতার মুখের কাছে নেমে এসেছে বোধিসত্ত্বর মুখ—শরীর খারাপ লাগছে নাকি, দয়িতা?

—নাহ্। দয়িতা মাথা নাড়ল—তুমি চলে এলে যে?

—এলাম। তুমি রোজ রোজ ক্লাস ডুব মারতে পারো, আমি একদিন লাইব্রেরি অফ করতে পারি না? হা হা হা।

গমগমে গলায় হাসছে বোধিসত্ত্ব। সেই বিখ্যাত হাসি। কিন্তু এই মুহূর্তে ওই হাসিতে যেন তেমন প্রাণ নেই, মনে হল দয়িতার।

মৃদু হেসে দয়িতা জিজ্ঞেস করল—চা খাবে তো?

—খেতেই পারি।

—জলখাবার খাবে কিছু? করব?

—না থাক। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট দিও।

বিছানা ছেড়ে রান্নাঘরে এল দয়িতা। গ্যাস জ্বেলে কেটলিতে জল বসাল। ঘুমিয়ে পড়ে সত্যি গা ম্যাজম্যাজ করছে, সিঙ্ক থেকে মুখে চোখে জল ছিটিয়ে এল একটু। প্রতীক্ষা করছে জল ফোটার, চোখ গ্যাসের নীল শিখায় স্থির। স্বপ্নটা ঝাপটা মারছে হঠাৎ হঠাৎ, তীব্র এক মনকেমন করায় অসাড় হয়ে যাচ্ছে বুক। কতদিন পর বাবার মুখ স্পষ্ট দেখতে পেল আবার। কী বিষণ্ণ, কী বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল বাবাকে! সত্যি সত্যি কি তার জন্য অমন দশা হয়েছে বাবার? তা হলে একদিনও খোঁজ নিল না কেন কেউ? অভিমান? হোস্টেল থেকে চলে আসার পর বাবা-মাকে চিঠি লিখেছিল একটা, জানিয়ে দিয়েছিল সে এখন বোধিসত্ত্বর সঙ্গে আছে, সে চিঠির কোনও জবাব আসেনি। হয়তো এটাই স্বাভাবিক, সে তো বাবা-মার চোখে মরেই গেছে। কিন্তু বুম্‌বাটা তো একবার আসতে পারত। দিদি কেমন আছে, কীভাবে আছে, তাও জানতে ইচ্ছে করে না?

জল ফুটে উঠেছে, উষ্ণ বাষ্প ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে। আঙুল দিয়ে চোখের কোণ মুছে নিল দয়িতা। চা ভেজাল, প্লেটে বিস্কুট সাজাল। ট্রে হাতে ড্রয়িংরুমে এসে দেখল কাকে যেন ফোন করছে বোধিসত্ত্ব।

দয়িতা বসল সামনের সোফায়। এদিক এদিক চোখ চালিয়ে খুঁজল রূপচাঁদকে, দেখতে পেল না। বোধ হয় নিজের ঘরেটরে গেছে।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে বোধিসত্ত্বর ফোনালাপ টুকরো টুকরো শুনতে পাচ্ছিল দয়িতা। সম্ভবত কলকাতায় ফোন করছে। কোনও সতীর্থ বা সহকর্মীর সঙ্গে নিজের গবেষণার বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে জোর। বার্লিন যাওয়া নিয়েও কী যেন বলল বোধিসত্ত্ব। ফোনে বড় অনুচ্চ স্বরে কথা বলে বোধিসত্ত্ব, ঠিক ঠিক শুনতে পাচ্ছিল না দয়িতা।

ফোন রাখতেই দয়িতা জিজ্ঞাসা করল—তোমার বার্লিন যাওয়া যেন কবে?

—মার্চের একুশ। বোধিসত্ত্ব সোফায় বসে কাপে ঠোঁট ছোঁয়াল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কদিন থাকবে ওখানে?

—মোটামুটি দু সপ্তাহ। কোনও কারণে ট্যুর এক্সটেন্ডেডও হতে পারে। তবে কোনওভাবেই এক মাসের বেশি নয়।

—আমি অদ্দিন একা থাকব?

—অদ্দিন কোথায়? কটা তো মাত্র দিন। তোমাকেও নিয়ে যেতে পারলে ভাল লাগত, কিন্তু...বোধিসত্ত্ব হোঁচট খেল। সামান্য থেমে থেকে বলল—মার্চ মাসে তোমার তো পরীক্ষাও আছে...

দয়িতা আর কথা বাড়াল না। কেন তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় সেও বোঝে বইকী। কোন পরিচয়ে তাকে নিয়ে যাবে বোধিসত্ত্ব?

নিজের অজান্তেই মুখটা বুঝি থমথমে হয়ে গেছে দয়িতার। বোধিসত্ত্বও যেন কিছু আন্দাজ করেছে। নিজে থেকেই বলল—নেক্সট উইকে একবার কলকাতা যাব ভাবছি।

দয়িতার ভুরুতে প্রশ্নচিহ্ন জাগল একটু। বোধিসত্ত্ব বলল—অনেক দিন হয়ে গেল, এবার ডিভোর্স স্যুটটা ফাইল করতে হবে না? ল'ইয়ারের সঙ্গে কথা বলে আসি।

দয়িতা চুপ করে রইল।

বোধিসত্ত্ব আবার বলল—রাখী মনে হয় কনটেস্ট করবে না, কী বলো? অ্যালিমনি অবশ্য একটা দিতে হবে। দ্যাট আই ক্যান অ্যাফোর্ড।

কথাটা দয়িতার শোনা, এবারও কোনও শব্দ করল না।

চা শেষ করে সিগারেট ধরিয়েছে বোধিসত্ত্ব। এক সঙ্গে অনেকটা ধোঁয়া বুকে নিল, ছাড়ছে জোরে জোরে। একটু অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল—আর একটা কথাও ভাবছিলাম, বুঝলে?

—কী?

—এখানকার এই চাকরিটা ছেড়ে দেব।

এবার বেশ চমকাল দয়িতা। অস্ফুটে বলল—হঠাৎ এমন চিন্তা?

—কলকাতায় থিয়োরিটিকাল ফিজিক্সের একটা ইন্সটিটিউট খুলেছে, সল্ট লেকে। বিজন গুহরায় ওখানকার ডিরেক্টর। আমাকে অনেকবার রিকোয়েস্ট করেছে ওদের ওখানে জয়েন করার জন্যে। বেশ লুক্রেটিভ অফার, ফ্ল্যাটট্যাটও দেবে। যেটুকুনি পড়ানো টড়ানোর ব্যাপার থাকবে, তাও ফর্ খুব সিলেকটেড্ ফিউ। আমার কাজকর্মের জন্যও অনেক বেশি সময় পাব... এতদিন না না করেছি, এবার ভাবছি ওটা নিয়েই নিই। তোমার কী মত?

দয়িতার হৃৎপিণ্ড লাফ দিয়ে উঠল। দুপুর থেকে জমে ওঠা মনের মেঘ পলকে উধাও। দারুণ খুশি খুশি গলায় বলল—ওমা, সে তো খুব ভাল হবে। আমার এখানে একদম ভাল লাগছে না।

—জানি তো। বুঝতে পারি তো। তোমার কথা ভেবেই না আমি আরও...। বোধিসত্ত্ব আলগা হাসল।

বাইরে আঁধার নামছে, ঘরে আলো এখন বেশ কম। আবছায়ার মাঝে নীলচে ধোঁয়ার মেঘ। সেই মেঘের আড়াল থেকে যেন বোধিসত্ত্ব বলল—নতুন সংসার গড়তে গেলে নতুন পরিবেশই ভাল, নয় কী?

—ঠিকই তো। বটেই তো। দয়িতার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে,—আমি নিজেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে কথাটা বলব ভাবছিলাম। বলতে বলতে অল্প অল্প মাথা দোলাচ্ছে দয়িতা, বাচ্চা মেয়ের মতো। আদুরে গলায় বলল—অ্যাই, আমরা কিন্তু এ বাড়ির কিচ্ছু নিয়ে যাব না।

—সে কী! এত জিনিস সব ফেলে দিয়ে যাবে?

—বেচে দাও। দান করে দাও। দয়িতা ঝরনার মতো হেসে উঠল—যার জিনিস তার কাছে পাঠিয়ে দাও। আমার খেলাঘর আমিই বানিয়ে নেব।

—বেশ, তাই হবে।

দয়িতা নাচতে নাচতে উঠে ঘরের দুটো বড় বাতিই জ্বালিয়ে দিল। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়েছে ঘর, আলোময় বোধিসত্ত্বর মুখও। ইশ, সারা দুপুর মিছিমিছি আবোলতাবোল ভেবে মরেছে দয়িতা। বোধিসত্ত্ব কি কখনও দয়িতা ছাড়া আর কোনও ভাবনায় উদাস হতে পারে? মোটেই না।

ষোলো

মার্চের গোড়াতেই তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার নতুন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করল বোধিসত্ত্ব। প্রথম দর্শনেই জায়গাটা তার বেশ পছন্দ হয়েছিল। সুন্দর তিনতলা বিল্ডিং, ছিমছাম পরিবেশ, অগাধ বইপত্র সমন্বিত লাইব্রেরি, গবেষণামনস্ক সহকর্মী...। এখানকার কাজের রীতিনীতি দেখেও সে মোটামুটি খুশি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো রুটিন মেপে এখানে ক্লাস নিতে হবে না। পড়ানোর কাজ আছে বটে, তবে তার ধারা একটু অন্য রকম। সারা বছর ধরেই এখানে ছোট ছোট পাঠক্রম চলে। কোনওটা তিন সপ্তাহের, কোনওটা চার সপ্তাহের, তিন মাসের বেশি কখনও নয়। ছাত্রছাত্রী বলেও বাঁধাধরা কিছু নেই। বিভিন্ন কলেজ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকরা কিংবা তরুণ গবেষকরা আসে এখানে, বিশেষ একটা বিষয় ধরে পুঙ্খানুপঙ্খ আলোচনা চলে ক'দিন। যে যে পাঠ্যক্রমে বোধিসত্ত্ব যুক্ত থাকবে সেগুলোকে সুষ্ঠুভাবে চালনা করা ছাড়া বছরের বাকি সময়টা বোধিসত্ত্বর নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার অবসর।

নতুন প্রতিষ্ঠান বোধিসত্ত্বকে সুযোগ সুবিধেও দিচ্ছে বিস্তর। নিজস্ব কক্ষ, রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্লার্ক, টাইপিস্ট, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি, সব মিলিয়ে পুরোদস্তুর একটা অফিস। যখন তখন ব্যবহারের জন্য গাড়ি, সল্ট লেকে মনোরম ফ্ল্যাট, বোধিসত্ত্বর আর কী চাই!

দয়িতা এখন সুখের সাগরে ভাসছে। কিংবা ডুবে আছে। সে এখন ব্যস্ত নতুন সংসার রচনায়। সত্যি সত্যিই ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস থেকে একটি আসবাবও আনেনি সে, সবই নতুন করে কিনছে। খাট এল, আলমারি এল, সোফাসেট ফ্রিজ টিভি পরদা চাদর কিনল পছন্দ করে, বাসন-কোসনও যে কত কেনা হল। মাত্র সাত আট দিনে ভরে গেছে একটা শূন্য ফ্ল্যাট, নবীন সাজে ঝলমল ঝলমল। এ ঘর ঘুরে, ও ঘর ঘুরে, কত বার যে দেখে ফ্ল্যাটখানাকে, তবু যেন দয়িতার আশ মেটে না।

বোধিসত্ত্বরও মেজাজ ফুরফুরে বটে, তবে সে এখনও কাজে পুরোপুরি মন বসাতে পারেনি। সামনেই বার্লিন যাত্রা, তার খুঁটিনাটি প্রস্তুতি সারছে। ইউরোপের নানা জায়গায় তার পুরনো সহকর্মী আছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, মনের ভেতর চিন্তাভাবনাকে যথাযথ ভাবে সাজানো। ভিসার জন্যও দুদিন কনস্যুলেটে ছোটাছুটি করতে হল। দিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যত ঘনিয়ে আসছে, ততই ভেতরে ভেতরে চোরা টেনশন বাড়ছে তার। সেখানে গিয়ে কী অবস্থায় পড়বে, না পড়বে...। ছেলেমানুষি উদ্বেগ। অর্থহীন। তবু প্রতিবারই বিদেশ যাওয়ার আগে এমনটা হয়।

ফাল্গুন প্রায় শেষ হতে চলল। ঠাণ্ডা বিদায় নিয়েছে অনেকদিন, এখন রীতিমত গরম পড়ে গেছে কলকাতায়। সূর্য বেশ প্রখর থাকে দিনভর। বাতাসও গরম, তবে শুকনো শুকনো। বিশেষ ঘাম হয় না, এটুকুই যা রক্ষে। অবশ্য সন্ধ্যে নামলেই হাওয়াটা ভারী মিঠে হয়ে যায়। অন্তত সল্ট লেকে।

আজ ইনস্টিটিউট থেকে সোজা ফ্ল্যাটে ফিরল না বোধিসত্ত্ব। গেল লেক টেরেসে। শান্তশীলের সঙ্গে কয়েকটা জরুরি কথা আছে। এর মধ্যে দু- তিনবার সে এসেছে এ বাড়ি। একাই। দয়িতাকেও নিয়ে আসার ইচ্ছে ছিল, কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকে। বাবা-মার জন্য কি? হলেও হতে পারে, বোধিসত্ত্ব অতশত তলিয়ে ভাবেনি। লেক টেরেসে আসার ব্যাপারে দয়িতারও তেমন একটা উৎসাহ নেই।

দোতলায় ওঠার আগে বোধিসত্ত্ব একবার নিয়মমাফিক বাবা-মার দরজায় দাঁড়াল। অরবিন্দ ইজিচেয়ারে বসে কী একটা বই পড়ছেন, প্রভাবতী বিছানায় অর্ধশায়িত।

বোধিসত্ত্বকে দেখেই অরবিন্দ বই ভাঁজ করেছেন, টান হয়ে বসলেন প্রভাবতী। বোধিসত্ত্ব ঈষৎ অস্বস্তি বোধ করল। আজকাল তাকে দেখলেই বাবা-মা যেন একটু বেশি তটস্থ হয়ে পড়েন। বাবা-মার সঙ্গে তেমন নৈকট্য নেই বহুদিন, বরং একটা সমীহমাখা দূরত্বই ছিল, তবু ইদানীং বাবা-মার চোখে সে যেন কেমন বাইরের লোক বাইরের লোক! রাখীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদটাই কি কারণ?

প্রভাবতী অরবিন্দ কেউই কিছু বলছেন না। যেন কথা খুঁজছেন, কিন্তু পাচ্ছেন না। অথবা অপেক্ষা করছেন বোধিসত্ত্বর কথার।

বোধিসত্ত্ব গলা ঝেড়ে প্রভাবতীকে জিজ্ঞেস করল—অসময়ে শুয়ে কেন? শরীর খারাপ?

—তেমন নয়, এই একটু গা ম্যাজ ম্যাজ, মাথা ভার...

—জ্বরটর নেই তো?

—মনে হয় না।

—সময়টা ভাল নয়। সিজন চেঞ্জ হচ্ছে... ওষুধ-বিষুধ কিছু খেয়েছ?

—শান্ত দিয়েছিল।

—শান্তকে বলব ডাক্তার দেখিয়ে নিতে?

—লাগবে না রে। এই বয়সে শরীর নিয়ে কথায় কথায় উতলা হতে নেই। প্রভাবতীর কুঞ্চিত গালে মৃদু হাসি ফুটেছে—তুই ভাল আছিস তো?

—আছি একরকম। এবার অরবিন্দর দিকে ফিরল বোধিসত্ত্ব—কী বই পড়ছ?

—গ্রাহাম গ্রিন।

—নভেল?

—হ্যাঁ। ট্রাভেল উইথ মাই আন্ট।

—খুব থ্রিলিং বই। বোধিসত্ত্ব আলগা হাসল। উপদেশের ঢঙে বলল—চোখের বেশি স্ট্রেন কোরো না। বয়সটা আশি হয়েছে, এটা মানো তো?

—হুঁ, এবার রেখে দেব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিঁড়ির কাছে গিয়ে বোধিসত্ত্বর পলকের জন্য মনে হল, মার কপালটা একবার ছুঁয়ে দেখা উচিত ছিল কি? মার চোখ দুটো কেমন ছলছল করছিল না?

অন্যমনস্ক মুখে ওপরে এসে বোধিসত্ত্ব দেখল শান্ত এসে গেছে, ভেতর বারান্দার সোফায় বসে কী যেন গল্প শোনাচ্ছে অফিসের, দীপালি হাসছে মুখ টিপে। জুলি-মিলিও আছে, তারাও হাসছে খিলখিল। কী সুখী পারিবারিক ছবি! শান্তর মতো বোধিসত্ত্ব কখনও বউ-ছেলের সঙ্গে এরকম হ্যা হ্যা হি হি করতে পারল না।

ভাবনাটায় কি হুল ছিল কোনও? বুকটা একটু জ্বালা জ্বালা করে কেন বরেণ্য বিজ্ঞানী বোধিসত্ত্ব মজুমদারের?

বোধিসত্ত্বর উপস্থিতি টের পেয়েই হাস্যরোলের দফারফা। জুলি-মিলি মুখের হাসি হাসি ভাব বজায় রেখেই সামান্য আড়ষ্ট পায়ে ঘরে চলে গেল। দীপালি উঠে জায়গা ছেড়ে দিল ভাসুরকে।

অনুচ্চ স্বরে বলল—দাদা, একটু চা করি?

শান্তশীল শশব্যস্ত মুখে বলল—চা কেন, কফি করো। সঙ্গে একটু অমলেট ভেজে দাও।

—নাহ্, শুধু কফিই খাব। দুধ ছাড়া। বোধিসত্ত্ব বসে সিগারেট ধরাল। ভাইয়ের দিকেও বাড়িয়ে দিয়েছে প্যাকেট। হালকা গলায় বলল—তুই আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরেছিস যে?

—খুব তাড়াতাড়ি তো নয়। সাতটা বেজে গেছে।

দু-একটা কথার পর কাজের কথা পাড়ল বোধিসত্ত্ব—ক্যাম্পাস টাউনের বাংলোটা তো আমার তালা বন্ধই পড়ে আছে রে। এবার তো ভেকেট করার জন্য ইউনিভার্সিটি নোটিস পাঠাবে।

—হুম্। শান্তশীল অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ল— তুমি কি সত্যিই সব ফার্নিচার ডিসপোজ অফ করে দিতে চাও?

—তাই তো বলেছিলাম তোকে।...বিক্রিই করতে হবে এমন কথা নেই, বারাসতেও পৌঁছে দেওয়া যায়।

—বউদি কি নেবে?

—না নেওয়ায় কী আছে? সবই তো তার জিনিস। তার আনা, তার করা, তার বিয়েয় পাওয়া...

শান্তশীল একবার তাকিয়েই চোখ ঘুরিয়ে নিল। কী একটা বলতে গিয়েও বলল না। জোরে টান দিচ্ছে সিগারেটে।

বোধিসত্ত্বর বাকভঙ্গি কি বেশি রূঢ় হয়ে গেছে? দু-এক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে বোধিসত্ত্ব বলল— জিনিসগুলো সব এ বাড়িতে এনে রাখলে কেমন হয়?

—এখানে জায়গা কোথায়? সব ঘরই তো প্যাকড। খাট-টাট নয় খুলে রাখা গেল, বাকি মাল কোথায় ঢোকাব? তোমার ঘর দুটোতেও তো এক্সটা স্পেস নেই।

—তা হলে বেচেই দে। ট্রাকে করে তুলে আন, কোনও অকশন শপে দিয়ে দে, যা পাওয়া যাবে সেটা নয় বাবুয়ার নামে ফিক্সড ডিপোজিট করে দিবি।

—দেখি। বউদির সঙ্গে কথা বলি।

—তার সঙ্গে কথা বলার কী আছে? আমার ছেলের নামে আমি টাকা রাখব...?

—দেখছি।

—দেখছি নয়, ডু ইট কুইক। ...গাড়িটাও পড়ে আছে, এখানে এনে গ্যারাজ করে দে। আমি বাইরে যাওয়ার আগে ল্যাটা চুকে গেলে ভাল হয়।

দীপালি এসেছে। সুদৃশ্য কফিমগ কাচের টেবিলে সাবধানে নামিয়ে বসল সোফায়। নিষ্প্রাণ তথ্য পরিবেশনের ভঙ্গিতে বলল—জানেন দাদা, জুলির সঙ্গে পরশু বাবুয়ার দেখা হয়েছিল। কলেজ স্ট্রিটে। বাবুয়া নাকি এখন আরও অনেকগুলো টিউশ্যানি ধরেছে।

বোধিসত্ত্ব গোমড়া হয়ে গেল। বাবুয়াটার ফিউচার ঝরঝরে হয়ে যাচ্ছে। রাখী অ্যালাউ করছে কী করে? রাখী কি ছেলের বারোটা বাজিয়ে বাবার ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়? আশ্চর্য জেদ। কিছুতেই বোধিসত্ত্বর টাকা ছোঁবে না!

ভার গলায় বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস করল,—বাবুয়া আর একদিনও আসেনি, না?

দীপালি উত্তর দিল,—না।

বোধিসত্ত্ব গজগজ করে উঠল—এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি।

পরিবেশটা পুরো ছানা কেটে গেছে। কেউ আর মুখ খুলছে না, ক্ষণিক নৈঃশব্দ্যই থমথমে বাতাবরণ গড়ে তুলেছে।

বোধিসত্ত্বর খারাপ লাগল একটু। তার নিজের সমস্যা নিয়ে ভাইয়ের পরিবারের ওপর সে কি উৎপাত করছে? এত অল্পে সে মেজাজই বা হারাচ্ছে কেন?

আবহাওয়া লঘু করার জন্য বোধিসত্ত্ব বলল—যাক গে, ছাড়ো ও সব।...তোমরা কবে আসছ আমার ফ্ল্যাটে।

—যাব। শান্তশীল ঘাড় নাড়ল।

—আমি চলে যাওয়ার আগে একদিন আয়।

—দেখি। আমার তো এখন আবার ইয়ার এন্ডিং-এর চাপ শুরু হবে।

—তা হলে তুমি এক দিন এসো। বোধিসত্ত্ব দীপালির দিকে তাকাল—দয়িতা কেমন ঘরদোর সাজাল, একবার দেখে যাও। ও ছেলেমানুষ, তুমি ওকে একটু-আধটু সাজেশানও দিতে পারবে।

দীপালি হুঁ হ্যাঁ কিছুই বলল না।

বোধিসত্ত্ব ভুরু কোঁচকাল—কবে আসছ?

উত্তর নেই। দীপালি স্বামীর দিকে তাকাচ্ছে আড়ে আড়ে।

বোধিসত্ত্বর বিরক্তিটা ফিরে আসছিল। তার ফ্ল্যাটে পা দিতে কি আপত্তি আছে দীপালির? রাখীর সঙ্গে দীপালির এমন কিছু সখিত্ব তো ছিল না! হঠাৎ হঠাৎ এত দরদ উথলে ওঠে কেন? বোঝে না ওই নীরবতা হেয় করছে বোধিসত্ত্বকে?

শান্তশীল বুঝি অসন্তোষটা আঁচ করেছে। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ ঘোরাল—তা হলে লোকজন নিয়ে এই রোববারই ক্যাম্পাস টাউনে চলে যাই দাদা?

—যা ভাল বুঝিস। আমার হাতে সময় নেই, তাই তোকে বলা...। অবশ্য তোর যদি অসুবিধে থাকে আমিই নয় যা হোক একটা কিছু...

—না না। আমি যেতে পারব। তুমি শুধু চিঠিপত্রগুলো করে দিও।

বেরিয়ে এসে বোধিসত্ত্বর বিরক্তিটা আছড়ে পড়ল রাখীর ওপর। নিকটজনেরাও কি ভাবছে রাখীর ওপর সে অন্যায় করেছে? রাগের মাথায় সে কি বলেছে, না বলেছে, ওমনি দুম করে রাখী চলে যায়নি? তেজ দেখিয়ে? সামান্য ধৈর্য ধরলে একটা কোনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাধান কি হত না? দয়িতা তো তার বাংলোয় এসে ওঠার জন্য বায়না ধরেনি, টাউনেই ঘর নিতে চেয়েছিল! রাখী রাখীর জায়গায় থাকতে পারত, দয়িতা দয়িতার জায়গায়! বিশ্বসংসারের কাছে বোধিসত্ত্বকে অপদস্থ করে, ছেলের চোখে বাপকে নীচে নামিয়ে, কী প্রতিপন্ন করতে চায় রাখী? বোধিসত্ত্ব মজুমদার একজন চরিত্রহীন লম্পট? আর সে নিজে এক দুখিনী হতভাগিনী একাকিনী নারী? দীর্ঘ দু যুগ একত্রে নিস্তরঙ্গ বসবাসের পর এই কি প্রাপ্য ছিল বোধিসত্ত্বর? শুধু তার জন্য কত সম্মান পেয়ে এসেছে রাখী, বিনিময়ে তাকে শুধু অপমান দিল?

হায় রে মানুষের মন! নিজের ফাঁদে নিজেই যখন সে আটকে পড়ে, তখন স্বপক্ষে সাজানো যুক্তিজালের অসারত্ব কি সে টের পায়?

হৃদয়ের অতলে যে সামান্যতম দ্বিধাটুকু ছিল, তাও মুছে ফেলল বোধিসত্ত্ব। ক্রোধে গরগর করছে। সম্পর্কের ক্ষীণতম সুতোটুকুও সে আর টিকিয়ে রাখবে না।

উকিলের বাড়ি ঘুরে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বোধিসত্ত্ব ফ্ল্যাটে ফিরল। তাকে দেখেই পাখির মতো নেচে উঠেছে দয়িতা,—এই শোনো, কাল কিন্তু হাজার দুয়েক টাকা লাগবে।

বোধিসত্ত্বর চিত্ত এখন অনেক শান্ত হয়েছে, তবু যেন ঝাঁকুনি খেল সামান্য। নার্ভাস গলায় জিজ্ঞেস করল,—কেন?

—গোটা পঁচিশ টব কিনব। গাছ সমেত। এরিকাপাম অ্যাডেনিয়াম, ক্রোটন, অ্যারেলিয়া...

—দাঁড়াও দাঁড়াও। এত গাছে কী হবে?

লতার মতো বোধিসত্ত্বর গলা আঁকড়ে ধরল দয়িতা,—বা রে, গাছ ছাড়া ফ্ল্যাটটা ন্যাড়া ন্যাড়া লাগছে না? গ্রিন না থাকলে কি ঘরের বিউটি খোলে?

—বুঝলাম। কিন্তু কালই কেন? এক দু মাস যাক। আমি বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

—উমম, কালই চাই।

বোধিসত্ত্ব নীরস গলায় বলল,—তোমার এই ফ্ল্যাট সাজানোয় এখনও পর্যন্ত কত খরচা হয়েছে হিসেব করেছ?

—কত আর! পঞ্চাশ ষাট হাজার।

—আজ্ঞে না। দয়িতার মৃণালভুজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিল বোধিসত্ত্ব,—লাখ পেরিয়ে গেছে। আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স প্রায় শেষ। এবার একটু রয়ে সয়ে... বুঝলে?

পলকে দয়িতার উচ্ছ্বাসভরা মুখ একটু বুঝি ম্লান। বড় শ্বাস ফেলে বলল,—বেশ, তাই হবে।

—ওমনি মুখ ভার হয়ে গেল? বোধিসত্ত্ব আলগা থুতনি নেড়ে দিল দয়িতার,—বুড়ো হচ্ছি, একটু সঞ্চয় তো থাকা দরকার। কী বলো?

দয়িতা চোখ পাকাল,—অ্যাই, নিজেকে বুড়ো বুড়ো বলবে না।

—তবু...বয়স বাড়ছে, এটা তো মানবে?

—সেটা বলতে পারো। দয়িতা আবার স্বচ্ছন্দ,—যাও যাও, হাতমুখ ধুয়ে জামাকাপড় বদলে নাও। গরম গরম খানা হাজির হয়ে যাবে।

বোধিসত্ত্ব বাথরুমের দিকে এগোল না। মুখে আলগা গাম্ভীর্যের মুখোশ এঁটে বলল,—তোমায় এক্ষুনি আমি একটা দারুণ খবর দিতে পারি।

—কী গো?

—ডিভোর্সের পেপারে সই করে এলাম। কালই বারাসতে উকিলের নোটিস চলে যাবে।

দয়িতার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল বটে, কিন্তু যতটা উচ্ছ্বাস আশা করেছিল বোধিসত্ত্ব ততটা যেন ঠিক ফুটল না।

হাসি হাসি মুখ, কিন্তু কেজো স্বরে প্রশ্ন করল,—তাই? কদ্দিন লাগবে ডিক্রি পেতে?

—ওদিক থেকে কনটেস্ট না করলে বেশিদিন লাগার কথা নয়। অবশ্য আমাদের হিন্দু ম্যারেজ ছিল তো, একবারে ডিভোর্স হয়তো হবে না।

—তা হলে?

—প্রথমে জুডিশিয়াল সেপারেশান থাকবে, তার পর ডিভোর্স। কদ্দিন পরে যেন। জলদি জলদি চাইলে ব্যাপারটা খুব হেলদি হবে না।

—বুঝলাম না।

—আমি তো রাখীর এগেনস্টে কোনও জোরালো গ্রাউন্ড আনতে পারছি না। তেমন হলে আমাকেই রাখীর কাছে হয়তো প্রস্তাব পাঠাতে হবে, যেন ও আমার এগেনস্টে অ্যাডাল্টারির চার্জ আনে। কেসটায় তখন তুমিও ফালতু জড়িয়ে যাবে।

দয়িতা কী বুঝল কে জানে, আর কোনও প্রশ্ন করল না। চুপচাপ রান্নাঘরে চলে গেছে।

খাওয়া দাওয়ার পর শুতে যাওয়ার আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছিল, তখন আবার নিজে থেকেই তুলল কথাটা,—আমি কিন্তু একটু তাড়াতাড়িই ফয়সালা চেয়েছিলাম।

বোধিসত্ত্ব সামান্য চিন্তিত ছিল শব্দগুলো এখন আর ঠিকঠিক মাথায় ঢুকল না। বলল,—কীসের ফয়সালা?

—তোমার ডিভোর্সের।

—বা রে, বললাম না, তোমাকে আমি জড়াতে চাই না?

দয়িতা মুচকি হাসল,—কিন্তু আমরা যেভাবে রয়েছি, এটাকেও তো অ্যাডাল্টারিই বলে। নয় কি?

বোধিসত্ত্ব থমকাল একটু। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল,—তো?

—আমি বুঝতে চাইছি, তোমার কীসে অসুবিধে হচ্ছে? আমাকে জড়ানোয়? নাকি নিজেকে ব্যাভিচারী হিসেবে কোর্টে দাঁড় করানোয়? আমাদের সম্পর্কে যদি কোনও পাপ না থাকে, তা হলে তো সঙ্কোচেরও কোনও অর্থ হয় না। কী, ঠিক বলছি?

বোধিসত্ত্ব গুম হয়ে গেল। কথাটা কোথায় যেন ঘা মারছে! অহংবোধে? তা কী করে হয়? দয়িতাকে নিয়ে সে তো একটি বারের জন্যও সঙ্কুচিত হয়ে থাকেনি? ইউনিভার্সিটির উপাচার্য যখন তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, তার নামে আসা উড়ো কমপ্লেনটা দেখাল, তখনও তো সে তার অবস্থান থেকে নড়েনি এতটুকু? লোকটা তার হাত ধরে অনুরোধ করেছিল, প্রফেসার মজুমদার, আপনি শুধু একবার লিখে দিন, দয়িতা মিত্র মেয়েটা আপনার রিলেটিভ, আপনি তাকে পড়াশুনোর সুবিধের জন্য বাড়িতে এনে রেখেছেন, ব্যস তা হলেই এই কমপ্লেন আমি নোংরা কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেব!...বোধিসত্ত্ব মুখের ওপর বলে দিয়েছিল, আমি মিথ্যে বলতে পারব না। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দয়িতাকে ভালবাসি, আমরা স্বামী-স্ত্রীর মতো জীবনযাপন করছি, এটাই সত্যি। আপনাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলতে চাই না, হিয়ার আই টেন্ডার মাই রেজিগনেশন।

কিন্তু এও তো সত্যি, নিজেকে ব্যাভিচারী ভাবতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে সে! দয়িতা কী করে তাকে এত স্পষ্টভাবে পড়ে ফেলল?

রাতটা খুব মধুর কাটল না। একটু একটু যেন শৈত্য অনুভব করছিল বোধিসত্ত্ব। স্বাভাবিক ছন্দে শরীরের খেলায় আহ্বান করল দয়িতা, ঠিক ঠিক সাড়া দিতে পারল না আজ।

দয়িতা ঘুমিয়ে পড়ার পর বোধিসত্ত্ব পায়ে পায়ে পাশের ঘরে এল। তার স্টাডিরুম ভারী সুচারুভাবে সাজিয়ে রেখেছে দয়িতা। চেয়ারে গিয়ে বসল বোধিসত্ত্ব। একটা সিগারেট ধরাল, তারপর আর একটা, তারপর আর একটা...। কখন যেন টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়েছে। ডুবে গেছে বইতে। কাগজ টানল। অঙ্ক কষছে।

ধীরে ধীরে শরীরি জগৎ ছেড়ে অনন্ত মহাশূন্যে পাড়ি দিল বোধিসত্ত্ব। তার মানসলোকে এখন আর কোনও দয়িতা কিংবা রাখী নেই, সেখানে শুধু শ্বেতবামন আর কৃষ্ণগহ্বর।

সতেরো

বাবুয়া এক মনে কোয়েশ্চেন পেপার দেখছিল। বুলটু রিন্‌টির। কাল রিন্‌টির অ্যানুয়াল পরীক্ষা শেষ হয়েছে, বুলটুর আজ। দুজনেরই শেষ পরীক্ষা ছিল অঙ্ক, প্রশ্নপত্রের ধারে ধারে উত্তরগুলো লিখে এনেছে ভাই বোন, মনে মনে মেলাচ্ছিল বাবুয়া।

মীরা প্লেটে ওমলেট আর মিষ্টি সাজিয়ে এনে রাখল বিছানায়। বাবুয়ার সামনে। খাটের ধারে চেয়ার টেনে বসেছে, বাবুয়া, বিছানায় ভাই বোন বই খাতা। প্রথম প্রথম এভাবে পড়াতে বাবুয়ার খুব অস্বস্তি হত, এখন অভ্যেস হয়ে গেছে।

মীরা প্লেট রেখে অন্য দিনের মতো চলে যায়নি, বিছানার কোণে বসল। মৃদু উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল,—কী বুঝছেন মাস্টারমশাই? কেমন করেছে দুজনে?

বাবুয়া প্রশ্নপত্র ভাঁজ করল,—মোটামুটি।

—অঙ্কে কেমন পাবে মনে হয়?

—রিন্‌টি যা উত্তর লিখে এনেছে তাতে তো সত্তর বাহাত্তর রাইট হওয়া উচিত। বুলটু সাতষট্টি। বলেই ঈষৎ জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকা ভাই বোনের দিকে তাকাল বাবুয়া,—আমি কিন্তু তোমাদের কাছ থেকে আর একটু বেটার এক্সপেক্ট করেছিলাম।

বুলটু এক ঝলক মাকে দেখে নিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। রিন্‌টি নখ খুঁটছে।

মীরা ছোট্ট শ্বাস ফেলল,—আপনি আর কী করবেন মাস্টারমশাই? আপনি তো আপনার সাধ্যমতো করেছেন।

—হ্যাঁ। বাবুয়া অপ্রসন্ন মুখে ঘাড় নাড়ল,—ঘোড়াকে আমি ঝর্নার ধার অব্দি নিয়ে যেতে পারি। ঘোড়া জল খাবে কি না সে ঘোড়াই বুঝবে।

—আপনার ঘোড়া দুটো যদি একটু বুঝদার হত। মীরা ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে ছেলেমেয়ের দিকে তাকাল,—কতদিন ধরে বলছি আপনাকে, ধরে মারুন।

বাবুয়া যে কখনও বুলটু রিন্‌টির গায়ে হাত তুলবে না, মীরা ভালমতোই জানে। তবু

প্রায়শই বলে কথাটা। ভেতরের দুঃখ থেকে বলে কি? কিংবা কোনও গভীর হতাশায়? তিল তিল শ্রমের ফসল বৃথা হয়ে গেলে মনে যে কী তীব্র নৈরাশ্যের জন্ম হয় তা তো এখন মাকে দেখে বুঝতে পারে বাবুয়া। এই মহিলার সঙ্গে মার যেন কোথায় মিল আছে। আবার নেইও। মীরা অনেক শক্তপোক্ত। মীরার চরিত্রে যে ঋজু ব্যক্তিত্ব আছে, মার মধ্যে তা কোথায়? ওই প্রবঞ্চকটার কথা ভেবে এখনও লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে মা! ছিঃ!

ভাবনাটাকে আর অন্য খাতে ঘুরতে দিল না বাবুয়া। চামচে ওমলেট কাটতে কাটতে বলল,—আমি তা হলে এখন মাসখানেক কিন্তু আসছি না।

—আপনার কবে থেকে যেন পরীক্ষা শুরু?

—এপ্রিলের নাইনথ। চলবে ছাব্বিশ তারিখ পর্যন্ত।

—ও। মাঝে এক দিনও আসবেন না? ওদের রেজাল্ট বেরোবে...

—সে নয় একদিন এসে দেখে যাব।

—প্লিজ, আসবেন কিন্তু। ওদের রেজাল্ট বেরোবে এপ্রিলের চোদ্দোয়। তারপর কিন্তু প্রতিদিনই আপনাকে আশা করব।...বসুন, জল ফুটে গেছে, চা-টা করে আনি।

এ অভ্যেসটাও ধরে গেছে বাবুয়ার, সে এখন নিয়মিত চা পান করে। বাড়িতেও দুধ খেতে এত ভালবাসত, এখন আর ছোঁয় না, মামা মামির শত উপরোধ সত্ত্বেও না। কত পুরনো অভ্যেসই তো বদলে গেল। সে আজকাল আর বই কেনে না, পছন্দসই ক্যাসেট কেনা ছেড়ে দিয়েছে, চুপচাপ শুয়ে গান শোনার বিলাসিতা পরিত্যাগ করেছে...। তাকে এখন ক্রমশ সাধারণ থেকে আরও সাধারণ হতে হবে, কেজো হতে হবে। শখশৌখিনতার জীবন তার জন্য নয়, সামনে এখন দীর্ঘ কৃচ্ছ্রসাধনার দিন।

মীরা রান্নাঘরে। বুলটু উশখুশ করছে,—স্যার, একটু রাজুদের ঘর থেকে ঘুরে আসব?

—বসে আছ কেন? যাও না। বাবুয়া হেসে ফেলল। ঘড়ি দেখতে দেখতে বলল,—আমিও এবার উঠব।

বুলটু রিন্‌টি পলকে উধাও। মীরাও চা নিয়ে হাজির। ছেলেমেয়ের দৌড়ে পালানোর দৃশ্য দেখে সেও হাসছে মিটিমিটি। কাপ ডিশ বাবুয়ার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল,—ও হো, আপনাকে তো একটা কথা বলাই হয়নি। আপনার বন্ধু তমালবাবু আপনাকে খুঁজছিলেন। আজ এখানে এলে আপনাকে একটু থাকতে বলেছেন। সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই উনি এসে যাবেন।

বাবুয়া আর একবার ঘড়ি দেখল। পাঁচটা দশ। পাঁচটা বাহান্নর ট্রেনটা না পেলে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাবে, মা আবার উতলা হয়ে পড়বে। আজকাল এই এক নতুন সমস্যা হয়েছে মাকে নিয়ে। যে সময় বলে যাবে বাবুয়া তার থেকে পাঁচ মিনিট এদিক ওদিক হলেই ছটফট শুরু করে দেয়। একবার ছাদে উঠবে, একবার রাস্তায় বেরিয়ে আসবে...। নিরাপত্তাবোধের অভাব?

চিন্তিত মুখে বাবুয়া জিজ্ঞেস করল,—কী দরকার কিছু বলেছে?

—না তো। শুধু বললেন আপনি যেন...

নতুন টিউশনির খোঁজ দেবে কি? পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর টিউশনির সংখ্যা বাড়াবে না বাবুয়া, তমাল তা জানে। উফ্, তমালকে নিয়ে পেরে ওঠা মুশকিল। তমালের বীরপুজোর চাপে বাবুয়ার প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মীরা আবার বিছানায় বসল। দেখছে বাবুয়াকে। হঠাৎ বলল,—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব মাস্টারমশাই? অনেকদিন ধরেই বলব বলব ভাবি...

—কী কথা?

—আপনি সব সময়ে এত গম্ভীর কেন? আপনার বয়সী ছেলেরা কত হাসিখুশি থাকে, চনমন করে...

বাবুয়া অস্বস্তিতে পড়ে গেল। জোর করে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করল মুখে,—না মানে...তেমন কোনও কারণ নেই।

—আপনার বয়সী ছেলেদের সব সময়ে গোমড়া দেখলে আমার কেমন ভয় ভয় করে।

—কেন? কীসের ভয়?

মীরা একটুক্ষণ চুপ। তারপর বলল,—আমার একটা ভাই ছিল। আমার থেকে বছর ছয়েকের ছোট। কলেজে ঢোকার পর থেকে কী হল, সারাক্ষণই মুখ থমথম। বাপের বাড়ির লোক বলতে ওই ভাই-ই একমাত্র আসত আমার কাছে। সাতটা কথা বললে একটার উত্তর দিত, নইলে চুপচাপ বসে আছে...। হঠাৎ একদিন শুনি স্লিপিং পিল খেয়ে...। মীরার গলা ধরে এল। আঁচলের খুঁটে চোখ মুছছে। একটু সামলে নিয়ে বলল,—ডাক্তার বলেছিল মানসিক অবসাদ থেকেই...। পরে জানা গেল কোন এক মেয়ের সঙ্গে নাকি ওর...

—না না, আমার সেরকম কিছু নেই। বাবুয়া তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

—তাও ভাল। মীরা ছোট্ট শ্বাস ফেলল,—আপনাকে দেখলে আমার খুব ভাইটার কথা খুব মনে পড়ে। লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিল আমার ভাই। আপনারই মতো।

মীরার ঘন কালো চোখের মণির দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে মাথা নামিয়ে নিল বাবুয়া। এ সময়ে কী যে বলা উচিত ভেবে পাচ্ছে না। নিঃশব্দে চা শেষ করে কাপ ডিশ নামিয়ে দিল খাটের নীচে।

নিজের মনেই মীরা বলে উঠল,—কেন যে ওসব পুরনো কথা মনে পড়ে! স্মৃতি মানেই দুঃখ।...মাঝখান থেকে আপনার মনটাও খারাপ করে দিলাম।

—না না, তাতে কী আছে! ইচ্ছে করলেই কি সব ভুলে থাকা যায়!

—হুম্!...যাক গে, আপনার কথা বলুন। আপনি কি এখনও বারাসতেই আছেন?

—হ্যাঁ।

মীরা বুঝি সামান্য লঘু হওয়ার চেষ্টা করল,—মামারবাড়ি থাকলে তো সবাই হাসিখুশি থাকে, আপনি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন কেন? শরীর খারাপ?

—কই, নাহ।...আমি তো ঠিকই আছি।

—বাবা-মার খবর কি? তাঁরা তো সেই বাইরেই আছেন?

বাবুয়ার মুখ থেকে ফস করে বেরিয়ে গেল,—না, মা এখন এখানেই আছে। মামার বাড়িতে।

—ওমা, বলেননি তো! কবে এসেছেন?

—অনেকদিন। বাবুয়ার মুখে মিথ্যে এল না,—সেই জানুয়ারিতে।

—তার মানে আপনার বাবা ওখানে এখন একা? বাবার অসুবিধে হচ্ছে না?

হুঁহ, অসুবিধে! অজান্তেই বাবুয়ার শরীর শক্ত হয়ে গেল। বাবা একা না দোকা সেই

কলঙ্কের কথা কি লোকসমক্ষে উচ্চারণ করা যায়? কোন মুখে বলে, বাবা এখন আর ওখানে নেই, এই শহরেই মাত্র কয়েক মাইল দূরে অন্য একটা মেয়েকে নিয়ে ঘর বেঁধেছে তার পূজ্যপাদ পিতৃদেব? সল্টলেকে বোধিসত্ত্ব মজুমদারের চলে আসার খবরটা ছোট করে বেরিয়েছিল কাগজে, ভাগ্যিস সেই বোধিসত্ত্বই যে বাবুয়ার বাবা জানে না মীরা! সব কাহিনী শুনলে কী মীরা শিউরে উঠবে? নাকি মনে মনে হাসবে আর ভাববে পুরুষমানুষরা সব একরকমই হয়? সে কী বা নামী বিজ্ঞানী, অথবা মাতাল লম্পট বদচরিত্র স্বামী! সত্যি বলতে কি, দুজনে তফাৎই বা কোথায়? যে মানুষ বাইশ তেইশ বছর ঘর করা স্ত্রীকে অবলীলায় ডিভোর্সের নোটিস পাঠাতে পারে, সে কোন নিরিখে উচ্চ স্তরের?

বাবা এখন এমনিও দেশে নেই, কথাটা বলে দিলেই ল্যাটা চুকে যায়, সত্যেরও অপলাপ হয় না...। উঁহু, তার থেকেও প্রশ্ন আসতে পারে, কোথায় গেছে, কেন গেছে...!

বাবুয়ার ক্ষণিক নীরবতা নজরে পড়েছে মীরার। নিজের মনোমত কিছু একটা আন্দাজ করে নিল, আর বাবা নিয়ে কোনও প্রশ্ন করল না। আলগা জিজ্ঞেস করল,—আপনার ফিউচার নিয়ে কী ভাবছেন মাস্টারমশাই? বাবার মতোই অধ্যাপক হবেন?

—না না, আমি ও লাইনে যাবই না।

—তবে কি কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় বসবেন? বি সি এস? আই এ এস?

—নাহ্। পার্ট ওয়ানটা দিয়েই চাকরির চেষ্টা করব।

—সে কি! পার্ট টু দেবেন না?

—ইচ্ছে নেই। গ্র্যাজুয়েট তো হয়েই যাচ্ছি, এবার একটা চাকরি জুটিয়ে নেব।

—ওমা কেন? আপনার এক্ষুনি চাকরির কী দরকার? আপনি লেখাপড়ায় এত ব্রিলিয়ান্ট, সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, বাড়ির অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল...

হায় রে, জীবন যে কখন কাকে কোন অনিশ্চিতের দিকে ঠেলে দেয়! এই মীরাই কি জানত বড়ঘরের মেয়ে হয়েও তাকে একদিন নার্সের চাকরি করে এমন একটা এঁদো বাড়িতে জীবন কাটাতে হবে?

বাবুয়া একটু বেপরোয়ার মতোই বলল,—এমনিই। পড়াশুনো করতে আমার আর ভাল লাগে না।

—সেটা অবশ্য আপনার ব্যাপার। তীক্ষ্ণ চোখে বাবুয়াকে দেখতে দেখতে মীরা বলল,—পারলে পড়াশুনোটা চালাবেন মাস্টারমশাই। নিজে সুযোগ পেয়েও লেখাপড়াটা শেষ করতে পারিনি তো, এখন মাঝে মাঝে বড় আফশোস হয়। আর তাই তো ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে পড়েছি। দরকার হয়, খেটে মুখের রক্ত তুলব, তবু ওদের পড়াশুনো আমি চালাবই। বিশ্বসংসারকে আমারও কিছু দেখানোর আছে, কিছু প্রমাণ করার আছে...

মীরার মুখচোখ কী রকম যেন হয়ে গেছে! চোয়াল শক্ত, দপদপ করছে চোখের মণি, শ্যামলা মুখে স্থির হয়ে আছে আগুন। দুঃখকষ্টের মাঝেও যে কত তাপ লুকিয়ে থাকে, এই মহিলাকে দেখে তা বুঝি আন্দাজ করা যায়।

তমাল এসে গেছে, হাঁকাহাঁকি করছে। ঘরে উঁকি দিয়ে বত্রিশ পাটি দাঁত বার করল। বাবুয়া সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ল, বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়।

চৈত্র চলছে। বেলা পড়ে এল, তবু এখনও বেশ তাত চারদিকে। তালবেতাল হাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠছে মাঝে মাঝে। শুকনো শুকনো। গলির মধ্যে উড়ছে পাতা, কাঠিকুটি। ঘুরে ঘুরে।

তমালের মুখে খই ফুটছে,—বস্, তুমি হঠাৎ লাপাতা হয়ে গেলে কেন? আমার কেসটা নিয়ে একটু ভাবো।

—কেন? কী হল তোর?

—তুমি কি চাও আমি পরীক্ষায় হড়কে যাই? শালা, বাপ কী বলে দিয়েছে জানো, পরীক্ষায় ফেল করলে পাছায় লাথি মেরে বের করে দেবে।

—তো আমি কী করব?

—পাশের নোটগুলো দিবি না? হিস্ট্রি পল সায়েন্সের ওই থানইটগুলো পড়ব আমি?

—তাই তো নিয়ম।

—পারব না বস। একটা সাজেশান বানিয়ে দাও। তমাল ঠোঁটে সিগারেট লাগাল,—পার পেপার আটটা কোয়েশ্চেন। পুরো মুখস্থ করে যাব, হলে বমি করে দিয়ে চলে আসব।

—হুম্। দেখছি।

—যদি বলিস তো তোর বাড়ি চলে আসতে পারি। বারাসতেই আছিস তো? অ্যাড্রেসটা দিয়ে দে...

—থাক। বাবুয়া মনে মনে একটু শঙ্কিত হল। তমাল গিয়ে কী দেখবে, কী জানবে, কী বুঝবে, কী রটাবে...! এক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে বলল,—আমি পরশুদিন, মানে সোমবার কলেজে আসছি। শুনছি অ্যাডমিট কার্ড এসে যাবে...। তুইও ওই দিনই কলেজে আয়।

গলি ছেড়ে বড় রাস্তায় এসেছে দুই বন্ধু। অফিস ছুটি হয়ে গেছে, গৃহাভিমুখী মানুষ উদভ্রান্তের মতো ছুটছে শেয়ালদার দিকে। সামান্য অমনোযোগী হলেই দুমদাম ধাক্কা লেগে যায়।

ভিড় আর কোলাহলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা অদ্ভুত গন্ধ পাচ্ছিল বাবুয়া। শ্রমের। ঘামের। ফুটপাথ জুড়ে হকাররা চৈত্রসেলের পসরা সাজিয়ে বসেছে, তাদের জিনিসপত্রের। এই মিশ্র গন্ধে এতটুকু মিষ্টত্ব নেই, তবু যেন গন্ধটা বড় টানে বাবুয়াকে। কেন যে টানে? কাঁধে দায়িত্বের জোয়াল টানার সময় হয়ে এল বলেই কি?

তমাল একটু থেমেছিল। আবার বকবক শুরু করেছে, —তোর টিউশনি চলছে কেমন?

—মন্দ কী! ভালই তো। পরীক্ষা টরিক্ষা সব হয়ে গেল...

—এখন কটা দিন মার্কেট একটু ডাউন যাবে। জুন মাসটা পড়তে দে, তোকে আমি তখন টিউশনিতে ফ্লাড করে দেব।

—বলছিস?

—বলছি মানে? ওয়াদা। চলন্ত তমাল বাবুয়ার দিকে ফিরল,—এই, মীরা কাকিমার সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল রে?

—তেমন কিছু না। এমনিই। টুকটাক।

—মীরা কাকিমা তোর খুব নাম করে। বলেই চোখ টিপল তমাল,—খুব খাওয়ায়, না?

—ওই চা বিস্কুট...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ঢপ মেরো না গুরু। তোমার প্লেটে আজ ওমলেটের কুচি পড়ে ছিল, ম্যায় আপনি আঁখো সে দেখা।

বাবুয়া হেসে ফেলল,—তোর তো শকুনের চোখ রে। তোকে বুঝি টিউশনি বাড়িতে কিছু খেতে দেয় না?

—তমাল হালদারকে না খেতে দিয়ে উপায় আছে? তমাল খ্যাক খ্যাক হাসল,—একটা বাড়িতে চা পর্যন্ত ঠেকাত না, তাদের কী ভাবে টাইট দিয়েছিলাম জানিস? ছেলেকে পড়াতে পড়াতে ঝ্যাট করে মাকে ডেকে পাঠালাম। বললাম, আপনার ছেলেকে একটু দেখুন তো, আমি সামনের দোকান থেকে কচুরি সিঙাড়া খেয়ে আসছি! কলেজ থেকে ফিরছি তো, পেটে ছুঁচো ডন মারছে! ব্যস, ওমনি মা-টার ঘাড় ঝুলে গেল! এখন রোজ আমার জন্য একটা করে টিফিনকেক এনে রাখে।

বাবুয়ার পেট গুলিয়ে হাসি উঠে আসছিল। বলল,—তোর ওভাবে বলতে লজ্জা করল না?

—কীসের লজ্জা? পেটের ধান্দাতেই তো যাচ্ছি, না কী? বলতে বলতে একটা মোটাসোটা লোকের সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লেগে যাচ্ছিল তমালের, রক্তচক্ষে তার দিকে একবার তাকিয়ে নিল তমাল। পরক্ষণে হাসিমুখে বলল,—বুঝলে বস, মানো আর না মানো, মানুষের যত ফাইট সব এই পেটের তিন ইঞ্চি জায়গার জন্যে। এটি স্যাটিসফায়েড না থাকলে শরীরের আর বাকি সব অঙ্গ ফালতু হয়ে যায়।

বাবুয়া মাথা দোলাতে বাধ্য হল। মাঝে মাঝে বেশ দারুণ দারুণ উক্তি ঝাড়ে তমাল। পেটের চিন্তা আছে বলেই না বাবুয়াকেও ভবিষ্যৎটা বদলে ফেলতে হচ্ছে।

শেয়ালদা স্টেশন এসে গেছে। তমাল আরও একটুক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ছটফট করছিল, বাবুয়া দাঁড়াল না। প্ল্যাটফর্মে থিকথিকে ভিড়, ট্রেন নেই। উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরছে বাবুয়া, ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে। ক্লোজ সার্কিট টিভিতে ফুটবল খেলা চলছে, এক ঝলক সেদিকে দৃষ্টি রেখেও চোখ সরিয়ে নিল। একটা বনগাঁ লোকাল ঢুকতেই কাতারে কাতারে লোক দৌড়চ্ছে সেদিকে। বাবুয়া ভিড়ের অনুবর্তী হতে চায় না, অন্যকে ঠেলেঠুলে নিজের জায়গা করে নেওয়াতেও তার ঘোর আপত্তি, তবু দৌড়ল সেও। ঘোর লাগা মানুষের মতো। এই ভিড় স্টেশনে ঢুকলেই সুস্থ চিন্তাগুলো কেন যে এমন তালগোল পাকিয়ে যায়!

যাত্রী পেটে পুরেই ট্রেনের যাত্রা শুরু। বাবুয়া প্যাসেজে, কষ্টেসৃষ্টে দাঁড়িয়ে। এই গাদাগাদিতে, তাসপার্টিরা খেলায় মেতে গেছে, চিৎকার করে অফিসের গল্প করছে কেউ কেউ, কেউ বা চোখ বুজেছে। হকাররা ব্যবসা সারায় ব্যস্ত।

বাবুয়া নিজের মধ্যে ডুবে ছিল। মীরার মুখখানা দুলে উঠল চোখের সামনে। কী দৃঢ় স্বরে কথাগুলো বলছিল মহিলা! কিছু কি আঁচ করেছে বাবুয়ার সম্পর্কে? লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়ার কথা বলে বাবুয়া কী মীরার চোখে ছোট হয়ে গেল। তুৎ, অত কথা না বলে আগেই বেরিয়ে এলে ভাল হত। ওই তমালটার জন্য...! না, তমালের ওপর চটে লাভ নেই, ও অনেক টিউশনি দেবে। চাকরি তো আর হাতের মোয়া নয়, যে চাইলেই কেউ টুপ করে পেয়ে যাবে, হয়তো ক'মাস ওই টিউশনিই...। কী চাকরি জুটতে পারে বাবুয়ার? কাকাকে বললে ছোটমোটো কিছু হয়তো জোগাড় হয়ে যায়, কিন্তু ...। উঁহু, কাকাকে নয়। কাকা বোধিসত্ত্ব মজুমদারেরই ভাই। কাকাও মাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপমান করেনি। ক্যাম্পাস টাউনের ফার্নিচার বেচার টাকা দিতে চায়? ইনিয়ে বিনিয়ে কী ডায়ালগ? বউদি এ তো তোমারই প্রাপ্য! দাদা একটা ভুল করেছে বলে তুমি কেন তোমার হক ছাড়বে! বাড়ি থেকে মা আউট হয়ে গেল, তার কিছু করতে পারল না, হক দেখায়! সব তোলা থাকছে, বাবুয়া একদিন দেখে নেবে। গোটা মজুমদার ফ্যামিলিকে এমন শিক্ষা দেবে...। একটা সেলস্‌ম্যানের চাকরির চেষ্টা করলে কেমন হয়? লোকের দরজায় দরজায় ঘুরে জিনিস ফেরি করবে? সাবান পারফিউম কসমেটিক্স...? কাকা কাকিমাদের কোনও ছলে কথাটা শুনিয়ে দিলে বোধিসত্ত্ব মজুমদারের কানে কি পৌঁছবে না? সে কেন শুধু বিজ্ঞানীর ছেলে হবে, বোধিসত্ত্ব মজুমদারও ফেরিওয়ালার বাপ হোক। কথা সে কম বলে বটে, কিন্তু খারাপ বলে না। যুক্তিও সে ভালই সাজাতে পারে। ইংরিজিও তার মুখে মন্দ আসে না। তা হলে সেলস্‌ লাইনেই বা কেন উন্নতি করতে পারবে না বাবুয়া? তারপর যদি কিছু পয়সাকড়ি জমাতে পারে, তো স্বাধীন ভাবে কোনও একটা ব্যবসা...।

বাবুয়াকে পারতেই হবে। মীরার কথাগুলো আবার কানে আছড়ে পড়ল বাবুয়ার। বিশ্বসংসারকে বাবুয়া দেখিয়ে দেবে, বোধিসত্ত্ব মজুমদারের ছেলে হয়ে না থেকেও সে অন্ধকারে হারিয়ে যায়নি। সে প্রমাণ করে দেবে, শুদ্ধসত্ত্ব মজুমদারের মধ্যেও কিছু মালমশলা আছে। একেবারে নিজস্ব।

ট্রেন বারাসত পৌঁছল প্রায় সাতটায়। স্টেশন থেকে মামার বাড়ি বেশ খানিকটা পথ, ইদানীং রিকশা নেয় না বাবুয়া, রাস্তাটুকু হেঁটে মেরে দেয়। এক পয়সা বাঁচানোও তো এক পয়সা রোজগার।

উত্তেজনায় টগবগ করতে করতে বাড়ি এল বাবুয়া। ঢুকেই হ্যাঁ। একতলার বৈঠকখানা ঘরে কার সঙ্গে কথা বলছে মা? সৌমিক নামের ছেলেটা না?

বাবুয়াকে দেখেই সৌমিক উচ্ছ্বসিত। যেন কতদিনের চেনা এমন ভঙ্গিতে বলে উঠল,—এতক্ষণে ফিরলে? সেই কখন থেকে তোমার জন্য বসে আছি।

বাবুয়া আরও হকচকিয়ে গেল। মাত্র দু'দিনের আলাপ, তাও প্রায় রাস্তাঘাটেই বলা যায়...সোজা বাড়ি চলে এল? একটু গায়ে পড়া ধরনের আছে বটে সৌমিক, ট্রেনে খুব বোর করেছিল...। হঠাৎ তিন মাস পরে উদয়ই বা হল কোত্থেকে?

বাড়িতে আসা অতিথির সঙ্গে কাঠ কাঠ ব্যবহার করাটা অভদ্রতা। বাবুয়া হালকা হেসে বলল,—হ্যাঁ, একটু দেরি হয়ে গেল। আপনি হঠাৎ?

—আমার তো পাশেই একটা ঠেক রয়েছে। লালজিবাবার আশ্রম। দুপুরে ছুটির পর এসেছিলাম, ভাবলাম তোমার সঙ্গে দেখা করে যাই।...

যুক্তিটা কেন যেন বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না বাবুয়ার। লালজিবাবার আশ্রমে নিয়মিত আসে সৌমিক? কই, দেখে তো মনে হয় না!

সংশয়টা গোপন রেখেই বলল,—মা, তুমি সৌমিকবাবুকে চা-টা দিয়েছ?

—হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ। রাখী স্মিত মুখে বলল,—তোর বন্ধুর কোনও অযত্ন করিনি।...তবে ও তেমন কিছু তো খেলও না। কতবার করে বললাম, অফিস থেকে আসছ, একটু লুচিতরকারি করে দিই, তা এই ছেলের সবেতেই না না।

—মিষ্টি তো খেলাম মাসিমা! সৌমিক বাবুয়ার দিকে ফিরল,—তোমার পার্ট ওয়ানের প্রিপারেশন কদ্দূর?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—চলছে। আপনার অফিস?

—গয়ং গচ্ছ। অফিস একটি অত্যন্ত ডাল মনোটোনাস ব্যাপার, নাথিং টু টক অ্যাবাউট। সৌমিক কবজি উলটোল,—আজ তা হলে আসি মাসিমা।

—সে কী! বন্ধু এল, একটু গল্পগুজব করো...

—আজ আর হল না। এক্ষুনি বেরোলেও বাড়ি ফিরতে ফিরতে নটা বেজে যাবে। বলেই আবার বাবুয়ার দিকে ফিরেছে সৌমিক,—তুমি আমায় এগিয়ে দেবে না? চলো, একটু হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি।

খুবই স্বাভাবিক স্বর, তবু কথাটা কানে বাজল বাবুয়ার। কয়েক সেকেন্ড স্থির চোখে দেখল সৌমিককে। তারপর বলল,—চলুন।

সামনে রাস্তার আলোটা জ্বলছে না, গেটের বাইরেটা অন্ধকার। হুশ হুশ গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, ধাঁধিয়ে যাচ্ছে চোখ। গাড়ি মিলিয়ে গেলেই অন্ধকার গাঢ়তর।

দু-চার পা নীরবে হেঁটে সৌমিক বলল,—তুমি শুনলাম আজকাল খুব টিউশনি করছ?

—হুঁ। কেন বলুন তো?

—তোমার মা বলছিলেন, ছেলেটার খুব খাটুনি যায়, বই নিয়ে বসলেই ঢুলতে শুরু করে...

—তো?

—এত পড়ানোর কী দরকার? আগে নিজের পড়াশুনোটা করো?

বাবুয়ার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল, নিজের চরকায় তেল দিন। অনেক কষ্টে চুপ করে রইল।

আবার দু-চার পা নিঃশব্দে হাঁটল সৌমিক। আচমকা বলল,—আমি কেন এসেছি আন্দাজ করতে পারছ?

—আমাকে টিউশনি ছাড়ার জন্য উপদেশ দিতে নয়, এটুকু অন্তত অনুমান করছি।

—এবং কোনও আশ্রমেও আমি আসিনি। তোমাদের এখানেই এসেছি।

—আমারও এরকমটাই মনে হচ্ছিল। কারণটা জানতে পারি?

—যদি বলি তোমার মাকে দেখতে? একটু যেন দম নিল সৌমিক। তারপর বলল,—আই মিন, প্রোফেসার মজুমদারের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে?

চমকে সৌমিকের দিকে তাকাল বাবুয়া? অন্ধকারে সৌমিকের মুখ ভাল দেখা যাচ্ছে না। ঈষৎ রুক্ষ ভাবেই বলল,—কেন?

—ওঁকে দেখে আন্দাজ করতে চাইছিলাম প্রোফেসার মজুমদার মানুষ কেমন! কেনই বা তিনি তাঁর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছেন!

বাবুয়া পলকের জন্য নাড়া খেয়ে গেল। পরক্ষণেই দপ করে জ্বলে উঠল,—আপনার সাহস তো কম নয়! আমার বাবা-মার ব্যাপারে আপনার এত কৌতূহল কেন?

—কারণ তোমার বাবা, প্রোফেসার বোধিসত্ত্ব মজুমদার আমার একটা চরম ক্ষতি করেছেন। সৌমিকেরও গলা সামান্য উঠল,—আই হ্যাভ সাম স্কোর টু সেটল উইথ হিম।

—হতে পারে। সে আপনি যা ইচ্ছে করুন গিয়ে। কিন্তু আমার মার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?

—একটা পরোক্ষ সম্পর্ক আছে বইকী। তাঁকে ডেজার্ট করে অন্য একটি মেয়েকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে ঘর বেঁধেছেন প্রোফেসার মজুমদার। ইন্‌ডেন্টালি অর অ্যাক্সিডেন্টালি, সেই মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ে ফাইনাল হয়ে গিয়েছিল।

প্রবল ঝাঁকুনি খেল বাবুয়া। চলন্ত গাড়ির হেডলাইটে মুহূর্তের জন্য সৌমিকের মুখখানা দেখতে পেল। অদ্ভুত কঠিন, ভাবলেশহীন, যেন প্রস্তরমূর্তি কথা বলছে।

সৌমিক বুঝি বাবুয়াকে ধাক্কাটা সইয়ে নেওয়ার সময় দিল। কিছুক্ষণ পরে বলল,—তোমার বাবার ইরেস্‌পন্সিবল অ্যাক্ট কত কিছু শ্যাটার্ড করে দিয়েছে জানো? আমার কথা ছেড়েই দাও। দয়িতা, আই মিন মেয়েটার মা-বাবা শোকে পাথর হয়ে গেছেন। দুটো ফ্যামিলির মান সম্মান সব ধুয়ে মুছে গেল।

বাবুয়া নীরস স্বরে বলল,—তার সঙ্গেই বা আমার মার কী সম্পর্ক?

—আছে সম্পর্ক। তাঁর সঙ্গে কথা বলে বুঝতে চাইছিলাম তাঁদের স্বামী স্ত্রীর রিইউনিয়নের আর সম্ভাবনা আছে কি না।

—সর্বনাশ, আপনি মাকে এ সব কথা কিছু বলেছেন নাকি?

—আমাকে কি তোমার অত নির্বোধ মনে হয়? ফর ইওর ইনফরমেশন, তোমার সঙ্গে যেদিন আমার লাস্ট দেখা হয়, সেদিন আমি ক্যাম্পাস টাউনে ওই মেয়েটিকেই মিট করতে গেছিলাম। তুমি কি আমার কথা শুনে কিছু বুঝতে পেরেছিলে? নিশ্চিন্ত থাকো, তোমার মাকেও আমি কিছু বুঝতে দিইনি। জাস্ট কথায় কথায় তোমার বাবার প্রসঙ্গ তুলেছিলাম, দেখলাম ওঁর মুখটা কেমন স্টিফ হয়ে গেল। অ্যান্ড শি ওয়াজ ট্রায়িং টু অ্যাভয়েড দা টপিক।

—আপনাকে তাহলে আর একটা খবরও দিয়ে দিই। বাবার উকিল ডিভোর্সের নোটিস পাঠিয়ে দিয়েছে। এবং মা কনটেস্ট করছে না।

—ও, তাই বুঝি?

—খুব হতাশ হলেন মনে হচ্ছে? বাবুয়া একটু খোঁচা দেওয়ার লোভ সামলাতে পারল না,—আমার বাবা মার মিলমিশ হয়ে গেলে আপনি বুঝি মেয়েটাকে বিয়ে করতেন? বাবার সঙ্গে লিভ টুগেদার করেছে জেনেও?

—ওইটেই তো আমার ট্রাজেডি। সৌমিক অন্ধকারকে ভারী করে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল,—আমি যে ওই মেয়েটাকে ভালবাসি। এখনও। অ্যান্ড শি ইজ মাই ডেসটিনি।

ভালবাসা শব্দটার মধ্যে যে এত তীব্রতা থাকতে পারে, বাবুয়ার জানা ছিল না। ভালবাসা কী এমন অনুভূতি, যে ছেলেটা...? ছেলেটা সত্যি সত্যি পাগল নয় তো?

এই প্রথম দয়িতা নামের মেয়েটার ওপর অনুকম্পা জাগছিল বাবুয়ার। এমন একটা ছেলেকে ছেড়ে তার বাবার মতো এক আত্মসর্বস্ব লোকের পিছনে ছুটল? আশ্চর্য!

বাবুয়া নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল,—আপনি কি বোধিসত্ত্ব মজুমদারের ওপর প্রতিশোধ নিতে চান?

আরও গলা নামাল সৌমিক। প্রায় ফিসফিস করে বলল,—ভাবছি।

আঠারো

বোধিসত্ত্বর বিদেশযাত্রার দিন কয়েকের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠল দয়িতা। জীবনে এই প্রথম সে একা, পরিপূর্ণভাবে একা। নির্জনতা বিচ্ছিন্নতা একাকিত্ব শব্দগুলো তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচিত বটে, কিন্তু এরা প্রত্যেকেই যে কী দুঃসহ ভার হয়ে বুকে চেপে বসতে পারে তা দয়িতার জানা ছিল না, এই প্রথম সে টের পাচ্ছিল। এই শহর তার আজন্ম চেনা, এই শহরের রূপ রস গন্ধ বর্ণ তার রক্তে মিশে আছে, বাবা-মা ভাই আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কে নেই এখানে, তবু মনে হয় এক শ্মশান দ্বীপে বাস করে সে। এ এক আজব নির্বাসন। যেন এক কন্ডেমড্ সেলে স্থান হয়েছে দয়িতার, চেনা পৃথিবীর আলো বাতাস তার জন্য রুদ্ধ।

একেই বোধহয় নিরবলম্ব শূন্যতা বলে। এ যেন জলের তলায় বাস। অহরহ দু ফোঁটা অক্সিজেনের জন্য আঁকুপাঁকু করা।

দয়িতার দিনগুলো এখন অতি মন্থর। কাঁহাতক আর চাদর পাট সংসার গোছগাছ করে সময় কাটে! রোজ রোজ মার্কেটিংও ভাল লাগে না। কী বিরক্তিকর নিস্তরঙ্গ জীবন! শুয়ে থাকা, কড়িকাঠ গোনা, টিভির দিকে ফাঁকা চোখে তাকিয়ে থাকা, ব্যালকনির টবে জল দেওয়া...। সময় যেন স্থাণু হয়ে আছে ফ্ল্যাটে। সকাল কিছুতেই দুপুরে ঘুরতে চায় না, প্রায়স্থবির দুপুরের বিকেলে পৌঁছতে অনীহা, বিকেল এলেও সন্ধে আসতে গড়িমসি করেই, আর রাত? সে তো এক একটা বছরের চেয়েও দীর্ঘ। ইচ্ছেয় হোক, আর অনিচ্ছেয় হোক, প্রতি পদে চোখ চলে যায় ক্যালেন্ডারে। বোধিসত্ত্ব ফিরবে কবে?

রোজ একবার বোধিসত্ত্বর ফোন পেলে হয়তো একঘেয়েমি কিছুটা কাটত দয়িতার। বার্লিন পৌঁছে মাত্র বার তিনেক দয়িতাকে ফোন করেছে বোধিসত্ত্ব। কেজো কথা কয়েকটা, তাও মাত্র মিনিট দু-চারের জন্য। বোধিসত্ত্ব এখন সেমিনার নিয়ে মহা ব্যস্ত। পেপার থিসিস সিম্পোজিয়ামের ফাঁকে ফাঁকে দয়িতার কথা কি মনে পড়ে বোধিসত্ত্বর? কিংবা রাতের একা শয্যায়?

অচেনা একাকিত্ব অভিমান হয়ে চারিয়ে যাচ্ছিল দয়িতার বুকে। নিজেকে এক পরিত্যক্ত নারী বলে মনে হয় হঠাৎ হঠাৎ। রাতে আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে আঁধারটাকে আরও গাঢ় লাগে। কী করে যে এই গহীন নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পাবে দয়িতা?

এরকমই একটা সময়ে কোথ্থেকে সহসা সৌমিক এসে হাজির।

ইদানীং সকালে একটু দেরি করে শয্যা ছাড়ে দয়িতা। ঠিকে ঝি আসে সাতটা নাগাদ, তাকে দরজা খুলে দিয়েই আবার বিছানায় ধপাস। বাসনকোসন যা দু-একটা পড়ে ঝড়ের গতিতে মেজে ফ্ল্যাটের দরজা টেনে বন্ধ করে চলে যায় কমলার মা, আবার তার দর্শন মেলে সেই বারোটায়। তখন ঘর ঝাড়পোঁছ করবে, কাপড়জামা থাকলে কাচবে...

আজও কমলার মা ভেবেই দয়িতা দরজা খুলতে উঠেছিল। ঘুম ঘুম চোখে, আলুথালু বেশে। ওমা, দরজায় এ কে? সৌমিক!

সৌমিকের হাতে এক গোছা রজনীগন্ধা। ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি। ফুলের তোড়া বাড়িয়ে দিল বলল,—মেনি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে।

দয়িতার শরীর জুড়ে শিহরন খেলে গেল। তাই তো আজই তো ইলেভেনথ্ এপ্রিল! আশ্চর্য, এই দিনটার কথা দয়িতার মনেই ছিল না!

অদ্ভুত এক ভাললাগা ভোরের বাতাসের মতো ছুঁয়ে গেল দয়িতাকে। অপ্রস্তুত মুখে হাসল,—তুতুতুতুতুমি?

—বন্ধুর জন্মদিনে বন্ধু উইশ করতে আসতে পারে না?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই...বটেই তো...এমা, ছি ছি দাঁড়িয়ে কেন? এসো এসো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৌমিককে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে দয়িতা ছুটে শোওয়ার ঘরে এল। তার পরনে অতি স্বচ্ছ রাতপোশাক, চটপট হাউসকোট চাপিয়ে নিল গায়ে। বাসি চুল ঝামর হয়ে আছে, আলতো চিরুনি বুলিয়ে নিল একবার।

ফিরে এসে বসতে বসতে বলল,—আমার ঠিকানা পেলে কোথথেকে?

—তুমি নামী লোকের ঘরণী, তোমার অ্যাড্রেস পাওয়া কী এমন কঠিন?

সৌমিকের স্বরে কি বিদ্রূপ? মনে হল না দয়িতার। জিজ্ঞেস করল,—ওর ইন্সটিটিউট থেকে পেয়েছ?

সৌমিক জবাব দিল না। লঘু গলায় বলল,—সারপ্রাইজটা কেমন দিলাম সেটা বলো? ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছ তো?

—হ্যাঁ...মানে...এমন দিনে সাতসকালে...

—দোহাই আবার প্রশ্ন কোরো না তোমার জন্মদিনটা জানলাম কী করে।

কৌতূহল যে দয়িতার হচ্ছে না তা নয়। মনে মনে আঁচ করে নিল তার বাড়ির সঙ্গে এখনও যোগাযোগ আছে সৌমিকের। নিশ্চয়ই সেখান থেকেই কথা প্রসঙ্গে...।

মনটা ঈষৎ উদাস হয়ে গেল দয়িতার। আজ কি তার নাম করে বাড়িতে পায়েস করবে মা? প্রতিবারের মতো? গত বছর জন্মদিনে হোস্টেলে ফোন করেছিল বাবা, খুব সকালে। খাঁটি ফরাসি পারফিউম কিনেছিল দয়িতার জন্য। আজ কি আদরের মুনিয়ার কথা ভেবে বাবার একটুও মন খারাপ হবে না?

দয়িতার ক্ষণিক অন্যমনস্কতা সৌমিকের নজরে পড়েছে। মৃদু গলায় প্রশ্ন করল,—কী ভাবছ?

—কিছু নয়। ছোট্ট শ্বাস ফেলে দয়িতা কথা ঘোরাল। —তুমি এমন দিনে এসে, তোমার সঙ্গে ওর আলাপ করাতে পারলাম না। ও এখন...

—জানি। প্রফেসার মজুমদার এখন দূরদেশে।

—এও জানো?

—সেলিব্রিটিদের খবর তো রাখতেই হয়।

এ কথাটায় কি বিদ্রূপ আছে? দয়িতা ভুরু কুঁচকে এক ঝলক দেখল সৌমিককে। নাহ, সৌমিকের মুখ সহজ সরল স্বাভাবিক। ছিঃ, জন্মদিনের সকালে ফুল হাতে কেউ শ্লেষ ছুড়তে এসেছে, চিন্তাটাই কী অস্বাস্থ্যকর।

দয়িতা প্রসন্ন মুখে বলল,—বোসো, চা করে আনি...। এক্ষুনি এক্ষুনি কিন্তু পালাতে পারবে না। ব্রেকফাস্ট করে যেতে হবে।

—যাক, তাও ভাল। খাওয়ানোর কথা মনে পড়েছে। তোমার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল এক্ষুনি বোধহয় উঠতে হবে, ভোর ভোর ট্যাক্সি ভাড়াটাই গচ্চা গেল। সৌমিক ভুরু নাচাল,—ব্রেকফাস্টের মেনুটা কী?

—দেখা যাক ঘরে খুদকুড়ো কী আছে। দয়িতা উঠে দাঁড়াল। হাসতে হাসতে বলল, বার্থডে কেক তো জুটবে না, হয়তো মুড়ি বাদাম...

বাইরে এক মনোরম সকাল ফুটেছে। রোদ্দুরে কাঁচা সোনার রং, ঝলমল করছে বাড়িঘর। কম্পাউন্ডের কৃষ্ণচূড়া গাছ ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে, চড়া লালে ধাঁধিয়ে যায় চোখ। বাতাসে একটা গন্ধ ভাসছে। চেনাও নয়, আবার অচেনাও নয়, এমনই এক সৌরভ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রান্নাঘরে এসে দয়িতা চায়ের জল চড়িয়ে দিল। বোধিসত্ত্বর সঙ্গে থেকে থেকে সকালবেলা এক কাপ কালো চায়ের অভ্যেস ধরে গেছে দয়িতার, ঘুম থেকে উঠে চা না খেলে খোঁয়াড়ি কাটতে চায় না।

কাপে আন্দাজ মতো চিনি দিচ্ছিল, পিছনে কমলার মা। বছর পঁয়ত্রিশের কালোকুলো বউটার চোখে জিজ্ঞাসা ঝিকঝিক। ফিসফিস করে বলল,—কে গো বউদি? তোমার বাপেরবাড়ির লোক?

হ্যাঁ বললেই চুকে যেত, দয়িতার মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল,—না। আমার বন্ধু।

—এত সকালে বন্ধু...?

—তোমার আপত্তি আছে? দয়িতা সামান্য রুক্ষ হল,—যাও, চটপট ফ্রিজ থেকে দুটো ডিম বের করে আনো।

ঘুরে তাকাতে তাকাতে চলে গেল কমলার মা। দয়িতার একটু একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। কমলার মার প্রশ্নের কোনও ঠিকঠিকানা নেই, মুখটাও বড় আলগা। প্রথম দিন কাজে এসেই জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কি বাবুর দ্বিতীয় পক্ষ! এই কম্পাউন্ডে আরও চারটে ফ্ল্যাটে কাজ করে কমলার মা, কোন কথা কোথায় কীভাবে পল্লবিত করে দেবে কে জানে! দয়িতা অবশ্য প্রতিবেশীদের আমল দেয় না, কে কী ভাবল তাতে তার বয়ে গেল। এই চত্বরে এখনই কি তাকে নিয়ে গুঞ্জন নেই?

বুক থেকে কীটপতঙ্গগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিল দয়িতা। সকালটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চনমনে একটা ভাব এসে গেছে মনে। যেন স্বল্পচেনা সৌমিক নয়, যেন বহুকাল পর কোনও আপনজন এসেছে ঘরে। গুনগুন করতে করতে চা পাতা ভেজাল দয়িতা, দ্রুত ডিম দুটো ফেটিয়ে, দুধ ময়দা গুলে, কাঁচালঙ্কা পেঁয়াজকুচি মিশিয়ে ভেজে ফেলল একখানা বড়সড় প্যানকেক। ঘরে কাজুবাদাম আছে, কলাও। টম্যাটো সসে প্যানকেক সাজাল, কাজুবাদাম কলাও রাখল ডিশে। ইশ, ঘরে একটু মিষ্টি থাকলে ভাল হত। জন্মদিনে মিষ্টিমুখ না করালে কি ভাল দেখায়!

সৌমিক খবরের কাগজ উলটোচ্ছিল। খাবারের প্লেট দেখে হাঁ হাঁ করে উঠেছে,—ওরেব্বাস, এ কী করেছ? খেতে চাইলাম বলে এত?

—খেয়ে নাও, খেয়ে নাও। দয়িতা হাসিমুখে উলটো দিকের সোফায় বসল,—নিশ্চয়ই তুমি আর বাড়ি ফিরবে না? এখান থেকেই অফিস যাবে?

—আজ কীসের অফিস? আজ তো গুড-ফ্রাইডে!

তাই বুঝি? বলতে গিয়েও দয়িতা সামলে নিল। তার কাছে এখন শনি, রবি, সোম, মঙ্গল ছুটির দিন কাজের দিন সবই তো সমান। তা ছাড়া সৌমিক পরে আছে জিনস আর টিশার্ট, এই পোশাকে কেউ অফিস যায় না, দয়িতার বোঝা উচিত ছিল।

দ্বিতীয়বার আর ভদ্রতা না দেখিয়ে সৌমিক প্লেট টেনেছে। প্যানকেকে চামচ চালাতে চালাতে বলল,—তোমার খাবার কই?

—আমি এখন কিছু খাব না।

—কেন?

—এমনিই। ভাল লাগছে না। তা ছাড়া মুখটুখ এখনও ধোয়া হয়নি...

—এহ, সক্কালবেলা এসে তোমায় খুব অকোয়ার্ড সিচুয়েশানে ফেলে দিলাম তো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—না, না, আমার খুব ভাল লাগছে...বিশ্বাস করো...

সৌমিক এক সেকেন্ড দেখল দয়িতাকে। তারপর বলল,—আছ কেমন?

—কেমন দেখছ?

—আগের থেকে একটু রোগা হয়ে গেছ।

—যাহ্, দিনরাত খেয়ে বসে শুধু মোটাচ্ছি..। দয়িতা চায়ের কাপ টানল। ফুরফুরে গলায় বলল,—আমার সংসার কেমন দেখছ, বলো?

—ফাইন। চতুর্দিকে পাখির চোখ বোলাল সৌমিক,—খুব সুন্দর লাগছে। টিপটপ ঝকঝকে।

—সব নিজে পছন্দ করে কিনেছি। পরদা, ফার্নিচার...। নিজের হাতে সাজিয়েছি সব কিছু।

—বাহ্ বাহ্। সৌমিক একটু চুপ থেকে ঝপ করে বলল,—এম এসসি ফাইনালটা তা হলে আর দিলে না?

দয়িতা দীর্ঘশ্বাস চাপল। ইচ্ছে তো ছিল, হল কই! বোধিসত্ত্ব চলে যাওয়ার পর কদিন ধরে অনেক ভেবেছে। এপ্রিলের বারো তারিখ থেকে ফাইনাল, কটা দিন মরিয়া পড়াশুনো করে পরীক্ষাটা দিয়ে এলে হয়। ফর্ম ফিলআপ তো করাই আছে, গিয়ে শুধু অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে হলে ঢুকে পড়া...। এক দু-দিন বইখাতা খুলেও বসেছিল। পাতা উলটোনোই সার, মন বসল না। রাশি রাশি হাবিজাবি চিন্তা মাকড়সার জালের মতো জড়িয়ে ধরে। ক্যাম্পাস টাউনে গিয়ে সে উঠবে কোথায়? হোস্টেলে? চিরশ্রীর গেস্ট হয়ে কদিন...পরীক্ষা শেষ হওয়া অবধি...? দরকার কী? চিরশ্রী তাকে কী মনে নেবে, কত কৈফিয়ত চাইবে, কী জেরা করবে...! প্যাট প্যাট করে তাকাবে সবাই, মুচকি মুচকি হাসবে, বাক্যবাণ ছুড়বে, উফ অসহ্য। পরিস্থিতি এখন বদলে গেছে, দয়িতা এখন আর একা নয়। তার অপমান মানে বোধিসত্ত্বর অপমান। উহুঁ, দয়িতার পক্ষে আর ক্যাম্পাস টাউনে পা রাখা সম্ভব নয়।

মনের খেদটা মুখে ফুটতে দিল না দয়িতা। হালকা স্বরেই বলল,—ধুস, কী হবে? এম এসসি পাশ করে কী এমন হাত পা গজায়?

—ডিগ্রিটা নিয়ে রাখলে পারতে। ভবিষ্যতে কখন কী কাজে লাগে...

—আমার কোনও কাজেই লাগবে না। আমি এখন চুটিয়ে সংসার করব।

—ও বাবা, তুমি যে দেখছি একেবারে মা ঠাকুমাদের মতো কথা বলছ! সংসারের সঙ্গে কেরিয়ারের কী কন্ট্রাডিক্শান আছে?

—নেই?

—অফকোর্স না। এই তো আমাদের অফিসে একটা মেয়ে আছে, নিবেদিতা। ওর বর আমেরিকা গেল, ও চলে গেল বম্বে। জাস্ট টু বিল্ড দেয়ার ওন কেরিয়ার। আই মিন, যার যার নিজের কেরিয়ার। আজকালকার দিনের মেয়েরা কেরিয়ার ফেলে দিয়ে শুধু গৃহবধূটি হয়ে থাকে নাকি? সৌমিক হঠাৎ সামান্য উত্তেজিত,—তোমার কি মনে হয় না, ইউ নিড আ ওয়ার্ল্ড অফ ইওর ওন?

—বোধিসত্ত্বর জগৎই আমার জগৎ।

—খুব ভাল কথা। কিন্তু ম্যাডাম, এই অ্যাদ্দিন ধরে ঘাড় মুখ গুঁজে যে লেখাপড়া শিখলে, তার আর কী মূল্য রইল? শিক্ষা যদি কাজেই না লাগে...। সৌমিক প্লেট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেবিলে নামাল,—মেসোমশাইও ঠিক এই ভয়টাই পাচ্ছিলেন।

—কে মেসোমশাই?

—তোমার বাবা।

দয়িতা বেশ নাড়া খেয়ে গেল। চিনচিন একটা কষ্ট জমছে বুকে। বাবা এখনও তাকে নিয়ে এত **ভাবে**? কলকাতা আসার পর থেকে কত বার যে বাড়ির কথা মনে পড়েছে দয়িতার, **টেলিফোন** করার জন্য হাত নিশপিশ করেছে। পারেনি, কিছুতেই পারেনি। রিসিভার **তুলছে**, বোতামে আঙুল ছোঁয়াচ্ছে, কিন্তু চাপ দেওয়ার জোর পাচ্ছে না...। অপরাধবোধ?

দয়িতা অস্ফুটে বলল,—তুমি রেগুলার ও বাড়িতে যাও, তাই না?

—মাঝে মাঝে যাই।

—কেমন আছে সবাই? দয়িতার গলা আরও খাদে নেমে গেল।

—আছেন। মাসিমা বুম্‌বা ধাক্কাটা অনেকটা সামলে নিয়েছেন। শুধু মেসোমশাই...বাদ দাও, প্রফেসার মজুমদারের কথা বলো। কবে ফিরছেন?

—কাজ চুকলেই। দায়সারা গোছের উত্তর দিল দয়িতা। ভেতরে ভেতরে একটা চাপ অনুভব করছে। আবার জিজ্ঞেস করল,—বাবা এখনও আমার ওপর খুব রেগে আছে, না?

—না, রাগ আর নেই। তবে...

—তবে কী?

—রাগ ছাড়াও আরও অনেক অনুভূতি থাকে দয়িতা। দুঃখ হতাশা স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা...। লোকলজ্জা অপমান তো আছেই, ওটা নয় নাই ধরলাম। অবশ্য মনে মনে মেনে নিয়েছেন এটাই তাঁর ভবিতব্য ছিল।

—ভবিতব্যের কী আছে? আমার যাকে পছন্দ তাকে আমি বিয়ে করতেই পারি। বাবার তাকে পছন্দ নাও হতে পারে।

—আমিও তো মেসোমশাইকে ওই লাইনেই বুঝিয়েছি। কিন্তু...প্রবলেমটা কোথায় জানো? মানুষ যাকে বেশি ভালবাসে তার ক্ষেত্রে যুক্তি বুদ্ধি কাজ করে না, ইমোশানটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়।

—হুঁ।

দয়িতা চুপ করে গেল। সৌমিকও আর কথা বলছে না। বসন্তের সকাল ভারী হয়ে যাচ্ছে। সোনালি রোদ্দুরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকে পড়ছে মলিন ছায়া। কমলার মা কাজ সেরে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময়ে আজ যেন একটু বেশি জোরে বন্ধ করল দরজা, শব্দটা বড় কানে লাগল দয়িতার। চোরা কান্না পাচ্ছে হঠাৎ। অকারণে।

নিজেকে ক্রমশ স্থিত করল দয়িতা। নতমুখ সৌমিককে অপাঙ্গে দেখছে। কেন আজ তার কাছে এসেছে ছেলেটা? শুধুই জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে? নাকি দয়িতার সংসার দেখতে? সে কতটা সুখী হয়েছে বুঝতে? এখনও এত কীসের আগ্রহ? দয়িতার বাবা মার কাছেই বা যায় কেন? কোন সম্পর্কের সুবাদে যায়? দয়িতাকে কেন ভুলতে পারছে না সৌমিক?

ব্যালকনি থেকে বাতাসের ঝাপটা এল একটা। ঘরে ঢুকে ঘুরন্ত পাখার হাওয়ায় হারিয়ে গেল। ঘরের নৈঃশব্দ্যও দুলে গেল যেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দয়িতা আচমকা কথা বলে উঠল,—তোমার বিয়ের কদ্দুর?

—উঁ?

—তোমার বিয়ের কী হল?

হঠাৎ দয়িতাকে চমকে দিয়ে হাসতে শুরু করেছে সৌমিক। হা হা হাস্‌ছে। হাসিতে গমগম করে উঠছে।

দয়িতা অবাক চোখে তাকাল,—এত হাসির কী হল?

—ন্যাড়া বেলতলায় কবার যায়? মাথায় অত বড় একখানা বেল পড়ার পরও আমার শিক্ষা হয়নি বলতে চাও?

—যাহ্, সব মেয়ে আমার মতো হবে নাকি?

—সে তো বটেই। সব মেয়ে তুমি হবে কী করে?

—বুঝলাম না।

—মানে আরও বিপজ্জনকও তো হতে পারে। ধরো, বিয়ের আসর থেকে চোঁ চাঁ দৌড় লাগাল। কিংবা হয়তো ফুলশয্যার রাতে বলল, তুমি আমাকে ডিভোর্স দাও, আমি অন্য ছেলেকে ভালবাসি।

—ফাজলামি কোরো না। কবে বিয়ে করছ বলো? কথা দিচ্ছি, বিয়েতে যেতে না পারলেও তোমার বউকে একটা দারুণ প্রেজেন্ট দেব।

কয়েক সেকেন্ড দয়িতার চোখে চোখ রেখে স্থির তাকিয়ে রইল সৌমিক। এই প্রথম দয়িতার মনে হল ওই চোখে ভাষাও আছে। দৃষ্টিটায় অস্বচ্ছন্দ বোধ করছিল দয়িতা, চোখ নামিয়ে নিল।

সৌমিক ঘড়ি দেখছে,—তা হলে আজ উঠি?

দয়িতার প্রশ্নের উত্তর দেয়নি সৌমিক, তবু তা নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করল না দয়িতা। বলল,—আবার এসো কিন্তু।

—আসব। সৌমিক উঠে দাঁড়িয়ে একটুখানি ইতস্তত করল,—তোমার চাকরি বাকরি পড়াশুনো নিয়ে বলছিলাম বলে কিছু মাইন্ড করোনি তো?

—না না...তুমি নিশ্চয়ই আমার ভালর জন্যই বলেছ।

—হ্যাঁ। বিলিভ মি। আফটার অল তুমি তো আর রাখী মজুমদার নও।

দয়িতা জোর ঝাঁকুনি খেল,—তুমি তাকে চেনো?

—অ্যাক্সিডেন্টালি পরিচয় হয়ে গেছে। বারাসতে মার গুরুদেবের আশ্রম, তার পাশেই ওঁর বাপের বাড়ি, সেখানেই একদিন পাকেচক্রে...। সৌমিক গলা ঝাড়ল,—খুব রেচেড কন্ডিশানে আছেন মহিলা।

—কেন? দয়িতা টেরচা তাকাল,—তার বাপের বাড়ির অবস্থা তো ভাল?

—না না, ওই সেন্সে রেচেড নয়। মেন্টালি এগ্‌জস্টেড। স্বামী ছাড়া কিছু তো বুঝতেন না, হয়তো সেই জন্যই...। দরজার দিকে এগোতে এগোতে পকেট থেকে সানগ্লাস বার করল সৌমিক। চোখে পরে নিয়ে ঘুরে তাকাল,—বুঝলে দয়িতা, এই জন্যই বলছি মেয়েদের সব সময়ে একটা আলাদা জগৎ থাকা ভাল। আই মিন, একটা নিজস্ব উইন্ডো।...প্রফেসার মজুমদার তোমায় ভালবাসেন ঠিকই, বাট হু ক্যান ফোরটেল দা ফিউচার? রাখী মজুমদার কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন এই বয়সে এসে তাঁকে এই রকম একটা সিচুয়েশানে পড়তে হবে?

দয়িতা ফোঁস করে উঠল,—তার জন্য সে নিজেই দায়ী। সে বোধিসত্ত্বর জীবনে নিজেকে ফিট করাতে পারেনি। তাদের মধ্যে একটা ভ্যাকুয়ম তৈরি হয়েছিল বলেই না আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল বোধিসত্ত্ব।...রাখী মজুমদার বুঝি এখন বোধিসত্ত্বকে দোষী করছে?

—তিনি সে ধরনের মহিলাই নন। ভেতর থেকে পুড়ে খাক হয়ে যাবেন, কিন্তু মুখ থেকে কখনও একটা উফ্ শব্দও বার হবে না।

—রাখীর দুঃখে আপ্লুত হয়ে গেছ মনে হচ্ছে? দয়িতার ঠোঁট বেঁকে গেল,—রাখী মজুমদার কি তোমায় উকিল পাকড়েছে?

—রাখী মজুমদারের উকিলের দরকার নেই। সৌমিকের স্বর গম্ভীর,—যা বললাম ভেবে দেখো। চলি।

তরতরিয়ে নেমে গেল সৌমিক। দয়িতা গুম। এতক্ষণে যেন সৌমিকের আসার উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট হচ্ছে। রাখীর কথা বলে তাকে একটু ঝাঁকাতে এসেছিল সৌমিক? তাই এত ভূমিকা, এত ভণিতা...? ছোকরার তো হেভি প্যাঁচ! জন্মদিন স্মরণ করিয়ে, বাবা মার কথা শুনিয়ে, দয়িতাকে আগে ভিজিয়ে নিয়ে...! দয়িতা পরীক্ষা দেবে কি দেবে না, চাকরি করবে কি করবে না, তাতে তোর কী? আমার বাড়িতে আমারই সঙ্গে দেখা করতে এসে তুই রাখীর কথা তুলিস কোন সাহসে?

দুপদাপিয়ে ঘরে ফিরে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ল দয়িতা। শুয়ে আছে, শুয়েই আছে। পাশবালিশ আঁকড়ে, চোখ বুজে। মিষ্টি সকাল এখন হাকুচ তেতো।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দয়িতার রাগের ঝাঁঝ স্তিমিত হল খানিকটা। উঠল, মুখ টুখ ধুল, স্নান সারল, টুকটাক কাজ সারছে ঘরের। খিদে পেয়েছে জোর, অথচ জিভ বিস্বাদ, বয়াম খুলে নোনতা বিস্কুট খেল কয়েকটা। রান্নাঘরে এসে দুপুরের আহারের তোড়জোড় করছে। কৌটো থেকে চাল বার করতে গিয়ে থমকাল একটু, হাসল নিজের মনে। জন্মদিনে আজ কী খাবি রে মুনিয়া? ফ্রায়েড রাইস? ডিপফ্রিজে চিকেন আছে, সেদ্ধ করে যদি ফ্রায়েড রাইসে ছড়িয়ে দেওয়া যায়...? তুৎ, অনেক টাইম লাগবে, ভাল্লাগছে না। সেদ্ধ ভাতই খেয়ে নে। গরম গরম ভাতে ঘি আলুসেদ্ধ আর ডিমসেদ্ধ।

বগবগ ফুটছে সুগন্ধি চাল। দয়িতার চোখ ঝাপসা সহসা। নিজের অজান্তেই। বাড়িতে কি আজ তার নাম করে ভালমন্দ রান্না হচ্ছে? ধূস, মিছিমিছি সৌমিকের ওপর রাগ করল। মনে যাই থাক, ছেলেটা তো তবু দয়িতার জন্মদিনে...! শুধু ওই একজনই...। এই পৃথিবীতে আর তো কেউ তাকে আজ...! বোধিসত্ত্ব তো জানেই না...।

দ্রুত পায়ে ড্রয়িংরুমে এল দয়িতা। সেন্টার টেবিলে রজনীগন্ধার স্টিকগুলো ভারী অবহেলায় পড়ে আছে, সযত্নে তুলে মাপ মতো ডাঁটিগুলোকে ছাঁটল, সাজাল ফুলদানিতে। একটু দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে শুভ্র কুসুমগুচ্ছ। নাহ্, সৌমিক একটা কথা অন্তত ভুল বলেনি। একটা চাকরি বাকরির চেষ্টা করলে মন্দ হয় না। টাকা পয়সার প্রয়োজন তার তেমন নেই, রাখীর মতো ভোঁতা মহিলাও সে নয়, সুতরাং ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কাও সে করে না, কিন্তু পেটের বিদ্যেটাকে কাজে লাগাতে ক্ষতি কী? কেন সে রাখীর মতো পরজীবী হয়ে থাকবে? তা ছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, বোধিসত্ত্ব ফিরে এলেও দয়িতার একাকিত্ব কি পুরোপুরি ঘুচবে? সংসারের কাজ আর কতটুকু, এই তো এখনই গোটা দিন ফাঁকা হয়ে যাবে...। দয়িতার পলকের জন্য মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ল, বার্লিন যাওয়ার আগে অষ্টপ্রহর পড়াশুনোয় ডুবে থাকত বোধিসত্ত্ব, দয়িতাকে প্রায় কাছেই ঘেঁসতে দিত না...। তখনই কি কম নিঃসঙ্গ লেগেছে দয়িতার? যা খ্যাপা উদাসীন মানুষ, ওর পাশে পাশে থাকতে গেলে বোধহয় নিজের একটা ভুবন গড়ে রাখাই ভাল।

ভাবনাটা ঝট করে দয়িতার মনে ধরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা উদ্যম এসে গেছে। জন্মদিনটা বৃথা যায় কেন, আজ থেকেই নয় চেষ্টা শুরু হোক।

খেয়ে উঠেই দয়িতা খবরের কাগজ নিয়ে বসল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছে কর্মখালির বিজ্ঞাপন। চার পাঁচ দিনের পুরনো কাগজও বার করে ঘাঁটছে। শুধুমাত্র বি এসসি অনার্স কোয়ালিফিকেশানে কী কাজ জুটতে পারে? চাকরির বাজার এখন বেশ খারাপ, তাও দু-একটা উৎসাহব্যঞ্জক বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল দয়িতার। স্মার্ট, মুখে ইংরিজিতে খইফোটা রিসেপশনিস্ট চাই। সপ্রতিভ সুশ্রী সেলস্‌গার্ল। প্রাইভেট স্কুলে লিভ ভেকেন্সিতে শিক্ষয়িত্রী...। চোখ কান বুজে সব কটাতেই দরখাস্ত ঠুকে দেবে দয়িতা? আজই?

কটা দিন হুটোহুটি করে কেটে গেল। দয়িতা আবেদনপত্র টাইপ করাচ্ছে, আর ছাড়ছে। একদিন টুপ করে অফিস পাড়ায় ঘুরে এল। নাম লিখিয়েছে চাকরি দেওয়ার সংস্থায়। এজেন্সি অবশ্য খুব আশার কথা শোনায়নি, কম্পিউটার না জানলে তাদের মাধ্যমে কাজ পাওয়া কঠিন। শুনেই এদিক ওদিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ছুটল দয়িতা। ভর্তি হবে কি না ভাবছে।

এরই মধ্যে এক অভিনব চমক। একটা অবশ্যম্ভাবী ঘটনার আগাম বার্তা পেল দয়িতা।

কদিন ধরেই দয়িতার মনে সন্দেহটা দানা বাঁধছিল। সময় পেরিয়ে গেল, পিরিয়ড হয় না কেন? গা গুলোনো ভাবও আসছে একটা, কিছু খেতে ইচ্ছে করে না...! কী করবে এখন? ডাক্তারের কাছে ছুটবে? একাই? নাকি বোধিসত্ত্ব আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে?

ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা বাড়ছিল দয়িতার। সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলও। শেষমেষ আর তর সইল না, ছুটেছে ডাক্তারের কাছে। টেস্ট মেস্ট হল। দয়িতার অনুমানই সঠিক, রিপোর্ট পজেটিভ।

নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক অনির্বচনীয় অনুভূতিতে ছেয়ে গেল দয়িতা। আনন্দ আনন্দ আনন্দ, বুকের মধ্যে উথলে উঠছে খুশি। প্রফেসার বোধিসত্ত্ব মজুমদারের সন্তান ধারণ করার সৌভাগ্য পেয়েছে সে, ভাবা যায়! তার শরীরের অভ্যন্তরে, তারই শরীর থেকে প্রাণরস নিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে এক আগামী বোধিসত্ত্ব! ছেলে কেন, মেয়েও হতে পারে। তা সে যাই হোক, তার আর বোধিসত্ত্বর সন্তান নিশ্চয়ই সাধারণ কেউ হবে না! আহা রে, সূর্যদেবের তেজ ধারণ করে কুন্তীরও কি এই পুলক জেগেছিল।

দয়িতার মনের উচ্ছলতা অবশ্য নিরবচ্ছিন্ন হল না। সুখের মাঝেও ছোট ছোট কাঁটা ফোটে কেন? হঠাৎ হঠাৎ? রাখীর সঙ্গে বিচ্ছেদটা যদি না ঘটে, তা হলে...? তখন দয়িতার সন্তানের পরিচয় কী হবে? বিজ্ঞানী বোধিসত্ত্ব মজুমদারের অবৈধ...? এ কার অসম্মান? বোধিসত্ত্বর? দয়িতার? না সেই অনাগত সন্তানের? সে যদি তখন দয়িতার দিয়ে তর্জনী তুলে বলে, তোমরা নিজের সুখ খুঁজছিলে বেশ করছিলে, আমায় পৃথিবীতে আনলে কেন? সমাজের তো একটা নিয়ম আছে, আইন আছে...! তুৎ, হু কেয়ারস? দয়িতা কবে সমাজ মেনেছে? আর রাখী তো কনটেস্ট করছেই না, বোধিসত্ত্ব তো বলেই গেল! না জেনেই বলেছে অবশ্য। স্রেফ আন্দাজ। মনে হয় আন্দাজটা সত্যি। না হলে খোরপোশের টাকা প্রত্যাখ্যান করে রাখী? খুব তেজ মহিলার, ভাঙবে তবু মচকাবে না!

পরশু দুপুরে ফোন করেছিল সৌমিক, হাই হ্যালো করছিল, এর পর যেদিন রিং করবে, খবরটা সৌমিককে শুনিয়ে দেবে দয়িতা। যাক, রাখীর কানে পৌঁছে দিয়ে আসুক। মহিলা কি চিড়বিড়িয়ে জ্বলবে? ডিভোর্স হোক আর না হোক, রাখী মোটেই আর বোধিসত্ত্ব মজুমদারের স্ত্রী নয়। আশপাশে পাঁচজন এখন দয়িতাকেই বোধিসত্ত্বর বউ বলে জানে। মিসেস দয়িতা মজুমদার। হ্যাঁ, দয়িতা মজুমদার, দয়িতা মজুমদার...

সে দিন অনেক রাত অবধি এই সব কথাই ভাবছিল দয়িতা। ব্যালকনিতে বসে। মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে, দয়িতার মনও দুলছে বাতাসে। তীব্র সুখে, চোরা উত্তেজনায়, অচেনা কষ্টে। হঠাৎ মার কথা মনে পড়ছে খুব। কে জানে কেন, নিজে মা হচ্ছে বলেই কি? সৌমিক যদি খবরটা পায়, বাড়িতে কি আর জানাবে না? তখন কি ছুটে না এসে থাকতে পারবে বাবা-মা?

ঘরে ফোন বাজছে। বিদেশের কল, রিং শুনেই বোঝা যায়। পড়িমরি করে দৌড়ল দয়িতা।

—হ্যালো? শুয়ে পড়েছিলে নাকি?

—না না, এই একটু ব্যালকনিতে...। দয়িতার গলায় খুশি মেশানো অভিমান,—অ্যাদ্দিন পর আমায় মনে পড়ল? জানো, পাক্কা এগারো দিন বাদে তুমি ফোন করলে!

—সময় পাচ্ছি কই? সক্কালবেলা হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি, ফিরছি সেই রাত্রে। তখন কলকাতায় রাত দুটো তিনটে। বলেছিলাম না, সন্ধে সন্ধে ফিরতে পারলে করব। আজ ফিরেছি...

দয়িতার অভিমান মুছে গেল। কলকল করে উঠেছে,—এই জানো, আমার একটা দারুণ সুখবর আছে।

—আমারও। ইনফ্যাক্ট, সেটা জানাতেই তোমায়...। হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটি চারটে লেকচারের জন্য আমায় কল করেছিল, সেখানে ব্ল্যাকহোলের ওপর পেপারটা পড়লাম। বার্লিনের সেমিনারের চেয়েও এখানে পেপারটা বেশি অ্যাপ্রিসিয়েটেড হয়েছে। রিডসন আর কানিংহাম দুজনেই আমার লেকচার অ্যাটেন্ড করেছিলেন, দুজনেই খুব উচ্ছ্বসিত। বিজ্ঞানী বোধিসত্ত্ব মজুমদারের উৎফুল্ল কণ্ঠ শিশুর মতো উৎফুল্ল,—ওঁরা বলছেন, ক্রিয়েশন অফ ইউনিভার্সের থিয়োরিতে আমার চিন্তা নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। সৃষ্টির আদি মুহূর্তে পৌঁছতে গেলে...

—বুঝেছি বুঝেছি। তুমি বিশ্ব জয় করেছ। এবার আমার খবরটা শোনো। এটাও তোমার সৃষ্টি তত্ত্বে নতুন দিগন্ত...

—আহ, শোনো না সিরিয়াসলি। এখন থেকে আমার কৃষ্ণগহ্বরের তত্ত্বটাকে অস্বীকার করে সৃষ্টির আদি মুহূর্তে কেউ পৌঁছতেই পারবে না। সব চেয়ে বড় সাকসেস, স্ট্রিং থিয়োরির সঙ্গে আমার আইডিয়ার কোনও বিরোধ নেই। আমি ম্যাথমেটিকালি যেভাবে দেখিয়েছি...

—আমার কথাটা তুমি শুনবে না?

—শুনছি। ভাবো তো, স্বীকৃতিটা আমার দায়িত্ব কতটা বাড়িয়ে দিল! স্পেসের কনসেপ্টটা নিয়ে সবাইকে আবার নতুন করে ভাবনাচিন্তা করতে হবে। আমাকেও। রাইনফিল্ড বলছিলেন...

—এই, শোনো না..

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আহ, জ্বালালে। বলো।

—আমি প্রেগনেন্ট।

—হোয়াট? প্রায় চিৎকার ঠিকরে এল ফোনে।

—তোমার বাচ্চা আসছে গো। আমাদের সন্তান।

—ও, নো! ও প্রান্ত কয়েক সেকেন্ডের জন্য নীরব। কয়েক হাজার মাইল দূরত্বের মাঝে নৈঃশব্দ্যের তরঙ্গ ছুটছে। এক সময়ে আবার স্বর শোনা গেল,—আর ইউ শিওর?

—হ্যাঁ। আমি ডাক্তার দেখিয়েছি।...কী, কেমন সুখবর?

আবার ক্ষণিক নীরবতা। তারপর বোধিসত্ত্বর ভারী গলা,—শোনো দয়িতা, আনডিউ কমপ্লিকেশন আমার পছন্দ নয়। তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অ্যাবরশন্ করিয়ে নাও। আমি এ মাসের টোয়েন্টিনাইনথ ফিরছি, তার আগেই...

দয়িতা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। অস্ফুটে বলল,—কেন?

—আহ্। আর কোনও নতুন প্রবলেম ডেকে আনার দরকার নেই। বোধিসত্ত্ব হুকুমের স্বরে বলল,—জাস্ট গেট রিড অফ ইট।

দয়িতার শরীর শক্ত হয়ে গেল। নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। হৃৎপিণ্ডটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে।

মাগোঃ।

উনিশ

—তুই আজ অফিস থেকে ফিরছিস কখন?

—যখন ফিরি। সাড়ে সাতটা, আটটায়।

—অত দেরি? তোর তো ইয়ার এন্ডিং-এর পাট চুকে গেছে! কবিতা ছেলের থালার পাশে মাছের ঝোলের বাটি রাখল। নির্দেশের সুরে বলল,—শোন, আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরবি।

—কেন?

—বলছি যখন, নিশ্চয়ই কারণ আছে।...ফিরলেই দেখতে পাবি।

সৌমিক এতক্ষণে খাওয়া থামিয়ে মুখ তুলেছে। অফিসের তাড়াহুড়োর সময়ে এই সব হেঁয়ালিবাক্য তার মোটেই পছন্দ নয়। হালকা বিরক্তির স্বরে বলল,—ঝেড়ে কাশো তো।

কবিতা সামান্য ইতস্তত করে বলল—আজ জয়শ্রীরা আসবে।

—কে জয়শ্রী?

—তানিয়ার মা।...তানিয়াও আসবে সঙ্গে।

মুহূর্তে সৌমিক পড়ে ফেলেছে কবিতাকে। আবার সেই খেলা! পুতুলনাচ!

রুক্ষ স্বরে বলল,—তোমায় বলেছি না, আমার আর সম্বন্ধ করতে হবে না?

—তুমি বললেই তো হবে না...। কবিতা ডাইনিং টেবিলের উলটোদিকে বসল,—আমার ছেলের ভালমন্দ আমাকে দেখতেই হবে।

—মা! আই ডোন্ট ফিল লাইক ম্যারিইং।

পলক থমকেছিল কবিতা, পলকেই খরখর করে উঠল,—দেখো সমু, কোনও

ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। একটা বজ্জাত মেয়ের নষ্টামির জন্য তুমি শুকিয়ে যাবে, এ আমি হতে দেব না।

—আমি শুকিয়ে যাচ্ছি? স্ট্রেঞ্জ!

—মায়ের চোখকে তুই ফাঁকি দিতে পারবি না। কী চেহারা হয়েছে তোর, ছিঃ। চোখের নীচে কালি, কণ্ঠার হাড় পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, মুখে হাসি নেই, সব সময়ে অ্যাবসেন্ট-মাইন্ডেড ভাব...এ তো আর অনন্তকাল চলতে পারে না।..তা ছাড়া আমারও তো একটা সাধআহ্লাদ বলে কিছু আছে, না কি?

একটা ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হচ্ছিল সৌমিকের মাথায়। তবু নীরবে বসে রইল। অতি কষ্টে। দয়িতার সঙ্গে বিয়েটা ভেঙে যাওয়ার পর প্রথম কটা দিন বেজায় উঠে পড়ে লেগেছিল কবিতা, পারলে তক্ষুনি তক্ষুনি ছেলেকে ছাদনাতলায় পাঠিয়ে দেয়। মাঝে বেশ ঝিমিয়ে গিয়েছিল, এখন আবার নেমে পড়েছে মাঠে। প্রায়শই নতুন নতুন মেয়ের ছবি আসছে বাড়িতে, যখন তখন সৌমিকের সামনে মেলে ধরা হচ্ছে, সৌমিকের অনিচ্ছা উপেক্ষা করেই। এবার কি পাত্রীপক্ষের সশরীরে বাড়িতে আক্রমণ শুরু হল?

নাহ্, আবার একটা যুদ্ধ লড়তে হবে সৌমিককে। কবিতা বসুরায়ের শিক্ষা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

সৌমিকের ক্ষণিক নীরবতাকে বুঝি সম্মতি বলে ধরে নিয়েছে কবিতা। নরম গলায় বলল,—তোর কষ্টটা আমি বুঝি রে সমু। অপমানটা তুই ভুলতে পারিসনি, তাই তো? তানিয়াকে একবার দ্যাখ, ও তোর সব দুঃখ ভুলিয়ে দেবে। এ তোর ওই দয়িতার মতো কাঠ-কাঠ অতিদিগ্‌গজ মেয়ে নয়, অনেক নরম নরম। ঠিক যেমনটি তোর দরকার। চাইলে জিনস পরে তোর পার্টিতেও যাবে, আবার হুকুম করলে তোর পা'ও টিপবে।

সৌমিক বিস্মিত চোখে তাকাল । এই বুঝি আজকাল ভাল বউ-এর কনসেপ্ট? কবিতা আবার বলল,—জয়শ্রী অনেক কড়া ধাতের মেয়ে, মণিদীপার মতো হ্যালহ্যাল ঝ্যালঝ্যাল নয়। মেয়েকে লাই দিয়ে মাথায় তোলেনি জয়শ্রী। আমি তো কথা বলেছি তানিয়ার সঙ্গে...কী সফ্‌ট, কী বিনয়ী, সর্বদা হাসিখুশি। আর রূপ...

—মা তুমি থামবে?

—ঠিক আছে, তুই স্বচক্ষেই দেখে নিস। বাজিয়ে নিস।

আর পারল না সৌমিক, খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়েছে। বেসিন থেকে সোজা নিজের ঘর। প্যান্টশার্ট পরছে, চুল আঁচড়াচ্ছে, ব্রিফকেস গুছিয়ে নিল। তার মধ্যেই শুনতে পাচ্ছে তানিয়া নামের এক অজানা অচেনা মেয়ের রূপ গুণের বিবরণ। বাসুদেবের গলাও যেন কানে এল। কী যেন বলছে কবিতাকে, স্বরে আরও উচ্ছ্বাস বেড়ে গেল কবিতার।

বাড়ি থেকে বেরনোর সময়ে সৌমিক আবার কবিতার কবলে। হাসি হাসি মুখে কবিতা বলল,—তা হলে ক'টার মধ্যে ফিরছিস?

সৌমিকের ঠোঁটের কোণে একটা হিংস্র হাসি উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল। অস্ফুটে বলল, দেখি...

—সাতটা বাজাস না, ওরা কিন্তু এসে যাবে।

হ্যাঁ না কিছুই বলল না সৌমিক। বাতাসহীন বাড়ির বাইরে এসে বড় করে শ্বাস টানল একটা। মুক্তির শ্বাস নয়, যান্ত্রিক দিন শুরু করার আগে অক্সিজেন আহরণ। হাঁটতে শুরু করে ঝলক আকাশ দেখল সৌমিক। কেন যে এখনও ঊর্ধ্বপানে চোখ চলে যায়! আকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ মেঘলা মেঘলা, ফাঁকে ফাঁকে হালকা নীল। গুমোটটা বেড়েছে, বৃষ্টি হবে কি আজ? হলে বেশ হয়, তুমুল বর্ষণে কত দিন ডোবেনি শহরটা। কল্পচোখে বারিধারা দেখতে পেল সৌমিক। থই-থই জল, ঢেউ দুলছে পথে। মৃতপ্রায় সরীসৃপের মতো টলে টলে এগোচ্ছে গাড়িঘোড়া, আর্তনাদ তুলতে তুলতে। ধূসর হয়ে আসা গাছগাছালি ভিজে ভিজে গাঢ় সবুজ, পাতা বেয়ে জল ঝরছে টুপটুপ। ক্রমশ দয়িতার গভীর চোখের মতো সুন্দর হয়ে যাচ্ছে দিনটা...

সৌমিকের পা আচমকা থেমে গেল। সামনে শেয়ার ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষমাণ মানুষের লম্বা কিউ। ঘাড়ের পিছনে অদৃশ্য বুলডগটার গর্জন। ঘাঁউ।

বিকেল চারটে নাগাদ কাজ থেকে মাথা তোলার ফুরসত পেল সৌমিক। এতক্ষণ যন্ত্রগণকের পরদা অবিরাম রঙের হিল্লোল তুলছিল, তাকে নিষ্প্রাণ করে দিয়ে সৌমিক আড়মোড়া ভাঙল কয়েকটা, হাই তুলল, চোখ চালাল এদিক ওদিক। পাশের কিউবিক্‌লে কফিতে চুমুক দিচ্ছে নির্মাল্য, আঙুলের ফাঁকে স্যান্ডউইচ। সঙ্গে সঙ্গে সৌমিকের পেটেও খিদের অনুভূতি। মনে পড়ে গেল আজ টিফিনটাও করা হয়নি।

ক্যান্টিন যাবে, না খাবার আনিয়ে নেবে ভাবতে ভাবতে সৌমিত্র এসেছে পাশের কিউবিকলে। খেতে খেতে কাজ করতে থাকা নির্মাল্য কাজ থামিয়ে ঘুরে তাকাল, আয়, বোস।...আমিই একটু পরে তোর কাছে যেতাম।

নির্মাল্য সৌমিকের চেয়ে বছর তিনেকের বড়, প্রায় একই সঙ্গে এখানে চাকরিতে ঢুকেছে, একটা বন্ধু বন্ধু ধরনের সম্পর্কও আছে।

নির্মাল্য বলল,—স্যাটারডে ইভনিং-এ আমার বাড়িতে চলে আয়।

—কেন? কী আছে?

—ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি। নির্মাল্য কাঁধ ঝাঁকাল,—একটা গেট-টুগেদার মতো করছি। অফিসের জনা পাঁচ-ছয়, আর কয়েকজন ক্লোজ রিলেটিভ।...আসবি তো?

—ও, শিওর। সৌমিক নির্মাল্যর হাতের স্যান্ডউইচের দিকে তাকাল। খিদে বেড়ে যাচ্ছে। আলগাভাবে বলল,—এটা তোদের কত নম্বর অ্যানিভার্সারি যেন? থার্ড?

—ফোর্থ।

—দেখতে দেখতে তোদের বিয়ের চার বছর হয়ে গেল?

—হল না? গুড্ডুরই অগস্টে তিন হবে...কী ফাস্ট যে দিন যায়! এবার ওর স্কুলের জন্য ছোটাছুটি শুরু হবে। দেখি, কোথায় কত ডোনেশান হাঁকছে।

—তুই একেবারে পুরো সংসারী বনে গেছিস!

—না বনে উপায় আছে? একে বলে ঠেলার নাম বাবাজি। বিয়ে-শাদি হোক, তুইও টের পাবি। নির্মাল্য স্যান্ডউইচ শেষ করে হাত ঝাড়ছে,—বাই দা বাই, একটা অ্যাডভাইস দে তো। মানে সাজেশান আর কি!

—কী ব্যাপার?

—মিমিকে কী প্রেজেন্ট করা যায় বল তো?

সৌমিক ফাঁপরে পড়ল। মাথা চুলকে বলল, একটা শাড়ি ফাড়ি দে।

—দূর, ও শাড়ি পরেই না।

—তা হলে সালোয়ার কামিজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আমার সঙ্গে ওর টেস্ট মেলে না।

—ভাল পারফিউম...

—লাস্ট ইয়ারে পারফিউম দিয়েছি। এক জিনিস রিপিট করব?

—তা হলে একটা গয়না-টয়না কিছু...

—একটু আনইউজুয়াল কিছু ভাব না। এমন কিছু যা দেখে চমকে যাবে।

দু-চার সেকেন্ড ভাবল সৌমিক, কিছুই মাথায় এল না। অপ্রতিভ মুখে বলল, ট্র্যাডিশনাল কিছু দে না। বউকে চমকাতে চাইছিস কেন?

—চমকটা খুব এসেনশিয়াল রে। লাইফটা বড্ড ড্র্যাব হয়ে গেছে। দিস চমক উইল রিনিউ দা রিলেশান্‌শিপ।

—সে কী রে? মাত্র চার বছরেই...?

—চার বছর কী কম? হেল অফ আ টাইম।

—তোদের না কোর্টশিপ ম্যারেজ? মাত্র কদিনেই প্রেম উবে গেল?

—তা কেন? প্রেম প্রেমের জায়গায় আছে। কিন্তু রুটিন লাইফ মানেই মনোটনি। নিস্তরঙ্গ। এই অকেশানগুলোকে ঢেউ হিসেবে ইউজ করতে হয়।...নে নে, বল কিছু।

একটু চিন্তা করে ঠোঁট ওলটালো সৌমিক, নো আইডিয়া।

—দূর, তুই একটা যাচ্ছেতাই। ভাবলাম ব্যাচেলারের কাছ থেকে কোনও স্ট্রেঞ্জ টিপস পাওয়া যাবে...। বলতে বলতে হঠাৎ চোখ মুখ উদ্ভাসিত নির্মাল্যর,—আমার একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে।

—কী আইডিয়া?

—যদি মিমিকে একটা কাকাতুয়া উপহার দিই?

—বিবাহবার্ষিকীতে কাকাতুয়া?

—হ্যাঁ, ও তো পাখিটাখি ভালই বাসে।...পেয়ে চমকাবে না! খুশি হবে না? মিমি ভি খুশ, গুড্ডু ভি খুশ...।

সৌমিক হাঁ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। বিবাহবার্ষিকীতে এবার থেকে কি পশুপাখি বিনিময় শুরু হবে? মিমি হয়তো নির্মাল্যকে চমকে দেওয়ার জন্য কোনও কুকুর-টুকুর...লাসা ড্যাশান্ড কিংবা ছোটখাটো নেকড়ে টেকড়ে...! কোনদিকে যাচ্ছে ভালবাসা? সম্পর্ক? একে টিঁকিয়ে রাখতে কী প্রয়োজন উত্তেজনাময় চমকের?

ফোন বাজছে নিজের টেবিলে, দৌড়ে লক্ষ্মণরেখায় ফিরল সৌমিক।

—সৌমিত্র বসুরায় স্পিকিং।

—টিফিন করেছিস সমু?

ওফ, কবিতা বসুরায়! সৌমিত্র সতর্ক স্বরে বলল,—করেছি।

—কী খেলি?

—স্যান্ডউইচ কলা ডিম।

—গুড। টাইমলি ফিরছিস তো?

ফোন রেখে দাঁত কিড়মিড় করল সৌমিক। হুঁহ্, দেখাচ্ছি! থাক বসে। মুনিয়া হল না, এখন তানিয়া! যত্ত সব। এও কি মা'র গুরুদেবের ক্যান্ডিডেট? হতেই পারে। হওয়াই সম্ভব। গুরুদেবের স্যাংশান ছাড়া কি মা নতুন স্যাম্পল এনে ঢোকাবে বাড়িতে? হা হা, লালজিবাবা বলেছিল দয়িতা-সৌমিক রাজযোটক! এখন কী বলছে লোকটা? কঙ্‌খলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসে ঢপের কীর্তন গাইছে, আর ঢুলুঢুল চোখে গঙ্গার শোভা দেখছে? এই তানিয়া সম্পর্কেও নিশ্চয়ই ওরকম একটা কিছু অভিমত দেবে লালজিবাবা? শালা।

পেটে আবার জোর মোচড়। খিদে। বড্ড ঘনঘন খাওয়ার অভ্যেস গড়ে দিয়েছে কবিতা বসুরায়! ক্যান্টিনে গিয়ে আজ ইচ্ছে করেই স্যান্ডউইচ নিল না সৌমিক, টোস্ট আর স্টু খেল। অনেকক্ষণ পর আহার্যের কণা প্রবেশ করছে পেটে, বিচিত্র এক অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে সর্বাঙ্গে। ঝিমঝিমে। মাদক। চোখ জড়িয়ে আসতে চায়। কস্মিনকালে যা করে না সৌমিক তাই করল আজ। কালো কফি খেল এক কাপ। কষটে ভাবটা বেশ লাগল, চনমনে হচ্ছে শরীর।

আবার যন্ত্রমানব হয়ে যন্ত্রগণকের সামনে বসা। বিল ভাউচার সুদের হিসেব। অক্ষরের নড়াচড়া। অনন্ত প্রবহমান সংখ্যার দিকে তাকিয়ে থাকা। বাইরে একটা বিকেল জন্মাচ্ছে, বড় হচ্ছে, মরে যাচ্ছে, কাজে ডুবে আছে সৌমিক। সাতটা অবধি অফিসে থাকতেই হবে আজ। তারপর...? তারপর...?

—আসতে পারি?

সৌমিক চমকে তাকাল। কিউবিকলের প্রবেশ মুখে বাবুয়া!

—আরে আরে, কী খবর? তুমি?

—এলাম। বাবুয়া যেন ঈষৎ আড়ষ্ট,—ডিসর্টাব করলাম?

—না না, সে কী? এসো এসো। সৌমিক হাত বাড়িয়ে সামনের চেয়ারটা দেখাল বাবুয়াকে,—হঠাৎ কোত্থেকে?

—আজ পরীক্ষা শেষ হল...আপনার ব্যাঙ্কের নামটা মনে ছিল...ভাবলাম একটু দেখা করে যাই। অবশ্য আপনাকে পাব ভাবিনি।

—কেন?

—ছটা বেজে গেছে তো।...তাও একটা চান্স নিলাম।

—বেশ করেছ। সৌমিক চেয়ারে হেলান দিল, আমি সাতটা সাড়ে সাতটা অবধি থাকি। বিদেশি ব্যাঙ্ক তো, এখানে দশটা পাঁচটার বাঁধা গত চলে না।...যাক গে যাক, প্রথম দিন আমার অফিসে এলে, কী খাবে বলো?

—কিছু না।

—তা বললে হয়! পরীক্ষা দিয়ে আসছ...

—বিশ্বাস করুন, একটুও খিদে নেই। হল থেকে বেরিয়ে টিফিন করেছি। পেট এখনও গজগজ করছে।

—সত্যি বলছ?

—অপ্রয়োজনে মিথ্যে বলব কেন?

সৌমিক হেসে ফেলল। ছেলেটার এই তীক্ষ্ণ ঋজু ভঙ্গিটা খুব ভাল লাগে তার। খাওয়া নিয়ে পীড়াপীড়ি করল না আর, হালকা গলায় জিজ্ঞেস করল,—তারপর? তোমার পরীক্ষা কেমন হল?

—সো সো।

—কী রকম এক্সপেক্ট করছ?

—ম্যাক্সিমাম ফিফ্‌টি ফাইভ পারসেন্ট।

—বাহ বাহ। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির স্ট্যান্ডার্ডে তো বেশ ভালই।...তা হলে এবার

পার্ট-টু নিয়ে লেগে পড়ো। দ্যাখো, পারসেন্টেজ আরও ওঠানো যায় কিনা।

বাবুয়া ক্ষণকাল চুপ। আলগা চোখ বোলাচ্ছে চতুর্দিকে। হঠাৎই একটু উদাসীন স্বরে বলল,—পার্ট-টু আর দেবই না।

—সে কী! কেন?

—কী হবে? গ্রাজুয়েট তো হয়েই যাচ্ছি। বাবুয়া একটা বড় করে শ্বাস নিল,—আমি এখন চাকরি করতে চাই সৌমিকদা।

বাবুয়ার স্বরভঙ্গি খট করে কানে বাজল সৌমিকের। সৌমিকদা ডাকটাও।

সৌমিক চোখ সরু করে তাকাল,—কী ব্যাপার বলো তো? এখনই চাকরির কথা ভাবছ কেন?

—আমি মাকে নিয়ে আলাদা থাকতে চাই।

সৌমিক সামান্য থমকাল,—মামার বাড়িতে কিছু সমস্যা হচ্ছে?

বাবুয়া একটু সময় নিয়ে বলল,—সমস্যা বলতে আপনি যা ভাবছেন সেরকম কিছু নয়। আমার মামা-মামি মানুষ হিসেবে যথেষ্ট ভাল। আমাকে স্নেহ করেন, মা'র প্রতি রেসপেক্ট আছে, আমাদের যত্নআত্তিও করছেন খুব। তবুও...

—তবু কী।

—ও আপনি বুঝবেন না। আমাদের অবস্থায় তো আপনি পড়েননি! বাবুয়ার গলা খাদে নেমে গেল। হালকা শ্বাস ফেলে বলল,—আফটারঅল আশ্রিতের জীবন...

কথাটা যেন কোনও গোপন তন্ত্রীতে আঘাত করল সৌমিকের। কয়েক সেকেন্ড বাবুয়াকে নিষ্পলক দেখল সে। কয়েকদিন দাড়ি কামায়নি বাবুয়া, অল্পবয়সী মুখে একটা রুক্ষ ভাব ফুটে উঠেছে, কিন্তু চোখের কোণে দুঃখের আভাস, যা ওই তেজীয়ান মুখমণ্ডলের সঙ্গে একেবারে বেমানান। ভেতরে ভেতরে একটা ঝড় চলছে বাবুয়ার, স্পষ্ট বোঝা যায়। এই বয়সেই ঝোঁকের মাথায় উলটোপালটা সিদ্ধান্ত নেয় মানুষ।

সৌমিক নরম স্বরে বলল,—আশ্রিতের জীবন বলছ কেন? মামারবাড়িতে তো তোমার মা'র কিছু ন্যায্য অধিকার আছে, সেই সূত্রে তোমারও।

—অধিকার? বাবুয়ার কণ্ঠস্বর বিষণ্ণ হয়ে গেল,—অধিকার শব্দটা বড় ফাঁপা সৌমিকদা। আমাদের এখন কোথাও কোনও অধিকার নেই।

—এ তোমার অভিমানের কথা। বারাসতের বাড়িতে তোমাদের ডেফিনিটলি রাইট আছে, শেয়ার আছে...

—আমাদের প্রকৃত অধিকারের জায়গাটাই কুটোর মতো ভেসে চলে গেল, এখন মামার কাছে রাইট শেয়ার ফলাব? বাবুয়া জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল, ও আমি পারব না সৌমিকদা।...দেখছি তো, মা সর্বক্ষণ কেমন সিঁটিয়ে থাকে, কাউকে কোনও কথা জোর দিয়ে বলতে ভরসা পায় না...। মামা-মামি কারণে অকারণে বাবার নিন্দে করে, সমালোচনা করে, টিজিং রিমার্ক করে...। করতেই পারে। বাবা যা কাজ করেছে তাতে করাটাই স্বাভাবিক। হয়তো এর থেকে বেশি ঘৃণাই বাবার প্রাপ্য। কিন্তু সেগুলো শুনে মা'র যে মনে কোথায় বাজে...! না সৌমিকদা, আমি আর ওখানে থাকতে পারব না।

বাবুয়ার কথাগুলো বুঝতে চাইছিল সৌমিক। বাবার ওপর বাবুয়ার যতই বিদ্বেষ থাক, বাবার উদ্দেশে ছোড়া কটূক্তিগুলো কোথায় যেন বিঁধছে বাবুয়াকে। বাবার কৃতকর্মের জন্য কি হীনমন্যতায় ভুগছে ছেলেটা? স্বামী গরবে এক সময়ে খুব গরবিনী ছিল রাখী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন স্বামী-পরিত্যক্তা নারী হয়ে ভায়ের বাড়িতে অবস্থান রাখীর কাছে দুঃসহ মনে হতেই পারে।

তবু যেন বাবুয়ার মনোগত বাসনাটাকে সমর্থন করতে পারল না সৌমিক। বলল,—তো কী করতে পার তুমি?

—ওই যে বললাম, মা'কে নিয়ে আলাদা হয়ে যাব, একটা চাকরিবাকরি জুটিয়ে নেব...যেমন করে হোক দাঁতে দাঁত কামড়ে পড়ে থেকে আমি আর আমার মা জীবন কাটাব। এতক্ষণে বাবুয়ার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল,—দেখবেন সৌমিকদা, আমি কিছুতেই হারব না। মাথা তুলে আমি দাঁড়াবই। সাম ডে অর আদার। এই গোটা পৃথিবীটাকে...অন্তত বোধিসত্ত্ব মজুমদারকে বুঝিয়ে দেব, তার কণামাত্র ভিক্ষে ছাড়াই শুদ্ধসত্ত্ব মজুমদার তার মা'কে নিয়ে সসম্মানে বেঁচে থাকতে পারে।

একটু বুঝি চড়ায় উঠে গিয়েছিল বাবুয়ার স্বর, সৌমিক ঝটিতি একবার চারদিকে দেখে নিল। অফিসে লোক কমে এসেছে, বেশিরভাগ কিউবিক্‌লই খালি, যারা আছে কেউই এদিকে তাকাচ্ছে না। ফাঁকা হলঘরে ঠাণ্ডা মেশিনটাকে এখন চড়া লাগে। শীত শীত করছে বেশ। সহসা ফোন বেজে উঠল। অভ্যাসমতো হাত বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল সৌমিক। কার ফোন অনুমান করতে পারছে। বেজে বেজে ক্লান্ত হয়ে এক সময়ে নীরব হল দূরভাষ-যন্ত্র। চোরা স্বস্তি অনুভব করল সৌমিক। বেচারা তানিয়া!

আবার হঠাৎ বাবুয়ার গলা,—কী সৌমিকদা, পারব না আমি? আপনি কী বলেন?

তক্ষুনি তক্ষুনি জবাব দিতে পারল না সৌমিক। এইমাত্র কবিতা বসুরায়ের আহ্বানকে উপেক্ষা করেছে সে, কিন্তু অস্থি মজ্জা মস্তিষ্কে বাসা বেঁধে থাকা সেই কবিতা বসুরায়ই ক্ষণিক কল্পনাবিলাসী সৌমিককে যুক্তি বুদ্ধি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার বোধে বেঁধে ফেলছে এখন।

সোজা হয়ে বসে সৌমিক বলল,—বি প্র্যাক্টিকাল শুদ্ধসত্ত্ব।

—কেন? আমি অবাস্তব কথা কী বলছি? আমি কি একটা চাকরি জোগাড় করতে পারব না?

—তা হয়তো পারবে। কিন্তু কত টাকার? তোমার কোনও কাজের অভিজ্ঞতা নেই, কোনও টেকনিকাল কোয়ালিফিকেশন নেই, পড়াশুনোও করছ জেনারেল লাইনে...। চাকরির যা বাজার, বড়জোর সেলস টেলসে কিছু জুটবে। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে বড়জোর দু চার হাজার। তাতে তোমাদের চলবে?

—চালাতে হবে।

—ভদ্র পরিবেশে এখন একটা ঘরের ভাড়া কত জানো? দুটো মানুষের সংসার চালাতে কত খরচ হয় তোমার আন্দাজ আছে?

—তেমন হলে বস্তিতে গিয়ে উঠব। নুনভাত খেয়ে থাকব।

হুঁহ্, নুনভাত খেয়ে থাকব! দুধেভাতে থাকা ছেলে তো, সত্যি সত্যি নুনভাত খেয়ে থাকা যে কী জিনিস তা জানে না। মা'কে নিয়ে বস্তিতে তুললে একটা ক্যাডাভারাস কাণ্ড হবে, সাত দিনের মধ্যে পালাই পালাই রব তুলবে, কেঁদে কূল পাবে না। ছেলেটা একেবারে পুরো খ্যাপা হয়ে গেছে।

মুহূর্তের জন্য বোধিসত্ত্বের ওপর ভয়ঙ্কর রাগ হল সৌমিকের। কী নিষ্ঠুর লোক! কী অবলীলায় বউ ছেলেকে ভাসিয়ে দিল! দিব্যি সুন্দর একটা বৃত্তাকার জীবন হতে পারত

ছেলেটার, সব কিছু এমন তালগোল পাকিয়ে গেল! শালা বিজ্ঞানী যে কী করে এমন ইর‍্যাশনাল হয়!

নিজেকে সামলে নিয়ে বাবুয়াকে বোঝানোর চেষ্টা করল সৌমিক,—দ্যাখো শুদ্ধসত্ত্ব, মাথাগরম কোরো না, হুইম্‌সে চোলো না। টেক মাই সাজেশান, কটা বছর বারাসতেই দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকো। মনে করো এটা তোমার জীবনভর লড়াই-এর প্রস্তুতি। আলাদা যদি থাকতেই হয়, মামাকে বলে তোমার মা'র অংশ বুঝে নাও, সেখানে স্বাধীনভাবে থাকো।

পরামর্শটা একেবারেই মনঃপূত হয়নি বাবুয়ার। তীব্র দৃষ্টিতে দেখছে সৌমিককে। অস্থিরভাবে বিড়বিড় করে উঠল,—আপনি এ কথা বলছেন সৌমিকদা? আপনি?

—অন্যায় কি বলেছি?

—আপনার কাছে আমি এ কথা শুনব বলে আসিনি। ভেবেছিলাম হয়তো আপনি আমার সিচুয়েশনটা ফিল করতে পারবেন।

বলতে বলতে ঝট করে উঠে দাঁড়িয়েছে বাবুয়া। হনহনিয়ে বেরিয়ে গেল কিউবিক্‌ল ছেড়ে। একটি বারও আর পিছন ফিরে তাকাল না।

সৌমিক মাথা নিচু করে বসে আছে। নিজেকে অপরাধী অপরাধী লাগছে হঠাৎ। চুপচাপ থাকলেই বোধহয় ভাল হত। ছেলেটা কেন এসেছিল সৌমিকের কাছে? চাকরির কথাই পাড়তে এসেছিল? কিন্তু সৌমিকের কাছে কেন? আশা করেছিল সৌমিক তাকে সাহায্য করবে? কেন যে সহসা ঘোর বাস্তববাদী হয়ে উঠল সৌমিক? রোটি কাপড়া মকানের বাইরেও জীবনে তো কিছু আছে, না কী? কুয়াশার ওপারের পৃথিবী। নাহ্‌, বাবুয়ার আবেগকে বোধহয় আর একটু সহানুভূতির চোখে দেখা উচিত ছিল।

ম্রিয়মাণ মুখে লিফট ধরে নীচে নেমে এল সৌমিক। বাইরে এখন গাঢ় সন্ধে। বিশ্রী গুমোট। যানবাহনের কর্কশ ধ্বনি চিরে দিচ্ছে কানের পরদা, বিজবিজ করছে নাগরিক কোলাহল। সৌমিক এখন যাবে কোথায়? কবিতা বসুরায়ের গুহায় ফিরবে? অসম্ভব। কোনও পুরনো বন্ধুর বাড়ি? দীপঙ্কর, শুভ্র কিংবা রাতুল...? ভাল লাগছে না। তা হলে কোথায়?

আকাশকোণে বিদ্যুৎ চমকাল। মনকে যে খাতে ঘোরাতে চায় না সৌমিক, সেদিকেই ঘুরে গেল ভাবনা। দয়িতার কাছে গেলে কেমন হয়? এর মধ্যে দয়িতাকে বার কয়েক ফোন করেছে সৌমিক, দয়িতা একবারও তাকে যেতে বলেনি। শেষ দিন তো ভাল করে কথা পর্যন্ত বলল না। আজ উপযাচক হয়ে বাবুয়ার কথা শুনিয়ে আসবে? বলবে, দ্যাখো, কোন দিকে ঠেলে দিয়েছ একটা ভাল ছেলেকে? রাখীর কথা পাড়তেই সেদিন বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল দয়িতা, বোধিসত্ত্বের ছেলের নাম শুনলেও নিশ্চয়ই অচঞ্চল থাকতে পারবে না! দু-একদিনের মধ্যেই বোধিসত্ত্ব ফিরছে, নিশ্চয়ই খুশিতে দয়িতা ডগমগ, এখন একটু চোনা ফেলে দিলে কেমন হয়! একটু কাঁটা ফুটুক, কেন দয়িতা শুধু অবিমিশ্র সুখ ভোগ করে যাবে!

প্রতিশোধের লিপ্সায় মুহূর্তের জন্য উদ্দীপিত বোধ করল সৌমিক, পরক্ষণে এক চোরা বিষাদ চারিয়ে গেছে বুকে। রক্তের অন্তর্গত এক বিপন্ন বিস্ময়ের অনুভূতি। সুখ নেই, সুখ নেই, দয়িতাকে যন্ত্রণা দিয়ে সুখ নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঋতুচক্র যেন অনেকটাই বদলে গেছে এ বছর। জ্যৈষ্ঠ প্রায় পড়তে চলল, অথচ এখনও একটাও কালবৈশাখীর দেখা নেই। বৈশাখ মাসে বাতাস বেশ শুকনো থাকে, রোদের তাপ গা ঝলসে দেয় বটে, কিন্তু সন্ধে হলেই ভারী মনোরম এক হাওয়াও বয়। এই শহরের নিজস্ব হাওয়া, গঙ্গা নদীর গন্ধ মাখা।

এ বছর সবই কেমন উলটোপালটা। কোথায় গেল ধুলোর ঝড়, কোথায় বা সেই বাতাস, সব যেন নিরুদ্দেশে চলে গেছে। এখন চব্বিশ ঘণ্টাই শুধু উৎকট গরম। থমথমে। প্যাচপ্যাচে। ভ্যাদভ্যাদে। পাখার নীচেও স্বস্তি নেই, ঘাম হচ্ছে অবিরল। বাতাসে এত আর্দ্রতা, অথচ আকাশ ঝকঝকে নীল। এ যেন বৈশাখ নয়, এ যেন নির্মেঘ ভাদ্র।

বদল ঘটে গেছে বোধিসত্ত্বরও। অনেকটাই। অন্তত দয়িতার চোখে। যে মানুষটা কদিন আগে বিদেশ পাড়ি দিয়েছিল, সেও আত্মমগ্ন ছিল বটে, তার কিছুটা পরিচয় দয়িতা আগে পেয়েওছে, কিন্তু বার্লিন-প্রত্যাগত বোধিসত্ত্ব মজুমদার যেন তার চেয়েও অন্য কিছু। নিজের অস্তিত্বের বাইরে গোটা বিশ্ব সম্পর্কেই সে যেন অচেতন এখন। ভীষণ বইকুনো হয়ে গেছে বোধিসত্ত্ব, নিজের গবেষণার বাইরে আর কোনও কিছুতেই সে এখন আগ্রহী নয়।

আগ্রহ নেই দয়িতাতেও। বিন্দুমাত্র না। আজকাল দয়িতার সঙ্গে দিনান্তে একটিও কথা হয় কি না সন্দেহ। বড় জোর খাবার টেবিলে দু-চারটে ছেঁড়া ছেঁড়া সংলাপ। আশ্চর্য, দয়িতার শরীরও যেন আর টানে না বোধিসত্ত্বকে। আগে পড়াশুনোর সময়ে দয়িতা পাশে গিয়ে দাঁড়ালে বোধিসত্ত্ব কাছে টেনে নিত দয়িতাকে, নিজের কাজকর্ম সম্পর্কে বোঝাত, সঙ্গে সঙ্গে চলত লঘু শরীরী খেলা। চুমু খাচ্ছে, তারকার নোভা থেকে সুপার নোভা হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করছে, হাত ঘুরে বেড়াচ্ছে দয়িতার দেহে, কাল্পনিক কালের অস্তিত্ব বোঝাচ্ছে...। ওফ্, সে কী অসহ্য পুলক! দয়িতার শরীর যেন লক্ষ সেতার হয়ে বেজে উঠছে! মাঝে মাত্র কটা দিন তো গেছে, এখন যেন পড়ার ঘরে দয়িতার উপস্থিতিটাও টের পায় না বোধিসত্ত্ব। গভীর রাতে যখন বিছানায় এসে শোয়, তখন যেন পোড়া কাঠ। দয়িতা বেশ কয়েকবার নিজে থেকে এগিয়েছে, নির্লজ্জ হয়েছে, তবু জাগাতে পারেনি বোধিসত্ত্বকে।

মাত্র কদিনেই দয়িতা পুরনো হয়ে গেল?

না কি দয়িতার সন্তান হবে, এই সংবাদটাই নিরুত্তাপ করে দিয়েছে বোধিসত্ত্বকে?

কিংবা দয়িতা সন্তান নষ্ট করবে না জেনে ক্ষুব্ধ হয়েছে বোধিসত্ত্ব?

দয়িতা কোনওটাই পুরোপুরি মানতে পারে না। মানতে ইচ্ছে করছে না দয়িতার।

মাত্র ক'মাসেই বোধিসত্ত্বর কাছে দয়িতার সব রহস্য ঘুচে গেছে, এও কি সম্ভব?

উঁহু, বাচ্চা নষ্ট না করা নিয়ে তেমন ক্ষোভ আছে বলেও তো মনে হয় না। তেমন থাকলে নিশ্চয়ই কোনও না কোনও মুহূর্তে টের পেত দয়িতা। বোধিসত্ত্ব মোটেই আবেগ গোপন করতে পারে না, দয়িতা জানে।

বোধিসত্ত্ব যেদিন বিদেশ থেকে ফিরল, সেদিনই দয়িতা বোধিসত্ত্বর গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল,—অ্যাই, রাগ কোরো না প্লিজ, আমি কিন্তু তোমার কথা শুনিনি।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল বোধিসত্ত্ব,—কী কথা?

—বারে, তুমি আমাকে ফোনে বললে না...? দয়িতা ফিক করে হেসেছিল,—যে আসছে সে আসুক না। আমার খুউব ইচ্ছে করছে...ছেলে হলে কী নাম হবে বাছা শুরু করে দিয়েছি, মেয়ে হলেও।...

বোধিসত্ত্ব নিষ্পলক দেখছিল দয়িতাকে। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়েছিল। শুনেই যে ফোনে অত চিৎকার করল, ঘোর অমত থাকলে মোটেই সে সামনাসামনি ওভাবে চুপ করে যেত না। প্রথম প্রতিক্রিয়ায় নিশ্চয়ই লজ্জা পেয়েছিল বোধিসত্ত্ব। বুড়ো বয়সে বাবা হওয়া বলে কথা! তার ওপর বিচ্ছেদের মামলাটাও এখনও চোকেনি...।

মনে মনে যুক্তি সাজিয়ে মনকে প্রবোধ দিচ্ছে দয়িতা। তার ওপর বোধিসত্ত্বর আকর্ষণ ফুরিয়ে গেছে, এ ধারণাটাই বোধহয় মনগড়া। দয়িতার বোঝা উচিত, তপস্বী যখন ধ্যানে বসে তখন তার আর বাহ্যজ্ঞান থাকে না। বার্লিনের সেমিনার বোধিসত্ত্বকে অনুপ্রাণিত করেছে, প্রফেসর বোধিসত্ত্ব মজুমদার এখন মহাশূন্যে মগ্ন এক পরিপূর্ণ বিজ্ঞানী। হয়তো এই আত্মভোলা দশা এখন চলবে বেশ কয়েক মাস। দয়িতা মিছিমিছি তাল বেতাল ভাবে কেন?

শুধু দয়িতা কেন, কোন জাগতিক ব্যাপারেই কি এখন হুঁশ আছে বোধিসত্ত্বর? কদিন ধরেই ফোন করছিল বোধিসত্ত্বর ভাই, দুম করে একদিন নিজেই এসে হাজির। সল্ট লেকের ফ্ল্যাটে এই প্রথম। আপাত কারণ, বোধিসত্ত্বর একটা দেড় লাখ টাকার ইনশিওরেন্স পলিসি ম্যাচিওর করেছে, কাগজপত্র এসে পড়ে আছে লেক টেরেসের বাড়িতে, ভাই বারবার ডাকা সত্ত্বেও দাদা যাচ্ছে না, তাই ভাই নিজেই এসে...। সম্ভবত শুধু চিঠি পৌঁছে দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল না, দেশে ফিরেও দাদা কেন একবারও ও বাড়ি মাড়াল না তাই নিয়ে কৌতূহল ছিল, অথবা উদ্বেগ। সম্ভবত কেন, তাইই। ওই ভাইকেই বা বোধিসত্ত্ব পাত্তা দিল কই? কী, কেমন আছিস, বাবা মার কী খবর গোছের খানকয়েক উত্তাপহীন প্রশ্ন, ব্যস। বেচারা ভাই আড়ে আড়ে দয়িতাকে দেখতে দেখতে চলে গেল। যেন দয়িতাই বোধিসত্ত্বকে পরিবার সম্পর্কে নিস্পৃহ করে দিয়েছে!

আহা রে, পারলেও দয়িতা তা করবে কেন? ওই বিরাট মাপের মানুষটাকে সে কি অত ক্ষুদ্রতার মাঝে টেনে নামাতে পারে?

এত সব দয়িতা ভাবে বটে, তবুও মনটা কেমন যেন খচখচ করে। করতেই থাকে। ফ্ল্যাটের শব্দহীনতায় কখনও সখনও চোরা গুমসুনির ঘ্রাণ পায় দয়িতা। মনে হয় যেন কোনও এক অজানা সমুদ্রে ঘনীভূত হচ্ছে নিম্নচাপ, দয়িতার অজ্ঞাতেই। যে কোনও মুহূর্তে ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়বে এই সংসারে।

বুক টিপটিপ করে দয়িতার। কেন এত বদলে গেল বোধিসত্ত্ব?

এ কি শুধুই বিজ্ঞানের সাধনা? নাকি অন্য কিছু?

আজকাল কম্পিউটার ফাঁকা পেলেই আঙুল নিশপিশ করে দয়িতার। বোধিসত্ত্ব বিদেশে থাকার সময়ে সে কম্পিউটার শেখার একটা বই কিনেছিল, তাই দেখে দেখে হাত মকশো করছে। ভাল লাগে বেশ, এ যেন এক নতুন ভাষা শিক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য একটা ক্ষীণ আশাও জাগে। গুচ্ছের চাকরির দরখাস্ত ছেড়েছে, কোথায় কখন এই সামান্য জ্ঞানটুকু কাজে লেগে যায়!

আজ কম্পিউটারের ইঁদুরকে ওঠা নামা করাতে করাতে দয়িতা বারবার আনমনা হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ছিল। কদিন ধরে শরীরটা খুব খারাপ যাচ্ছে, গা গুলোনো ভাব বেড়ে গেছে ভীষণ। একটু কিছু খেলেই হড়হড় করে বমি। একবার ডাক্তারের কাছে যাবে কি?

কথাটা মনে হতেই কে যেন বুকের ভেতর বেহালার ছড় টেনে দিয়ে গেল। বোধিসত্ত্বরই তো এ সময়ে দয়িতাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত, নয় কি? কিন্তু সে এক অলীক সম্ভাবনা। দয়িতা বাঁচল কি মরল, সুস্থ না অসুস্থ, খেয়ালই করে না বোধিসত্ত্ব। আজও খাবার টেবিলে বই মুখে বসে ছিল বোধিসত্ত্ব, বেসিনে ওয়াক ওয়াক করছিল দয়িতা, লোকটা একবার চোখ তুলে তাকালও না। দয়িতা আদৌ ডাক্তার দেখিয়েছে কি না, কোনও ওষুধ খাচ্ছে কি না, জিজ্ঞেস করে কখনও? যেচে দয়িতা বলল তো শুনল, ব্যস ওই পর্যন্ত। নাহ্, দয়িতাকে একাই ছুটতে হবে।

পলকের জন্য রাখীকে মনে পড়ল দয়িতার। ছেলে হওয়ার আগে ওই মহিলারও কি এই দশা হয়েছিল? আহা রে বেচারা, এত বছর ধরে ঘর করেছে বোধিসত্ত্বর, না জানি কত কঠিন পথ পার হতে হয়েছে তাকে! তবু সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখতে পারল না!

চোরা বিদ্বেষের বদলে রাখীর ওপর দয়িতার একটু একটু করুণাই জন্মাচ্ছে ইদানীং। কত সেবাযত্ন করেছে, কত খিদমত খেটেছে, সবই বিফলে গেল রাখীর। সৌমিক সেদিন আড়ে ঠারে বোঝাচ্ছিল মহিলার নাকি খুব তেজ...! হয়তো তেজ নয়, হয়তো অভিমান জমে পাথর হয়ে গেছে বুকে! মাত্র কটা দিন তো ঘর করছে দয়িতা, এর মধ্যেই তার হৃদয়েও কি বাষ্প জমেনি?

ভাবনার মাঝেই ডোর-বেল!

ইনস্টিটিউট থেকে ফিরল বোধিসত্ত্ব। মুখমণ্ডলে স্বভাবসুলভ দূরমনস্কতা।

অন্যদিন এ সময়ে বিশেষ কথা হয় না। আজ নিরালা দুপুরের বিষণ্ণতা মুছতে দয়িতা জোর করে একটু উচ্ছল হল। তরল গলায় বলল,—কী স্যার, আজও অফিস কাটলে?

বোধিসত্ত্ব উত্তর দিল না। জুতো ছেড়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকল। শার্ট ছাড়ছে।

পিছন পিছন দয়িতা। ঠোঁট টিপে বলল,—এক্ষুণি কাজ নিয়ে বসবে নাকি? কী বিশ্রী গরম, একটু রেস্ট নিয়ে নাও।

—আমার জিরোনোর সময় নেই। বোধিসত্ত্বর গলা যেন ঈষৎ রুক্ষ,—শুয়ে বসে থাকার জন্য আমি বাড়ি ফিরিনি।

—আহা, আমি কি ওরকম বিশ্রামের কথা বলেছি? দয়িতা মুচকি হাসল,—একটু কথাও তো বলতে পারো আমার সঙ্গে। কিংবা ধরো আমায় কিছুক্ষণ কম্পিউটার শেখালে...। কাছে এগিয়ে বোধিসত্ত্বর বুকে হাত রাখল দয়িতা,—অ্যাই, আমায় একটু ইন্টারনেটের অপারেশনটা দেখিয়ে দেবে?

বোধিসত্ত্ব দয়িতার হাতটা নামিয়ে দিল,—আমার এখন ওয়েস্ট করার মতো সময় নেই।

—বাব্বাহ্, কী রাগ! দয়িতা ভ্রূভঙ্গি করল,—ঠিক আছে, কিচ্ছু শেখাতে হবে না।...চা খাবে? নাকি লেবুর সরবৎ?

—আমি সরবৎ খাই? প্রায় খেঁকিয়ে উঠল বোধিসত্ত্ব,—যদি ইচ্ছে হয় তো চা করো। স্টাডিরুমে দিয়ে যাও।

দয়িতার কেমন অচেনা লাগছিল বোধিসত্ত্বকে। মানুষটার ঔদাসীন্য সে দেখেছে, কিন্তু এত তুচ্ছ কারণে বিরক্তি তার অগোচর ছিল। বোধিসত্ত্ব আজ এত রূঢ় কেন? হলটা কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাথরুম ঘুরে বোধিসত্ত্ব পড়ার ঘরে ঢুকেছে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চা নিয়ে হাজির দয়িতা। টেবিলে কাপ নামাতে নামাতে বলল,—মেজাজ আজ এমন চটিতং কেন? ইনস্টিটিউটে কোনও ঝামেলা ঝঞ্ঝাট হয়েছে নাকি?

জবাব না দিয়ে দয়িতাকে ঝলক দেখল বোধিসত্ত্ব। পরক্ষণেই চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।

—হলটা কী আমায় বলবে তো? দয়িতা নরম গলায় বলল, মনে রাগ পুষে রাখলে নিজেরই পড়া হ্যাম্পার করবে।

বোধিসত্ত্ব এবারও নিরুত্তর। চায়ের কাপ টানল।

—তোমার রিসার্চ নিয়ে কোনও প্রবলেম? দয়িতা আলগা হাত রাখল বোধিসত্ত্বর পিঠে,—কোথাও আটকে গেছ?

অকস্মাৎ চায়ের কাপ রেখে লাফিয়ে উঠল বোধিসত্ত্ব। হনহনিয়ে শোওয়ার ঘর থেকে নিয়ে এসেছে একটা সাদা উইনডো খাম। টেবিলে আছড়ে ফেলে বলল,—এটা কী জানতে পারি?

—কী ওটা? দয়িতা অবাক।

—কিছুই বুঝতে পারছ না? বোধিসত্ত্বর স্বর বেশ চড়া।

খাম খুলে চিঠিটায় চোখ বুলিয়েই খুশিতে চলকে উঠেছে দয়িতা,—ওমা, এ তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার! কী কাণ্ড, চাকরিটা হয়ে গেছে?

বলেই বোধিসত্ত্বর দিকে তাকাল। পড়তে চেষ্টা করল বোধিসত্ত্বকে। মিটিমিটি হেসে বলল,—ও, তোমায় আগে থেকে কিছু জানাইনি বলে? কবে ইন্টারভিউটা দিয়েছি জানো? তুমি ফেরার আগে। গত মাসের সাতাশ তারিখে। চাকরিটা যে আদৌ হবে, আমি কি ভেবেছিলাম?

—চাকরির চেষ্টা করছ, তাও তো কখনও বলোনি?

—অ্যাই, বাজে কথা বোলো না। সেদিন খাবার টেবিলেই তো কথা হচ্ছিল...।

—সে তো কথার ছলে কথা। একটা চাকরি পেলে বেশ হয়...একা একা বাড়িতে বসে থাকতে ভাল লাগে না...! তা বলে তুমি যে সিরিয়াসলি চেষ্টা করছ...

দয়িতা একটু আহত বোধ করল। ভার গলায় বলল, —অত বলাবলির কী আছে? সত্যি তো আমি একা, আমার তো একটা কিছু ইনভলভ্‌মেন্ট লাগবেই। আমার নিজস্ব জগৎ। নিজের জানলা।

—সংসার পড়ে থাকবে, আর তুমি চাকরি করতে বেরিয়ে যাবে? তুমি এ কথা ভাবলে কী করে?

—সংসার সংসারের মতো চলবে, এখানে আমার কী করার আছে?

—নেই?

—অফকোর্স নেই। রান্নাবান্না আমি করে রেখেই বেরোব। নইলে লোক রেখে নেব। বলতে বলতে অজান্তেই চোখ বড় হয়ে যাচ্ছিল দয়িতার, সত্যি সত্যি তুমি চাও না আমি চাকরি করি? মেয়েদের চাকরি করা তুমি পছন্দ করো না?

বোধিসত্ত্ব একটুক্ষণ চুপ। তারপর নীরস স্বরে বলল,—দ্যাখো দয়িতা, আমি পিউরিটান নই। আমি প্র্যাগমাটিক। যে ফ্যামিলিতে মেয়েদের চাকরির প্রয়োজন আছে, সেখানে মেয়েরা চাকরি করুক। আমি তাতে কিছু খারাপ দেখি না। কিন্তু তোমার তো সেরকম অভাবও নেই। নেসেসিটিও নেই। বরং তোমার ঘরে থাকা অনেক বেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জরুরি।

—কেন?

—সবই তোমায় বুঝিয়ে বলতে হবে? তুমি জানো আমি একটা বড় কাজে হাত দিয়েছি। কাজটা আমার পারসোনাল নয়, পৃথিবীর মানুষের জন্য কাজ। এটা আমার মিশান। ফর দিস পারপাস, আমার একজন সর্বক্ষণের সঙ্গী চাই। জাস্ট টু লুক আফটার মি। তুমি নাচতে নাচতে চাকরি করতে বেরিয়ে যাবে, আর আমি হাতের কাছে কাজের জিনিস খুঁজে পাব না...! আমি নিজের কাজের চিন্তা করব, নাকি সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে মাথা খারাপ করব?

দয়িতা ক্রমশ স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছিল। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। বোধিসত্ত্ব তাকে কী ভাবে? দেখাশুনো করার লোক? চাকরানি? সেবাদাসী?

এই প্রথম বোধিসত্ত্বর সামনে কঠিন স্বরে কথা বলল দয়িতা,—অর্থাৎ তুমি চাও আমার নিজস্ব কোনও ভুবন থাকবে না, তাই তো?

—তা কেন? স্বাধীন ভাবে তো অন্য কাজও করতে পারো। যেমন ধরো, ওই যে পপুলার সায়েন্সের বইটা লিখব লিখব করছি, তুমি বসে বসে সেটার খসড়া করো। কাজটা তোমার খারাপও লাগবে না। আফটার অল এটাই তোমার লাইন।

—অর্থাৎ কিনা তোমার গণ্ডি টেনে দেওয়া ঘরেই আমায় থাকতে হবে, তাই তো?

বিদ্রূপটা বুঝি বিঁধল বোধিসত্ত্বকে। তেতে যাওয়া গলায় বলল,—এতে অন্যায়টা কী আছে, শুনি? নিশ্চয়ই টিভি কোম্পানির সেল্‌স অফিসার ট্রেনি হওয়ার জন্য ফিজিক্স নিয়ে এম এসসি পড়োনি?

বোধিসত্ত্বকে এখন আর আত্মভোলা বৈজ্ঞানিক বলে মনে হচ্ছে না। যেন সুচতুর কৌশলী এক অতি সাধারণ পুরুষ। অপযুক্তির সুতোয় বাঁধতে চাইছে দয়িতাকে।

দয়িতার ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেল,—আমি অন্য চাকরি করলে তুমি মেনে নেবে? একটা স্কুলে লিভ ভ্যাকান্সিতে চাকরি পাওয়ার কথা চলছে। কপালে থাকলে পার্মানেন্ট হয়ে যেতে পারি। সায়েন্স টিচার। পেলে করব?

—যা ইচ্ছে করো। বোধিসত্ত্ব দাঁতে দাঁত ঘষছে। বিড়বিড় করে বলল,—আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।

—কী বোঝা উচিত ছিল? তুমি কি ভেবেছিলে আমি তোমার রাখীর মতো ঘরে বসে দিনরাত জাবর কাটব?

মুখটা পলকে পাংশু হয়ে গেল বোধিসত্ত্বর। প্রায় তক্ষুনি চেঁচিয়ে উঠেছে হঠাৎ,—তুমি থামবে? তুমি যাবে এখান থেকে? উইল ইউ প্লিজ লিভ মি অ্যালোন? তোমার যা প্রাণ চায় তাই করো তুমি। আমি তোমাকে আর কিছু বলব না। ঠিক আছে?

কয়েক সেকেন্ড হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে থেকে পায়ে পায়ে বেরিয়ে এল দয়িতা। মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে। শোওয়ার ঘরে এসে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। থিতু করতে চাইছে নিজেকে। ছি ছি, বোধিসত্ত্বর সঙ্গে এই আচরণের কোনও অর্থ হয়? যে লোক চিরকাল সেবা পেতে অভ্যস্ত, দুম করে বউয়ের চাকরি পাওয়া কি সে সহজে মানতে পারে? অন্তত এই বয়সে?

আশ্চর্য, দয়িতা তো নিজেই বোধিসত্ত্বর ছায়ায় থাকতে চেয়েছিল! অথচ আজ যখন বোধিসত্ত্ব তাকে পুরোপুরি নিজের অধিকারে রাখতে চায়, তখন দয়িতা ছটফট করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন? তা ছাড়া শরীরের এখন যা অবস্থা, এক্ষুনি এক্ষুনি চাকরি নিলে কদিন করতে পারবে তার ঠিক নেই, তবে কেন মিছিমিছি ঝগড়াই বা করল?

দুম করে রাখীর কথা তুলে নিজেকেই কি ছোট করল না দয়িতা?

সারাটা বিকেল, সারাটা সন্ধে ধিকিধিকি অনুশোচনার আগুনে পুড়ল দয়িতা। বোধিসত্ত্ব পড়ার ঘরেই রয়েছে, মাঝে মাঝে পর্দার ফাঁক দিয়ে তাকে দেখছিল দয়িতা। ঠিক যেমন ভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখত ক্যাম্পাস টাউনের লাইব্রেরিতে কর্মরত বোধিসত্ত্বকে। রাতের জন্য অপেক্ষা করছিল দয়িতা। ঠিক যেমন ভাবে একা একা প্রতীক্ষায় থাকত বোধিসত্ত্বর। চা দিচ্ছে বোধিসত্ত্বকে, কফি দিচ্ছে, রান্নাবান্না সেরে রাতে খেতেও ডাকল, সবই রুটিন মতো। কিন্তু বোধিসত্ত্বর দিকে সরাসরি চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না দয়িতা। যেন সে বোধিসত্ত্বর সহবাসে অভ্যস্ত রমণী নয়, যেন সে সেই ক্যাম্পাস টাউনের ছাত্রী দয়িতা, বোধিসত্ত্বর চোখে চোখ পড়লে যার বুক থরথর...! এই ফ্ল্যাটের আলোগুলোও বড় বেশি প্রখর আজ, দয়িতার বড্ড নার্ভাস লাগছিল।

মাঝরাত পার করে বোধিসত্ত্ব বিছানায় এল। তখনও দয়িতা জেগে। চরাচর নিঝুম হয়ে গেছে। লবণহ্রদের এদিকটায় প্রচুর গাছগাছালি, মাঝে মাঝে রাতচরা পাখির ডাক শোনা যায়। দয়িতা চোখ বুজে পাখির চকিত ডাক শুনছিল।

পাশে শুয়ে এপাশ ওপাশ করছে বোধিসত্ত্ব। হয়তো গরমে। হয়তো বা কোনও জটিল চিন্তায়।

অন্ধকারে বোধিসত্ত্বর ঘনিষ্ঠ হল দয়িতা। গাঢ় স্বরে বলল,—ঘুম আসছে না?

বোধিসত্ত্ব মৃদু স্বরে কী যেন বলল, দয়িতা বুঝতে পারল না।

ফের বলল,—আমি তোমায় খুব হার্ট করেছি, তাই না? আয়াম সরি। বোধিসত্ত্বর নাকে নাক ঘসল দয়িতা,—তুমি যদি না চাও, আমি চাকরি করব না।

—থাক। বোধিসত্ত্ব একটু যেন সরে গেল,—আমার চাওয়া না চাওয়ার কতটুকু তুমি মানো?

—বারে, আমি তোমার কোন কথা মানি না? আমি বলে তোমার মোস্ট ওবিডিয়েন্ট স্টুডেন্ট! দয়িতা খিলখিল হেসে উঠল। জড়িয়ে ধরেছে বোধিসত্ত্বকে। তরুলতা হয়ে। মহীরুহকে। ফিসফিস করে বলল,—আমায় একটু আদর করো, আমায় একটু আদর করো...।

বোধিসত্ত্ব ছাড়াল না নিজেকে, দয়িতার গায়েও হাত রাখল না। শীতল স্বরে বলল,—শোনো দয়িতা, তোমাকে কতকগুলো কথা বলি। আগেও অনেকবার বলেছি, আবারও বলছি, আমি তোমার থেকে বয়সে অনেক বড়, আমি কোনওভাবেই তোমার ম্যাচ নই। তুমিই আমার ওপর হঠাৎ দুর্বল হয়ে পড়লে। যা সব কাণ্ডকারখানা শুরু করলে তাকে প্রায় পাগলামিই বলা যায়। কথা নেই, বার্তা নেই, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসাও করলে না, দুম করে বাড়িঘর ছেড়ে চলে এলে। আমার কাছে থাকবে বলে। অর্থাৎ সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল প্রায় একতরফাই। তাই এই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে তোমার অনেক দায়িত্ব আছে।

—সম্পর্কটা শুধুই একতরফা ছিল? দয়িতার হাত শিথিল হয়ে গেল,—তুমি আমায় ভালবাসনি?

—হ্যাঁ, উইকনেস আমারও ছিল। আমি তা অস্বীকার করছি না। ইন্ ফ্যাক্ট আমি তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল্যও চুকিয়েছি। ওখানে আমার গবেষণা কত স্মুথলি এগোচ্ছিল। অত দিনের পুরনো পরিবেশ ছেড়ে আমি এক কথায় চলে এসেছি। তোমার জন্য।...জানো, তুমি আমার কাছে আছ বলে যখন চারদিকে ছিছিক্কার পড়ে গেছে, তখন ভাইস চান্সেলার আমায় ডেকে কী বলেছিলেন?...বলেছিলেন, ডক্টর মজুমদার আপনার নামে উড়ো কম্প্লেন আসছে। বুঝতেই তো পারছেন, মরাল টারপিচিউডের কেস, একটা এনকোয়্যারি করার কথা উঠেছে...এখন আপনি যদি শুধু একটা রিটন্ দ্যান...যে মেয়েটি আপনার সঙ্গে বাস করছে সে আপনার আত্মীয়...শুধু পড়াশুনোর সুবিধের জন্যই আপনার কাছে রয়েছে...ব্যস তা হলেই আমি গোটা ব্যাপারটা উড়িয়ে দেব। আপনার মতো প্রফেসারকে আমাদের ইউনিভার্সিটি লুজ করতে চায় না। আপনি প্লিজ...। আমি কিন্তু তাঁর কথায় এগ্রি করিনি দয়িতা। আই টেন্ডারড মাই রেজিগ্নেশান। কারণ মিথ্যাচার আমার স্বভাব নয়। তোমার আমার প্রকৃত সম্পর্কটাকে আমি অন্য কোনও মোড়কে দেখাতে চাইনি। এখানেও তোমায় নিয়ে কে কী ভাবে আমি কেয়ার করি না। একটুক্ষণ অন্ধকার নীরব। তারপর আবার বোধিসত্ত্বর স্বর ফুটেছে। আত্মগত ভাবে বলে উঠল,—তোমাকে আমার কাছে রাখব বলে রাখীকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি। ছেলেকে ত্যাগ করেছি।

—সে তো আমিও সব ছেড়ে...

—ও তো তোমার হুইম্স্। খেয়াল। যেমন এখনও তুমি তোমার খেয়াল মতো চলছ! তোমার কাছে আমার ইচ্ছে অনিচ্ছের কোনও মূল্য নেই।

—তুমি আমায় এত বকছ কেন? চাকরি করতে চাওয়া কী এমন অপরাধ?

—অপরাধ কেন হবে, ওটা আমাকে ডিফাই করার একটা উদাহরণ। তুমি অত্যন্ত অবুঝ। ইনসেন্সেটিভ। ইম্ম্যাচিওর। গোঁয়ার্তুমি করে পেটের বাচ্চাটাকে নষ্ট করছ না। আমার কথা ভেবেছ একবার? আমার তো মনে হয় তুমি বাচ্চাটারও ফিউচার ভাবছ না। তার কী পরিচয় হবে, সমাজে সে কী ভাবে অ্যাক্সেপ্টেড্ হবে...

দয়িতা আহত স্বরে বলল,—যে আসছে সে আমাদের ভালবাসার সন্তান।

—ও সব কেতাবি বুলি ছাড়ো। বি প্র্যাকটিকাল। এটা ইউরোপ আমেরিকা নয়। রাখীর সঙ্গে এখনও আমার ডিভোর্স হয়নি, তাই এক্ষুনি এক্ষুনি তোমায় আমি বিয়েও করতে পারছি না। যদি এই পিরিয়ডে বাচ্চাটা জন্মায়...ছি ছি ছি, আমার তো একটা মানসম্মান আছে! অ্যাট দিস এজ...! শুধু তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম বলে আমায় আরও কত হিউমিলিয়েশান সহ্য করতে হবে, বলো? তুমি আমায় ফোর্স করছ। ব্ল্যাকমেল করছ। আমি ন্যায়ের পথে থাকতে চাই বলে ওই আনওয়ান্টেড চাইল্ডকে আমায় হজম করতে হবে।...এটা কি খুব বাড়াবাড়ি নয়? এবং তারপরও আমি তোমার কাছ থেকে পুরো লয়্যালটি পাব না। যা আমি রাখীর কাছে পেতাম। টোটাল ওবিডিয়েন্স। নিঃস্বার্থ কো-অপারেশান। রাখীরও বিদ্যেবুদ্ধি কিছু কম ছিল না। কিন্তু সে আমার বাইরে নিজস্ব জানলা, নিজস্ব ভুবন এসব কিছু খোঁজেনি।

অন্ধকারকে গাঢ়তর মনে হচ্ছিল দয়িতার। বোধিসত্ত্বর স্বর কী অদ্ভুত রকম আবেগহীন! বিজ্ঞানী নয়, এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুরুষ নির্বিকার ভঙ্গিতে জাহির করছে নিজেকে। দয়িতা আর সহ্য করতে পারছিল না। বুকের মধ্যে দামাল তুফানের দাপাদাপি। দু চোখ ঠিকরে একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছে আগুন আর জল। সরে গেল বোধিসত্ত্বর পাশ থেকে। দেয়ালের দিকে ফিরে শুয়েছে। নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তীব্র যন্ত্রণায় দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে হৃৎপিণ্ড।

পিঠে বোধিসত্ত্বর হাত,—আমার কথা একটু বোঝো দয়িতা। একটু রিয়ালাইজ করার চেষ্টা করো।...এসো কাছে এসো।

দয়িতা ছিটকে সরে গেল,—তুমি আমায় ছোঁবে না। একদম ছোঁবে না।

—আহ্, ছেলেমানুষি কোরো না। বোধিসত্ত্ব বদলে যাচ্ছে দ্রুত। জ্বোরো রুগীর মতো তপ্ত হাতে টানছে দয়িতাকে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল,—অনেক বকেছি, এবার পিস। এসো, আদর করে দিই।

—থাক।

—কেন?

—ভাল্লাগছে না। আমার আদর চাই না।

—কিন্তু আমার যে চাই।

অবিকল কামার্ত বিড়ালের স্বর। গা ঘিনঘিন করে উঠল দয়িতার। বাধাও দিল না, এগিয়েও এল না। নিঃসাড়ে সহ্য করছে যৌন প্রহার।

নিবৃত্ত হল কামনা। ঘুমিয়ে পড়েছে বোধিসত্ত্ব। নীলচে অন্ধকারে দয়িতা বসে আছে নিঝুম। নিজেকে খুঁড়ছিল। সে আদতে কে এখন? একটা মেয়েমানুষ? শুধুই একটা শরীর? যার হৃদয় থাকতে নেই, বোধ থাকতে নেই, নিজস্ব কিছু চাওয়া পাওয়া থাকতে নেই...! এখন থেকে বুঝি অস্তিত্ব বিলোপের সাধনা শুরু করতে হবে!

অজান্তেই দয়িতার চোয়াল কঠিন হয়ে গেল। দু চোখের মণি জ্বলছে আঁধারে।

একুশ

আগামী সোমবার থেকে বোধিসত্ত্বদের ইনস্টিটিউটে একটা সিমপোজিয়াম শুরু হতে চলেছে। বিষয়—মিস্ট্রি অব ইউনিভার্স। তিন দিনের এই আলোচনাচক্র ঘিরে কলকাতার গবেষক মহলে এখন দারুণ আগ্রহ। আসছেন বেশ কয়েকজন নামী বিজ্ঞানী। বাঙ্গালোরের প্রফেসর অনন্ত শাস্ত্রী, দিল্লির প্রফেসর নরেন্দ্র মাথুর, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হরিহরণ...। তবে এঁরা নিতান্তই উপগ্রহ মাত্র, প্রফেসর বোধিসত্ত্ব মজুমদারই এক আলোচনাচক্রের মুখ্য আকর্ষণ। বিদেশে সমাদৃত কৃষ্ণগহ্বরের তত্ত্ব নিয়ে স্বদেশে এই প্রথম তাঁর প্রকাশ্য বক্তৃতা।

ইনস্টিটিউটে নিজের রুমে বসে কাগজপত্র ঘাঁটছিল বোধিসত্ত্ব। বার্লিনে পড়া পেপারটা নতুন করে সাজাচ্ছে, গোছাচ্ছে, আর একটু বিস্তারিত করছে। কাজে মন বসছে না কিছুতেই, চোরা চিন্তারা উঁকি দিচ্ছে ঘনঘন। দয়িতা শেষ পর্যন্ত চাকরিটা নিয়েই নিল? বোধিসত্ত্ব এতবার আপত্তি জানানো সত্ত্বেও? কেন এমন করছে দয়িতা? কী চায়? বোধিসত্ত্ব কি দয়িতার চোখে মূল্যহীন হয়ে গেছে এখন? কিন্তু তা হলে বোধিসত্ত্বর সন্তানকে কেন নষ্ট করল না দয়িতা? মানসিক চাপ তৈরি করার জন্য, যাতে দয়িতাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে বাধ্য হয় বোধিসত্ত্ব? কোনও অজুহাতেই বোধিসত্ত্ব যাতে সম্পর্কটা না ছিঁড়তে পারে তার জন্য একটা পাকাপাকি বন্ধন তৈরি করতে চায়? বোধিসত্ত্ব তাকে পরিত্যাগ করবে, এমন ভাবনাই বা এল কেন দয়িতার? এ কি শুধুই নিরাপত্তাহীনতা? নাকি বোধিসত্ত্বকে অবিশ্বাস? দুটো মানুষের মধ্যে বিশ্বাসের ভিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখনই গড়ে ওঠে, যখন দুজনের মধ্যে সত্যিকারের অন্তরঙ্গতা তৈরি হয়। দয়িতার সঙ্গে কি বোধিসত্ত্বর সেই অন্তরঙ্গতা নেই? যা আছে তবে কি তা শুধুই শরীর? দুটো অসম নারী-পুরুষের কামজ আকর্ষণ? বোধিসত্ত্ব নিজেও কি এখনও সহধর্মিণী হিসেবে ভাবতে পারে দয়িতাকে?

বোধিসত্ত্ব মাথা ঝাঁকাল আপন মনে। সিগারেট ধরিয়েছে একটা। চেয়ার ছেড়ে পায়ে পায়ে জানলায় এসে দাঁড়াল। পিছনে অনেকটা ফাঁকা জমি। গ্রীষ্মের প্রখর তাপে পুড়ছে বন্ধ্যা পৃথিবী। চোখ বুজে ফেলল বোধিসত্ত্ব। মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই, দয়িতা এখনও তার চোখে সেই ছাত্রীই রয়ে গেছে। অথবা তার প্রৌঢ় জীবনের দিকে ধেয়ে আসা এক প্রমত্ত যৌবন। সেই স্বপ্নে দেখা ধুমকেতু। সম্পর্কের এই ফাঁকিটা ধরা পড়ে গেছে বলেই কি এত খেপে গেল দয়িতা? কিন্তু এর জন্য বোধিসত্ত্বকে প্রতি পদে হেয় করে দয়িতার কী সুখ?

—আসতে পারি স্যার?

বোধিসত্ত্ব চমকে ফিরল। শামিম।

লহমায় অধ্যাপকের মুখোশ এঁটে নিয়েছে বোধিসত্ত্ব। চেয়ারে এসে বসল।

স্মিত মুখে বলল,—কখন এলে কলকাতায়?

—এই তো, সকালের ট্রেনে।

—কদিন থাকবে তো এখন?

—হ্যাঁ, নেক্সট উইকটা থেকে যাব ভাবছি। সিমপোজিয়ামটাও অ্যাটেন্ড করব...ঢাকা থেকে আমার আপা আর দুলাভাই এসেছেন, ডাক্তার দেখাতে, ওদের সঙ্গে সঙ্গেও একটু থাকতে হবে...। শামিম চেয়ার টেনে বসল,—আমার পেপারটা পাঠিয়ে দিয়েছি স্যার। ফিজিকাল রিভিউতে।

—গুড। আমার মনে হয় অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যাবে।

—আপনার সঙ্গেও কিছু ডিসকাশন ছিল স্যার।...আপনি যে অলীক সময়ের কনসেপ্টটা নিয়ে আপনার পেপারে আলোচনা করেছেন, ওটা নিয়েই...

—হ্যাঁ বলো। বোধিসত্ত্ব নড়েচড়ে বসল।

—ওর ম্যাথমেটিকাল অ্যাপ্রোচটা একটু অন্যভাবে করা যায় না স্যার? মানে আমি ভাবছিলাম...

টেবিল থেকে কাগজ টেনে নিয়েছে শামিম। খসখস লিখছে। ঝুঁকে দেখল বোধিসত্ত্ব। ছোট্ট একটা মন্তব্য করল। একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে রইল শামিম, আবার মনোযোগী হয়েছে কাগজ কলমে। বেল বাজিয়ে চায়ের অর্ডার দিল বোধিসত্ত্ব, ধীরে ধীরে ডুবছে অনন্ত সময়ে, অলীক সময়ে। প্রশ্ন চলছে, উত্তর চলছে, প্রত্যুত্তর চলছে, কখনও গলা চড়ছে, নামছে, দুজনেরই ক্রমে বাহ্যজ্ঞানরহিত দশা।

হঠাৎ টেবিল থেকে দৃষ্টি উঠেছে বোধিসত্ত্বর। আটকেছে দরজায়। এক অপরিচিত ভদ্রলোক, আড়ষ্ট মুখে দাঁড়িয়ে!

পড়াশুনোর মাঝে ছন্দপতন ঘটলে বিরক্ত হয় বোধিসত্ত্ব, তবু স্বভাবসুলভ ভদ্রতা বজায় রেখে জিজ্ঞেস করল,—বলুন, কী ব্যাপার?

—আপনিই তো প্রফেসর মজুমদার? আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।

—ও। বলুন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভদ্রলোক অস্বস্তি ভরা চোখে শামিমকে দেখল একবার, গলা খাঁকারি দিয়ে বলল,—দরকারটা পারসোনাল।

শামিম ইঙ্গিত বুঝেছে। একঝলক ভদ্রলোককে দেখল, একবার বোধিসত্ত্বকে। তারপর উঠে দাঁড়িয়েছে,—আমি তা হলে এখন চলি স্যার।...কাল ফ্রাইডে, কাল যদি দুপুরের দিকে একবার আসি...

—চলে এসো। আমি এর মধ্যে তোমার আরগুমেন্টটা নিয়ে একটু ভাবি।

শামিম বেরিয়ে যেতেই ভদ্রলোককে ডাকল বোধিসত্ত্ব,—প্লিজ বসুন।

বলতে বলতেই আগন্তুককে জরিপ করে নিয়েছে বোধিসত্ত্ব। মধ্যবয়স্ক, প্রায় তারই সমবয়সী হবে। ঝকঝকে সম্ভ্রান্ত চেহারা, পরনে দামি শার্ট প্যান্ট, মুখের আদল যেন কেমন চেনা চেনা। ঝটিতি মগজের কম্পিউটার হাতড়াল বোধিসত্ত্ব। আদৌ আগে লোকটাকে দেখেছে কি?

ভদ্রলোক বসেছে চেয়ারে, তবে কথা বলছে না। কেমন অদ্ভুত স্থির চোখে দেখছে বোধিসত্ত্বকে। ঈষৎ অস্বস্তিবোধ করল বোধিসত্ত্ব। অজান্তেই সিগারেটের প্যাকেটটা টানল একবার, অজান্তেই সরিয়ে রাখল।

খানিক অধৈর্যভাবেই বলল,—হ্যাঁ বলুন কী বলতে চান?

—আপনি আমাকে চিনবেন না। আমার নাম প্রবীর মিত্র। কথাটা বলে একটুক্ষণ থেমে রইল লোকটা, সম্ভবত বোধিসত্ত্বর মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া ফোটে কি না দেখার অপেক্ষায়। তারপর কেটে কেটে স্পষ্ট উচ্চারণে বলল,—আমি দয়িতার বাবা।

অপ্রত্যাশিত এই চমকের জন্য বিন্দুমাত্র প্রস্তুতি ছিল না বোধিসত্ত্বর। আমূল ঝাঁকুনি খেয়েছে। হতচকিত স্বরে বিড়বিড় করতে পারল শুধু,—ও...আচ্ছা...নমস্কার...বলুন?

—আপনি কি বলার কিছু রেখেছেন?

স্বরটা কি একটু চড়ায় উঠেছিল প্রবীরের? অন্তত বোধিসত্ত্বর তো সেইরকমই মনে হল। অকস্মাৎ টের পেল কুলকুল ঘামছে। নিজেকে ধমকাল বোধিসত্ত্ব। আশ্চর্য, সে কি দয়িতার ধরা পড়ে যাওয়া কিশোর প্রেমিক? লোকটার সামনে কুঁকড়ে থাকার কোনও কারণই নেই।

বোধিসত্ত্ব জোর করে গলায় ভারিক্কি ভাব আনল,—আপনার আসার উদ্দেশ্যটা কিন্তু এখনও জানতে পারিনি।

হঠাৎ যেন ছায়া ঘনাল প্রবীরের মুখে। ঝুঁকেছে টেবিলে।

সামান্য কাতর স্বরে বলল,—আমি শুধু আপনার কাছে একটা কথাই জানতে এসেছি, প্রফেসর। আপনি এত জ্ঞানী মানুষ হয়েও আমার মেয়েটার এই সর্বনাশ করলেন কেন?

—আপনার ল্যাঙ্গোয়েজটা আপত্তিকর মিস্টার মিত্র। বোধিসত্ত্ব চেয়ারে হেলান দিল। স্বর আরও গম্ভীর,—আমি সজ্ঞানে আপনার মেয়ের কোনও ক্ষতি করিনি। আপনার মেয়ে স্ত্রীর মর্যাদায় আমার সঙ্গে বাস করছে।

—স্ত্রীর মর্যাদায়। কিন্তু স্ত্রী হয়ে নয়।

—এটা একটা টেম্পোরারি অ্যারেঞ্জমেন্ট। আমার সঙ্গে আমার স্ত্রীর ডিভোর্সটা হয়ে গেলেই উই উইল গেট ম্যারেড। বোধিসত্ত্ব খানিকটা বক্তৃতার ঢং আনল গলায়,—শুনুন মিস্টার মিত্র, আপনার সোশাল স্ট্যাটাস সম্পর্কে আমার পরিষ্কার কোনও ধারণা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দয়িতা আমাকে কখনও সেভাবে কিছু বলেনি, আমিও জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করিনি। আফটার অল ইটস আ রিলেশন বিটুইন আ ম্যান অ্যান্ড আ উওম্যান। তাদের পরিবার পরিজনরা কখনওই সম্পর্কের ব্যাপারে বিচার্য বিষয় নয়। তবু আমি মোটামুটি অনুমান করে নিতে পারি, যেহেতু আপনি দয়িতার বাবা, আপনি একজন শিক্ষিত স্বচ্ছ মনের মানুষ। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমাদের এই একত্র বসবাস এমন কিছু গর্হিত অপরাধ নয়। এবং বাই ফোর্সও কিছু ঘটেনি। এবং আপনার মেয়ে মাইনরও নয়।

—তবু সমাজের কিছু নিয়ম আছে।

—ঠুনকো নিয়ম। আমি মানি না। বোধিসত্ত্ব মনে মনে যুক্তিগুলো সাজাতে পেরে স্বস্তিবোধ করছিল। সিগারেট ধরাল একটা। কাঠিটা অ্যাশট্রেতে গুঁজতে গুঁজতে বলল,—আরও নিখুঁতভাবে বলতে গেলে, আমরা দুজনেই মানি না।

—শুনেছি আপনার একটি ছেলে আছে। আমার মেয়েরই বয়সী প্রায়। অর্থাৎ আমার মেয়ে আপনার কন্যাসম...

—এর থেকে অনেক বেশি বয়সের ডিফারেন্সে পৃথিবীতে প্রচুর বিয়ে হয়েছে। এবং তার মধ্যে প্রচুর হ্যাপি ম্যারেজও আছে। শেষ কথাটা বলতে গিয়ে একটু বুঝি গলা কেঁপে গেল বোধিসত্ত্বর। আবার গলা কঠিন করে বলল,—তা ছাড়া আমি তো বয়স গোপন করিনি। আপনার মেয়ে সব জেনেশুনেই এই লোকটাকে পছন্দ করেছে।

প্রবীর দু-এক সেকেন্ড চুপ। তারপর বলল, জানতাম। জানতাম আপনি এই কথাগুলোই বলবেন। ইনফ্যাক্ট, এই জন্যই আমি আগে আপনার কাছে আসিনি। আজ কেন যে...! আফটার অল আমি তো বাবা...মেয়েটাকে বুকে করে মানুষ করেছি...আমি ভুলতে পারি না...। প্রবীরের গলা ধরে এল,—আপনি বুকে হাত দিয়ে বলুন তো প্রফেসার, আপনি ন্যায় কাজ করেছেন?

—আমি বিবেকের কাছে কোনও অন্যায় করিনি। আপনার মেয়ে যেভাবে আমার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল, ওকে ফিরিয়ে দেওয়াটাই অন্যায় হত। আর অসম বয়সের কোনও মেয়েকে ভালবাসাটাও অন্যায় নয়।

—বিবেক? আপনি বিবেক দেখাচ্ছেন? প্রবীর সহসা ফুঁসে উঠেছে,—আমার ফ্যামিলিটা যে শ্যাটার্ড হয়ে গেল, তা নিয়ে আপনার বিবেক কিছু বলে না? মুনিয়া...আই মিন দয়িতাকে নিয়ে কত আশা ছিল আমাদের, স্বপ্ন ছিল। ওনলি ফর ইউ...। আপনি কি জানেন শুধু আপনার জন্যই আমার স্ত্রী আজ একজন পার্মানেন্ট হিস্টিরিয়া পেশেন্ট? আমার মেয়েকে নিয়ে চারদিকে হাসাহাসি হয়, আমি প্রাণপণে কান বন্ধ করে রাখি, স্টিল...। আমার মেয়ের পড়াশুনো ঘুচে গেল, কেরিয়ার নষ্ট হয়ে গেল...। কোনও কারণে হয়তো আমার মেয়ের আপনার ওপর দুর্বলতা জেগেছিল, তারই সুযোগ নিয়ে আপনি আমার সরল মেয়েটাকে সিডিউস করলেন! আপনার বিবেক কি এ সব কিছুই দেখে না?

দরজায় টাইপিস্ট ব্রজেন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। পিছনে আর একজন কে যেন। বোধিসত্ত্বর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সরে গেল।

বোধিসত্ত্ব দপ করে জ্বলে উঠল,—আপনি কি আমার বিবেক জাগাতে এসেছেন?

—আমার অত স্পর্ধা কোথায়। আপনি দেশবরেণ্য ব্যক্তি কিংবা বলতে পারেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জগৎবরেণ্য। আপনাদের বিবেকও অন্য ধাতুর। চাইলে নিজের বউকে ছেঁড়া জুতোর মতো ছুড়ে ফেলে অন্য একটা মেয়েকে নিয়ে যথেচ্ছাচার করতে পারেন। হোক না সে মেয়ে আপনার নিজের মেয়ের থেকেও ছোট! আপনাদের সবই মানায়। আপনাদের বিবেক সবই মেনে নেয়। মহৎ লোকদের স্খলন তো তাদের মহত্ত্বেরই লক্ষণ! আপনাদের প্রতিভাই আপনাদের যা খুশি করার লাইসেন্স দিয়ে দিয়েছে! সমাজের থেকে অনেক উঁচু স্তরের মানুষ আপনারা! প্রবীর চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল,—মাপ করবেন, আপনাকে ডিসটার্ব করে গেলাম।...আপনার মেয়ে নেই, থাকলেও হয়তো বুঝতেন না, এই ধরনের ঘটনা আমাদের মতো ঘরোয়া মধ্যবিত্তের কোথায় গিয়ে লাগে।

বোধিসত্ত্ব জোরালো গলায় আর কিছু বলতে পারল না। মিনমিনে স্বরে বলল,—আপনি কিন্তু ওভার ইমোশনাল হয়ে পড়ছেন মিস্টার মিত্র। বি রিজনেবল্। আমি আপনার মেয়ের কোনও ক্ষতি করিনি।

—আর ক্ষতি! আপনি যদি আর একজন কাউকে পেয়ে আজ বাদে কাল ওকেও তাড়িয়ে দেন...ওর ইহকাল পরকাল এমনিই ঝরঝরে হয়ে গেছে। প্রবীর দরজায় গিয়েও কী ভেবে ঘুরে দাঁড়াল। সরাসরি বোধিসত্ত্বর চোখে চোখ রেখে বলল,—আমার মেয়ের ফিউচার কী হবে আমি জানি না। তাতে আমার কিছু যায় আসেও না। প্রতিটি মানুষই তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। আমার মেয়েও করবে। আপনিও।

প্রবীর চলে গেছে অনেকক্ষণ। একের পর এক সিগারেট ধরাচ্ছে বোধিসত্ত্ব, নেভাচ্ছে, আবার ধরাচ্ছে। কপালের দু পাশের রগ দুটো দপদপ করছে। মস্তিষ্কের কোষে অসহ্য জ্বালা। তীব্র অপমান বিষ্ঠার মতো লেগে আছে গোটা গায়ে।

এত কথা তাকে শুনতে হল? দয়িতার জন্য?

কেন প্রবীর নামের লোকটাকে আগেই বেয়ারা ডেকে ঘাড় ধরে বের করে দিল না বোধিসত্ত্ব? পাতলা পার্টিশনের ওপারে অফিসের লোকদের বসার জায়গা, নির্ঘাত ওখানেও সব কথা শোনা গেছে। ছি ছি, কোথায় রইল বোধিসত্ত্বর মানসম্মান?

চুলোয় যাক কাজ। ভরদুপুরে বাড়ি ফিরে এল বোধিসত্ত্ব। শূন্য ফ্ল্যাটে দাপাচ্ছে। গজরাচ্ছে। প্রবীরের পরুষবাক্যে দয়িতার কোনও হাত নেই, এ কথা আর সুস্থ মাথায় ভাবতে রাজি নয় সে। চক্রান্ত, চক্রান্ত, এ সবই দয়িতার হীন চক্রান্ত। আজকের এই পরিস্থিতির জন্য দয়িতাই তো দায়ী। কে তাকে বিয়ে ভেঙে বোধিসত্ত্বর কাছে ল্যাল-ল্যাল করে ছুটে আসতে বলেছিল? বোধিসত্ত্বর শান্তির সংসার ভাঙার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল কে? দয়িতা। দয়িতাই। এখন ওই দয়িতাই তাকে টেনে আরও পাঁকে নামাচ্ছে।

বিনিময়ে যদি দয়িতার নিঃশর্ত আনুগত্যটুকুও পেত বোধিসত্ত্ব! রাখীর রূপযৌবন না থাক, ওইটুকু তো ছিল! আর খিদের মুখে ওই দুটো নারী-শরীরে কতটুকুই বা তফাত!

জামাকাপড় না বদলেই বোধিসত্ত্ব শুয়ে পড়ল বিছানায়। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে, একটু চা খেলে ভাল হত, কে করে দেবে চা? বাথরুমে গিয়ে হড়াস হড়াস জল ঢালতে ইচ্ছে করছে গায়ে, শরীর যদি একটু জুড়োয়, কে গুছিয়ে দিয়ে আসবে তোয়ালে চপ্পল পাজামা? যার কাছ থেকে এই সামান্য সেবা পাওয়ার কথা, তিনি তো এখন আপন ভুবনে বিভোর!

তখনই বোধিসত্ত্বর দু চোখের পাতা জুড়ে হঠাৎ রাখী রাখী রাখী। কী নিস্তরঙ্গ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরুদ্বিগ্ন জীবনটাই না ছিল! অসামান্য নিপুণতায় সংসার ভরিয়ে রেখেছিল রাখী। স্বচ্ছন্দ বাতাস হয়ে মিশে ছিল ঘরের আনাচেকানাচে। তার জায়গায় ওই অবুঝ জেদি দয়িতা? হাহ্।

বোধিসত্ত্বর জন্য প্রবীর মিত্রের মেয়ের নাকি পড়াশুনো ঘুচে গেল! দয়িতার জন্য বোধিসত্ত্বর একমাত্র সন্তানের কেরিয়ার নষ্ট হয়নি? এ সব ক্ষতির হিসেব কে রাখে?

বাইরেও এখন এক তপ্ত রুক্ষ দুপুর। মাঝ আকাশে অতিকায় হাইড্রোজেন গোলার নিউক্লিয়ার ফিউশন নিষ্ঠুর তাপ ছড়াচ্ছে। পৃথিবীর সিলিকেট স্তরে প্রতিফলিত হচ্ছে, বিকিরিত হচ্ছে সেই তীব্র উত্তাপ। ট্রোপোস্ফিয়ারে হাওয়া বইছে এলোমেলো। শুকনো, আগুনমাখা।

ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছিল বোধিসত্ত্বর। অনুশোচনায়। অচেনা কষ্টে। ছটফট করতে করতে উঠে পড়ল, ফ্ল্যাট বন্ধ করে নীচে নেমে এসেছে। কারস্পেসে ঝিমোচ্ছে গাড়ি। বাড়ি পৌঁছেই ড্রাইভারকে ছেড়ে দিয়েছিল, নিজেরও স্টিয়ারিং ধরতে ইচ্ছে করছে না। হনহনিয়ে কম্পাউন্ডের বাইরে এসে বোধিসত্ত্ব দাঁড়াল ক্ষণেক। দ্বিধা সঙ্কোচ কাটিয়ে বিজন রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি ধরেছে।

ভি আই পি রোড ধরে ছুটছে ট্যাক্সি। বারাসতের পথে।

সচেতন মন্থর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামল রাখী। একতলার বৈঠকখানায় ঢোকার মুখে এক পল বুঝি থেমেছিল, পরমুহূর্তে নিজেকে শক্ত করে নিয়ে চৌকাঠ ডিঙোল।

ভাবলেশহীন স্বরে বলল,—তুমি হঠাৎ?

বৈঠকখানার জানলা সব বন্ধ এখন। ছায়া ছায়া ঘরে সোফায় বসে সিগারেট খাচ্ছিল বোধিসত্ত্ব, মাথা ঝুঁকিয়ে। ধড়মড়িয়ে মুখ তুলেছে।

জ্বলন্ত সিগারেট নিভিয়ে দিয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল,—এলাম।

শুধু এই শব্দটুকু শোনার জন্য কত যুগ অপেক্ষা করেছে রাখী! তবু এই মুহূর্তে শব্দটা যেন তেমন অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারল না। বরং কেমন কেজো শোনাল। রাখীর কানের ভুল? নাকি রাখীর মন পাথর হয়ে গেছে?

বোধিসত্ত্ব দেখছে রাখীকে। আধো অন্ধকারে চাহনিটাকে পরিষ্কার পড়তে পারছিল না রাখী। ওই দৃষ্টি এড়াতেই বুঝি জানলা খুলে দিয়ে এল একটা। আলো বাড়ল, সামান্য। স্বস্তিও বাড়ল একটু।

প্রায় স্বাভাবিক স্বরেই রাখী বলল,—অফিস থেকে আসছ?

—হ্যাঁ, মানে...না...মানে বাড়ি থেকেই।

—চা খাবে?

—থাক, তোমায় কষ্ট করতে হবে না।

—আমি কেন কষ্ট করব! শুকনো হাসি ফুটল রাখীর ঠোঁটে, এ বাড়িতে কাজের লোকরাই চা করে।

—ও।...তা হলে বলো।

অন্দরে নির্দেশ দিয়ে ফিরে এসে বসল রাখী। খানিক তফাতে। উলটো দিকের বড় সোফায়।

একটুক্ষণ দুজনেই চুপ। নৈঃশব্দের চাপ বাড়ছে ক্রমশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধিসত্ত্বই বরফ ভাঙল,—বাড়িটা এত সাইলেন্ট কেন? কেউ নেই?

আর কাকে আশা করছে বোধিসত্ত্ব? বাবুয়াকে? রণ্টু মিত্রাদের? মিত্রা অবশ্য সত্যিই নেই, গরমের ছুটি পড়তেই ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি গেছে। রণ্টুর কোর্ট এখনও বন্ধ হয়নি। বাবুয়া ইদানীং দুপুরে বাড়ি থাকে না, আজও বেরিয়েছে রোজকার মতো।

কিন্তু বোধিসত্ত্বকে কেন এত খবর দিতে যাবে রাখী! নীরস গলায় বলল,—তুমি নিশ্চয়ই কাগজপত্র সব পেয়ে গেছ? আমি কিন্তু অনেকদিন সইসাবুদ করে পাঠিয়ে দিয়েছি।

—না না, আমি সে জন্য আসিনি। বোধিসত্ত্ব তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—জাস্ট তোমরা কেমন আছ দেখতে...আই মিন এমনিই।

রাখীর বিশ্বাস হল না। অমন মুখ কালো করে তাদের দেখতে এসেছে বোধিসত্ত্ব? বিদেয় করা বউ-ছেলেকে? হুঁহ্। তাও যদি না সে মানুষটাকে হাড়েমজ্জায় চিনত! যেটুকু চেনার বাকি ছিল তাও তো চিনিয়ে দিয়েছে। নির্ঘাত বিবেকের তাড়নায়...! উঁহু, বিবেক নয়। অহং। এতটুকু না কেঁদে রাখী ডিভোর্স দিয়ে দিচ্ছে, খোরপোশ প্রত্যাখ্যান করেছে, ভাইকে বার বার পাঠিয়েও বাবুয়াকে কবজা করতে পারল না বোধিসত্ত্ব...মানী লোকের মানে তো লাগবেই!

রাখী স্থির চোখে তাকাল,—কেস কবে নাগাদ কোর্টে উঠছে?

—ঠিক জানি না। বোধিসত্ত্বর গলা ঝপ করে নেমে গেল,—লইয়ারকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

—আমার নিশ্চয়ই কোর্টে যাওয়ার দরকার নেই।

বোধিসত্ত্ব উত্তর না দিয়ে চুপ মেরে গেল। ভাবছে কী যেন। সিগারেট ধরাল আর একটা। তামাকের ধোঁয়া পাক খাচ্ছে ফ্যানের হাওয়ায়। ক্ষণিক দুলেই পলকে হারিয়ে যাচ্ছে নীলচে ঘূর্ণি। গন্ধটা তবু রয়ে যায় বাতাসে। উগ্র কটু ঘ্রাণ।

হঠাৎই বোধিসত্ত্ব বলে উঠল,—একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

রাখীর ভুরু জড়ো হল।

—তুমি কি এখনও আমার ওপর...?

রাখীর ভুরুর ভাঁজ আরও ঘন হল।

—বিশ্বাস করো, তখনকার পরিস্থিতির ওপর আমার কোনও কন্ট্রোল ছিল না। রাদার আমি নিজেই পরিস্থিতির শিকার। আমি কখনও তোমায় অপমান করতে চাইনি। আমি চেয়েছিলাম ব্যাপারটার একটা সম্মানজনক সমাধান হোক। উইদাউট হার্টিং এনিওয়ান।

কী বলতে চায় বোধিসত্ত্ব? দুজন মেয়েমানুষ নিয়ে একসঙ্গে ঘর করার ইচ্ছে ছিল নাকি? রাখী সেটা বাধ্য স্ত্রীর মতো মেনে নিলে সম্মানজনক সমাধান হয়ে যেত? ইট কাঠ পাথরের মতো রাখী জীবনযাপন করেছে ঠিকই, কিন্তু সত্যি সত্যি সে তো ইট কাঠ পাথর নয়! বোধিসত্ত্ব কি ভুলে গেছে সেই রাতে রাখীকে সে কী কী কথা বলেছিল?

রাখী সোজাসুজি তাকাল,—হঠাৎ এ সব কথা উঠছে কেন?

—ওঠা উচিত নয়, আমি জানি। বোধিসত্ত্ব বড় করে শ্বাস ফেলল,—যাক গে, ছাড়ো। তুমি এখন আছ কেমন?

—কেমন থাকব বলে তুমি আশা করেছিলে? সহসা বুক মুচড়ে ওঠা কান্নাটা হাসি হয়ে ঠিকরে এল রাখীর গলা থেকে,—ভাল আছি, খুব ভাল আছি। রণ্টু আমায় মাথায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে রেখেছে।

—হ্যাঁ, রণ্টু তোমায় খুব রেসপেক্ট করে।

রাখী মনে মনে বলল, করেই তো। রণ্টু তো চেয়েছিল কোর্টে দাঁড়িয়ে তোমায় লেজেগোবরে করতে, নেহাত এই বয়সে লোক হাসাতে চাইনি বলেই না রণ্টুকে জোর করে আটকেছি!

চা এসে গেছে। সঙ্গে হালকা জলখাবার। ফ্রেঞ্চ টোস্ট, সন্দেশ। রাখী সেরকমই বলে এসেছিল ভেতরে।

বোধিসত্ত্ব আমতা আমতা করে বলল,—এ সব আবার কেন? শুধু চা হলেই তো হত।

এত তিক্ততার মধ্যেও সত্যি কথাটা বেরিয়ে এল রাখীর মুখ থেকে,—তোমার খিদে পেয়েছে, আমি মুখ দেখেই বুঝতে পারছি।

বুঝি ঈষৎ চমকাল বোধিসত্ত্ব। মাথা নামিয়ে চায়ের কাপপ্লেট তুলে নিয়েছে হাতে। অস্পষ্ট স্বরে বলল,—ফিউচার নিয়ে কিছু ভেবেছ?

—কার ফিউচার?

—তোমার।

—আপাতত তো এখানেই আছি। বাবুয়ার একটা চাকরির কথা চলছে, হয়ে গেলে তখন হয়তো বাবুয়া আমায় বাড়ি ভাড়া করে কলকাতায় নিয়ে যাবে।

—বাবুয়া সত্যিই আর পড়াশুনো করবে না? তুমি ওকে বোঝাও...

রাখী সঙ্গে সঙ্গে কথাটার জবাব দিল না। ছেলেকে সে কম বোঝায়নি, রণ্টু প্রচুর রাগারাগি করেছে, কিন্তু বাবুয়া অনড়। হয়তো বোধিসত্ত্বর ছেলে বলেই এত একরোখা হয়েছে বাবুয়া।

একটু চুপ থেকে রাখী শীতল স্বরে বলল,—যে ছেলেকে একুশ বছর বয়সে মায়ের দায়িত্ব নিতে হয়, তার আর পড়াশুনোর বিলাসিতা সাজে না।

বোধিসত্ত্বর মুখ লাল হয়ে গেল,—এ তো অন্যায় জেদ। তোমরা দুজনেই তোমাদের গোঁ ধরে থাকবে...

—থাক। ন্যায় অন্যায়ের কথা তোমার মুখে নয় নাই শুনলাম। রাখীর ঠোঁট বেঁকে গেল,—আমাদের মতো সামান্য মানুষদের নিয়ে চিন্তা করছ কেন? তোমার কথা বলো। আছ কেমন?

বোধিসত্ত্ব নীরব হয়ে গেল। বেশ খানিকক্ষণ পর মাথা নাড়ছে দু দিকে,—জানি না।

—সে কী? রাখীর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল,—এর মধ্যেই ইন্টেলেক্টের খিদে মিটে গেল?

বোধিসত্ত্ব অসহায় মুখে তাকাল,—তুমি এখন টিজ করবে, আমি জানি।...সত্যি আমি কী করব বুঝতে পারছি না। আই নিড ইওর সাজেশান।

—আমার? রাখী প্রচণ্ড অবাক। ক্ষোভ অভিমান ছাপিয়ে কৌতূহল জাগছে। বোধিসত্ত্বর কি তবে চোখ ফুটল? রাখীর কাছে ফিরতে চায়? বুকে ঢেঁকির পাড় পড়ছে। তবু যথাসম্ভব স্বর নির্লিপ্ত রেখে বলল,—কী হয়েছে?

—আমার সমস্যাটা একমাত্র তুমিই বুঝতে পারবে।...ও এত ছেলেমানুষ, ম্যাচিওরিটি আসেনি, সাংসারিক সেন্সও সেভাবে গ্রো করেনি...আমি যে এখন ওকে নিয়ে কী করি...! জানো, এর মধ্যে আবার ও প্রেগন্যান্ট হয়ে বসে আছে। কত বার করে বললাম, নষ্ট করে দাও...এত অ্যাডামেন্ট মেয়ে...!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখী সম্পূর্ণ বোবা হয়ে গেল। এই মানুষটা দেবতা, না দানব? অসঙ্কোচে ওই কথা সে তার সামনে উচ্চারণ করে কী করে? সহসা যেন মনশ্চক্ষে দয়িতাকে দেখতে পেল রাখী। এই মুহূর্তে আর ঈর্ষা নয়, কেমন যেন করুণা জাগছে মেয়েটার ওপর। ওই মেয়েটার কাছেও আপনভোলা বিজ্ঞানীর আত্মসর্বস্ব ক্রূর রূপটা ধরা পড়ে গেছে, মাত্র ক মাসের মধ্যেই? বেচারা।

রাখী ভার গলায় বলল,—কেন বাচ্চা নষ্ট করবে? শুধু প্রেম করেই দায়িত্ব খালাস হয়ে যাবে তোমার?

—কিন্তু এই বয়সে...! তা ছাড়া তুমি তো জানো, ও সব ঝামেলা টামেলা আমার পোষায় না। আমার হাতে এখন কত কাজ, সো মেনি থিংস টু ডু...

—বুলি কোপচিও না। রাখীর গলা চড়ে গেল,—সত্যি করে বলো তো তুমি কী চাও? তুমি কি এক্সপেক্ট করছ, আমি মেয়েটাকে গিয়ে বোঝাব যাতে সে বাচ্চাটাকে নষ্ট করে ফেলে? আশ্চর্য!

বোধিসত্ত্বর মুখ কেমন করুণ হয়ে গেছে। ফ্যাসফেসে গলায় বলল,—না মানে...আমি সত্যিই খুব অশান্তির মধ্যে আছি।

—এ তো তোমারই ডেকে আনা অশান্তি। নিজের পাতা ফাঁদে নিজেই পড়েছ, এখন আঁকুপাঁকু করলে চলবে কেন?

খানিকক্ষণ পাথরের মতো বসে থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল বোধিসত্ত্ব। জীবন্ত দীর্ঘশ্বাসের মতো হাঁটছে। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

নিচু গলায় বলল,—আমি কি মাঝে মাঝে তোমার কাছে আসতে পারি রাখী? তুমি যেমন খুশি বিহেভ কোরো, যত খুশি অপমান কোরো, তবু...

—না। কক্ষনও না। আমার ছেলে যাকে ঘৃণা করে এমন মানুষের আমি মুখ দেখতে চাই না।

বোধিসত্ত্ব ঘাড় নিচু করে বেরিয়ে যাচ্ছে। কী রুগ্ণ লাগছে লোকটাকে, সাত বুড়োর এক বুড়ো বলে মনে হচ্ছে। এত চেহারা খারাপ হয়ে গেল কেন? মেয়েটা কি একটুও যত্নআত্তি করে না?

হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল রাখী। বোধিসত্ত্বর ঘর ছাড়ার পর এই প্রথম। মানুষটাকে প্রাণ ভরে কথা শোনানোর সুপ্ত বাসনা চরিতার্থ হয়েছে আজ, তবু হৃদয়ে এতটুকু জয়ের উল্লাস নেই। জমে থাকা রাগ অভিমান যন্ত্রণা গলে গলে পড়ছে দু চোখ বেয়ে।

এখনও বোধিসত্ত্ব এই পৃথিবীতে তাকেই একমাত্র আপন ভাবে? শুধু তার কাছেই মনের কথা বলতে ছুটে আসে?

কেন? কেন? কেন?

এক গাঢ় অবসন্নতা গ্রাস করে ফেলছিল বোধিসত্ত্বকে। বারাসত থেকে ফিরে কিছুক্ষণ মড়ার মতো শুয়ে ছিল বিছানায়, তারপর উঠে স্টাডিরুমে ঢুকেছে। সামনে নিথর কম্পিউটার, বই কাগজের স্তূপ, বসে আছে তো বসেই আছে। দৃষ্টি শূন্য, মগজ ফাঁকা, বয়ে যাচ্ছে সময়। দয়িতা ফিরল অফিস থেকে, ঘরের কাজকর্ম সারছে, রান্নাবান্না করল, কালো কফি দিয়ে গেল বোধিসত্ত্বকে, কথাও বলল টুকটাক, কিন্তু বোধিসত্ত্ব যেন বোধিসত্ত্বতেই নেই আজ। দয়িতার কথার উত্তরে হুঁ হ্যাঁ করে গেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু।

রাত বাড়ছে।

নীরবে খাওয়াদাওয়া সারল বোধিসত্ত্ব। ইদানীং দুজনের কথাবার্তা কমই হয়, দয়িতাও সেভাবে লক্ষ্য করেনি বোধিসত্ত্বকে। কথা বাড়ালেই যেখানে বাদানুবাদ হয়, সেখানে নীরবতা অনেক স্বস্তির।

বেসিনে হাত ধুয়ে বোধিসত্ত্ব আর ঘরে গেল না, ব্যালকনিতে এসে বসেছে। সিগারেট ধরাল। বাতাস এখনও ঠাণ্ডা হয়নি, ছোট ছোট ঝাপটায় জ্বালা জ্বালা করছে গা। দূরে বাড়িঘরের আলোর দিকে তাকিয়ে আছে বোধিসত্ত্ব। অনেকটা নিচু দিয়ে একটা প্লেন উড়ে গেল। উড়োজাহাজের আলো জ্বলছে নিভছে।

বোধিসত্ত্বর বুক বেয়ে একটা লম্বা শ্বাস গড়িয়ে এল। অনুচ্চ স্বরে ডাকল,—দয়িতা?

দয়িতা টিভি দেখছিল। সাড়া দিয়েছে,—বলছ কিছু?

—হ্যাঁ। শোনো একটু।

ব্যালকনির দরজায় এল দয়িতা। ব্যালকনির ছোট্ট দোলনাটা হাতের ইশারায় দেখাল বোধিসত্ত্ব,—বোসো। কথা আছে।

দয়িতার চোখ ছোট হল,—খুব জরুরি কথা? সময় লাগবে?

—হুঁ।

—তা হলে এক সেকেন্ড ওয়েট করো। আমি ভিটামিনটা খেয়ে আসি।...খেয়ে উঠেই খাওয়ার কথা, কালও ভুলে গেছি।

ছোট্ট একটা পিন ফুটল বোধিসত্ত্বর বুকে। ইচ্ছে করেই কি এ সময়ে ভিটামিনটার কথা তুলল দয়িতা? নিজে নিজে ডাক্তার দেখায়, শরীরস্বাস্থ্য এখন ঠিক রাখার জন্য তাকে ওষুধ দেওয়া হয়েছে, সচেতনভাবেই ট্যাবলেটের স্ট্রিপগুলো ড্রেসিংটেবিলে ছড়িয়ে রাখে। যেন প্রতি পলে বোধিসত্ত্বকে মনে করিয়ে দিতে চায় সে কত দায়িত্বজ্ঞানহীন! মানুষ যে কত বিচিত্রভাবে ঘনিষ্ঠ জনকে আহত করতে পারে! বোধিসত্ত্ব কী করে প্রমাণ করবে সে হৃদয়হীন নয়?

প্রমাণ করার দায়ও আছে কি বোধিসত্ত্বর?

ওষুধ খেয়ে এসে দোলনায় বসেছে দয়িতা। দুলছেও যেন মৃদু মৃদু। দুলছে? সত্যিই দুলছে? নাকি বোধিসত্ত্বর চোখের ভুল?

বোধিসত্ত্ব স্বাভাবিক স্বরে জিজ্ঞেস করল,—তোমার অফিস চলছে কেমন?

দয়িতা বুঝি চমকাল একটু। বলল,—মন্দ কী!

—কাজটা ভাল লাগছে?

—ঠিকই আছে। ট্রেনিং পিরিয়ড তো, খাটাচ্ছে খুব।

—অফিসে জানিয়েছ তুমি প্রেগন্যান্ট?

—জানাব। আর কটা দিন যাক।

—পরে ছুটি টুটি পেতে কোনও প্রবলেম হবে না তো?

—দেখি কী হয়! পরের কথা পরে ভাবব।

—তোমার এক্সপেক্টেড ডেট কবে?

—টোয়েন্টি সিক্সথ নভেম্বর।

—ও। তা হলে তো অনেকটাই দেরি আছে।...এই অফিসে তোমায় স্যালারি-ট্যালারি

তো ভালই দেবে, তাই না?

—হঠাৎ এ সব প্রশ্ন? দয়িতা সোজা হয়ে বসল,—ঠিক কী জানতে চাও বলো তো?

বোধিসত্ত্ব একটুক্ষণ নীরব। তারপর জোর করে হাসি ফুটিয়েছে মুখে,—শোনো, তোমায় কতকগুলো প্র্যাক্টিকাল কথা বলি। রিগার্ডিং মাই ওয়ার্ক। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, তোমাকে বলেছিলাম প্রফেসার রিড্‌সন আমার লেটেস্ট কাজটাকে খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করেছিলেন? উনি আমাকে একটা অফারও দিয়েছিলেন। টু জয়েন হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটি। সঙ্গে সঙ্গে প্রোপোজালটা অ্যাকসেপ্ট করিনি...কিন্তু কথাটা কদিন ধরে ভাবছি খুব। এখানে, আই মিন ইন্ডিয়ায়, আমার কাজের প্রোগ্রেস মোটেই স্মুথ নয়। ওখানে গেলে আমি বেশ কয়েকজন সমমনস্ক বিজ্ঞানী পাব। উই ক্যান ওয়ার্ক টুগেদার, কন্টিনিউয়াসলি মত বিনিময় করতে পারব, বেশ কয়েকটা অবজার্ভেটরি থেকে স্টেডি ফ্লো অব ডাটা থাকবে, গবেষণার ছোটখাটো বাধাগুলো পেরিয়ে যেতে আমার অনেক সুবিধে হবে...

—তুমি কি চলে যেতে চাইছ? দয়িতার গলা দুলে গেল।

—মনে হচ্ছে যেতেই হবে। বোধিসত্ত্ব মাথা নাড়ল,—তুমি তো জানো দয়িতা, আমার লাইফের একটাই মিশন। সৃষ্টির রহস্য জানা। বোঝা। মানুষকে তা জানানো।...আমাদের জীবনের স্প্যানটা এত ছোট! এতগুলো বছর চলে গেছে, আর কদিনই বা বাঁচব...

বোধিসত্ত্বর আবেগটা বুঝি স্পর্শ করেছে দয়িতাকে। আরও মৃদু স্বরে বলল,—বেশ তো। যাও না।

—কিন্তু তুমি?

—তুমি কি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও না?

—ইচ্ছে হলে যেতে পারো। তবে আমি তোমায় ফোর্স করব না। তুমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন।...তুমি যদি এখানে থেকেও যাও, আমি তোমার সবরকম বন্দোবস্ত করে যাব। টাকা পাঠাব রেগুলার...তোমার জন্য...যে আসছে তার জন্য...

দয়িতার চোখ এতক্ষণ বোধিসত্ত্বতে স্থির ছিল, সহসা দৃষ্টি ঘুরে গেছে ব্যালকনির বাইরে। হিম গলায় বলল,—তোমার অসীম মহানুভবতা।

—ওভাবে বলছ কেন? তোমার দায়িত্ব যখন নিয়েছি এটা তো আমার কর্তব্য। বোধিসত্ত্ব আর একটা সিগারেট ধরাল। আস্তে ধোঁয়া ছেড়ে বলল,—তুমি তোমার বাপেরবাড়ি গিয়েও থাকতে পারো।

—বাপেরবাড়ি? দয়িতার গলা উঠল সামান্য,—আমার তো কোনও বাপেরবাড়ি নেই!

—এ তোমার অভিমানের কথা। তাঁরা তোমার জন্য এখনও খুবই কনসার্নড।

—তাই নাকি?

—হুঁ।...তোমার বাবা আজ আমার অফিসে এসেছিলেন।

—বাবা? দয়িতা ঝটিতি ঘাড় ঘুরিয়েছে।

—হ্যাঁ। তুমি ওখানে গেলে তাঁরা খুশিই হবেন। বলেই নিজেকে সংশোধন করে নিল বোধিসত্ত্ব,—মানে...মেয়েরা তো এ সময়ে বাপেরবাড়িতে গিয়েই থাকে।...তুমি ভেবো না, আমি নিয়মিত তোমার খোঁজখবর নেব।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দয়িতা শেষ কথাটা যেন শুনতেই পেল না। তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করল,—বাবা তোমায় বলল আমি ওখানে গেলে তারা খুশি হবে?

—না, তা নয়...তবে আমার মনে হল...মানবচরিত্র আমি একটু-আধটু বুঝি দয়িতা। তোমাকে একবার চোখের দেখা দেখলে তাঁদের রাগ অভিমান সব ধুয়ে যাবে।

দয়িতা এক লহমা নিষ্পলক। পরক্ষণেই হাসতে শুরু করল। হাসছে, হাসছে...। খিলখিল হাসিতে লুটিয়ে পড়ছে। কিশোরীর চপল হাসি ক্রমশ বদলে যাচ্ছে উন্মাদিনীর খলখলে। এক সময়ে বুঝি হাসি শান্ত হল, লাল হয়ে গেছে দয়িতার মুখ। হাঁপাচ্ছে।

দম নিতে নিতে বলল,—আমার একটা কথার জবাব দিতে পারো? তোমার এখনও ডিভোর্স না হওয়া বউ তোমাকে এত বছর ধরে সহ্য করেছিল কী করে?

বাক্যটা শিসের গুলির মতো কানে বিঁধে গেল বোধিসত্ত্বর। কী তীব্র মর্মভেদী দৃষ্টি হানছে দয়িতা, যেন লেজার বিমে পুড়িয়ে দিচ্ছে বোধিসত্ত্বর হাড়পাঁজর! ওইটুকুন মেয়ের চোখে চোখ রাখতে পারল না বোধিসত্ত্ব, মাথা নামিয়ে বসে আছে বিমূঢ়।

দয়িতা চলে গেল ঘরে, ঈষৎ স্খলিত পায়ে। একটু পরে ক্ষীণ একটা শব্দ কানে এল বোধিসত্ত্বর। কাঁদছে কি দয়িতা? উঠে দেখতে বোধিসত্ত্বর সাহস হল না।

মধ্যরাত গড়িয়ে গেছে বহুক্ষণ।

হাওয়া বইছে মৃদু মৃদু। পৃথিবী এখন অনেক শীতল। চাঁদ উঠেছিল, ডুবে গেছে। লবণ হ্রদের পথবাতিরা ঝিমোচ্ছে এখন। নিশাচর পাখিরা ডেকে উঠছে হঠাৎ হঠাৎ, অনেকটা দূর থেকে। অন্ধকারে কৃষ্ণচূড়া ফুল জ্বলছিল ধিকিধিকি, কালচে আগুনের মতো।

বোধিসত্ত্ব স্টাডিরুমে। ইজিচেয়ারে। ভারী চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায় মাঝে মাঝে, চমকে চমকে খুলে যায়। ছেঁড়া ছেঁড়া তন্দ্রায় ধূমকেতুর স্বপ্নটা আসছে ঘুরেফিরে। সেই ধূমকেতু যে আছড়ে পড়েছিল নক্ষত্রের গায়ে। কী প্রবল বিস্ফোরণ! তালা লেগে যাচ্ছে কানে, মাথা ঝিমঝিম করছে।

ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বোধিসত্ত্ব। অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে পায়ে পায়ে বাথরুমে। আলো জ্বালল, মুখ দেখছে আয়নায়। সে তো সেই একই মানুষ আছে, তবু তাকে অন্যরকম ভাবে কেন দয়িতা? অথবা রাখী? কেন তারা তাকে দেবতা ভেবেছিল? কেনই বা সে এখন দানব তাদের চোখে? সে তো নিছকই এক ইন্দ্রিয়পরায়ণ রিপুতাড়িত সাধারণ মানুষ, তাকে অন্য কিছু কল্পনা করে কেন এরা কষ্ট পায়?

বাথরুম থেকে বেরিয়ে শোওয়ার ঘরের দরজায় থামল বোধিসত্ত্ব। দরজা ভেজানো, খুলল নিঃশব্দে। নিয়মিত নিশ্বাসের শব্দ, একটানা, উঠছে পড়ছে। বোধিসত্ত্বকে জাগিয়ে রেখে কী নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে দয়িতা! আলো জ্বালবে কি বোধিসত্ত্ব? ছিঁড়েখুড়ে দেবে সুখনিদ্রা? ওই যৌবন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তবু যদি আর একবার...!

না, আর নয়। বোধিসত্ত্ব চলেই যাবে। জাগতিক মোহ মায়া ত্যাগ করে, নিজস্ব মহাজগতের সন্ধানে। কাজই তার বন্ধন, কাজেই তার মুক্তি।

এতক্ষণে বুঝি শান্ত হয়েছে চিত্ত। বোধিসত্ত্ব ফিরেছে স্টাডিরুমে। ইজিচেয়ারে শরীর ছেড়ে দিল। অন্ধকারের কণারা পরিব্যাপ্ত হচ্ছে ক্রমশ, ছেয়ে ফেলছে চরাচর। বোধিসত্ত্বর চোখে ঘুম নামছে, গভীর ঘুম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকালে একটু দেরি করেই ঘুম ভাঙল বোধিসত্ত্বর। চোখ খুলতেই বুকটা ধক করে উঠেছে। ফ্ল্যাটটা এত ভয়ঙ্কর রকমের নিঝুম লাগে কেন?

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ছিটকে ড্রয়িংরুমে বেরিয়ে এল বোধিসত্ত্ব। শোওয়ার ঘরে চোখ চালাল, উঁকি দিল বাথরুমে, রান্নাঘরে।

নাহ্, দয়িতা কোথাও নেই।

বাইশ

ফোনটা এল দুপুরবেলায়।

অফিসে আজ কাজের চাপ তুলনামূলকভাবে কম ছিল সৌমিকের। এ কিউবিকল ও কিউবিকল ঘুরে খুচরো আড্ডা দিচ্ছিল। কেজো আড্ডা। অফিসেরই কথা হচ্ছিল নানা রকম, তবে খানিকটা হালকা মুডে। সবে সিটে ফিরে টিফিনে বেরোবে কি বেরোবে না ভাবছে, তখনই দূরভাষে চেনা স্বর।

—সৌমিক, খুব ব্যস্ত আছ নাকি?

শিথিল সৌমিক পলকে টান টান। বোধিসত্ত্ব ফেরার পর থেকে সে আর একদিনও দয়িতাকে ফোন করেনি। অনেকবার ইচ্ছে হয়েছে, তবুও না। কেন আর যেচে কাবাবমে হাড্ডি বনা! থাকো সুখে উচ্চ বৃক্ষচূড়ে কপোত কপোতী যথা...

অপ্রত্যাশিত ফোন পাওয়ার বিস্ময় গোপন রেখে সৌমিক লঘু স্বরে বলল,—যাক, অ্যাদ্দিনে তাও আর কাউকে মনে পড়ল!

কথাটা যেন শুনতেই পায়নি দয়িতা। ঠাণ্ডা স্বরে বলল,—তুমি কি আজ আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারবে?

—আজ? কখন?

—এই ধরো বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। আমি তোমার জন্য এসপ্ল্যানেডে ওয়েট করব। মেট্রো স্টেশনের গেটে।

—হ্যাহ্, ওখানে কেন? তুমি আমার অফিসে চলে এসো।

—না। তুমিই এসো। কে সি দাসের দোকানের উলটো দিকের গেটে। দয়িতা দু-এক পল নীরব। তারপর বলল,—অবশ্য তোমার যদি অসুবিধে না থাকে...

—না না, অসুবিধে কীসের? আমি চলে যাব।

সৌমিক একটু দম নিয়ে স্বাভাবিক কুশল প্রশ্ন শুরু করতে যাচ্ছিল, তার আগেই লাইন কেটে গেছে! ভুরু কুঁচকে সৌমিক নামিয়ে রাখল রিসিভারটা। চমকিত ভাব অবশ্য বেশিক্ষণ রইল না, মেজাজ ফুরফুরে হয়ে গেছে সহসা। মনে মনে ভাবার চেষ্টা করল হঠাৎ কেন ডাক পাঠাল রাজকন্যা? ঘরে শুধু এক মুখ দেখে দেখে বোর হয়ে গেছে, তার সঙ্গে আড্ডা দেবে আজ? কিন্তু তা হলে তো বাড়িতেই ডাকতে পারত! চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি থেকে কি রাজকন্যা হাঁপিয়ে উঠেছে? কে জানে, হয়তো মার্কেটিং করবে! সৌমিককে ব্যাগ বইতে হবে! কিন্তু দয়িতার গলাটা তো তেমন উচ্ছল লাগল না, বরং যেন কেমন ভার ভারই...? কদিন ধরে গুমোট বেড়েছে খুব, বর্ষা আসার পূর্বলক্ষণ। চারদিকে এখন জ্বরজারির ধুম পড়েছে, দয়িতারও সর্দি-টর্দি লেগেছে নাকি?

আবার টেলিফোন।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিফ্লেক্স অ্যাকশানে রিসিভার তুলতেই ওপারে কবিতা বসুরায়।

—টিফিন হয়ে গেছে?

রোজকার মতো চাঁছাছোলা জবাব দিল না সৌমিক। প্রসন্ন গলায় বলল,—এই তো যাব যাব করছি। পেট রীতিমতো হাঁকডাক শুরু করে দিয়েছে।

—উলটোপালটা কিছু খেয়ো না যেন। মনে রেখো, আজ তোমার স্টু-এর দিন।

—মনে আছে। আমার জিভটাও স্টু-ই চাইছে আজ।

—ফিরছিস কখন?

—দেখি।...একটু দেরি হতে পারে।

—আমি সন্ধেবেলা থাকব না। টেবিলে স্যান্ডুইচ রেখে যাব, মনে করে খেয়ে নিস।

—জো হুকুম।

ফোন রেখেই সৌমিক হালকা শিস দিতে দিতে ক্যান্টিন। মোটামুটি টইটুম্বর হয়ে ফিরল সিটে, কাজে বসল। দারুণ চনমনে ভাব এসে গেছে, নেশাড়ুর মতো ডুবে যাচ্ছে যন্ত্রগণকের নীরস পরদায়। কীভাবে যে হুস করে সময় কেটে গেল!

সাড়ে চারটে নাগাদ তলব পড়ল জি এমের ঘরে। জরুরি মিটিং। মিনিট পনেরোর পর থেকে উশখুশ করতে শুরু করেছে সৌমিক। ঘনঘন ঘড়ি দেখছে। পাঁচটা বাজতে দশ! পাঁচটা বাজতে পাঁচ! পাঁচটা বেজে যাওয়ার পর রীতিমতো অস্থির দশা। পাঁচটা দশ নাগাদ আর থাকতে পারল না, স্কুলের বাচ্চাদের মতো অভিনয় শুরু করে দিয়েছে। স্টমাক পেনের অজুহাত দিয়ে কোনওক্রমে বেরিয়ে পড়ল মিটিং ছেড়ে। রাজকন্যার আহ্বান এসেছে আজ, মিথ্যে বললে আজ কোনও দোষ নেই।

ঘড়ির কাঁটা সাড়ে পাঁচটা ছোঁয়ার আগেই সৌমিক প্রায় ছুটতে ছুটতে পৌঁছে গেছে নির্ধারিত স্থানে। দরদরিয়ে ঘামছে। মুখে রুমাল বোলাতে বোলাতে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। দয়িতা নেই।

সৌমিক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। দীন অভাজনের জন্য প্রতীক্ষা করা কি রাজকন্যাকে মানায়!

কলকাতায় এখন ঝলমলে বিকেল। সূর্য এখন সোনার জলের পালিশ বোলাচ্ছে চতুর্দিকে, সোনা মেখে ঝিকমিক করছে বাড়িঘর গাড়িঘোড়া। আকাশে আজ টুকরো টুকরো মেঘ আছে বটে, কিন্তু ওই মেঘেরাই যেন নীলের শোভাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। লাখো মানুষের চ্যাঁ ভ্যাঁও এখন মধুর গুঞ্জন বলে মনে হয়। যেন এই শহর এখন এক অতিকায় মৌচাক।

রোদ্দুরের তেজ ক্ষয়ে আসছে ক্রমশ। একটু একটু করে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছিল সৌমিক। সাত জন্মে সে কোথাও কোনও মেয়ের জন্য দাঁড়ায়নি, প্রতীক্ষার প্রতিটি মুহূর্ত যে এত দীর্ঘ হয় সে জানবে কী করে! ছটা বাজে প্রায়, এখনও এল না! শয়ে শয়ে লোক নেমে যাচ্ছে মেট্রো স্টেশনের গহ্বরে, শয়ে শয়ে উঠেও আসছে, তাদের প্রত্যেককে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছিল সৌমিক। যদি এদের মধ্যে কেউ হঠাৎ কোনও যাদুমন্ত্রবলে দয়িতা হয়ে যায়! উঁহুঁ, হচ্ছে না, হচ্ছে না। হল কী দয়িতার? প্র্যাকটিকাল জোক করল না তো? সৌমিকের মতো হাঁদাগঙ্গারামকে নিয়ে নিষ্ঠুর ঠাট্টা?

ইত্যাকার ভাবনায় সবে পীড়িত হতে শুরু করেছে সৌমিক, তখনই লেনিন মূর্তির পাশের চাতালে হঠাৎ দৃষ্টি স্থির। আসছে দয়িতা। ধীর পায়ে, দিনের শেষ রোদ্দুরটুকু

মেখে। একটু বুঝি অন্যমনস্কও।

একদম কাছে এসে সৌমিককে দেখতে পেল দয়িতা। ফ্যাকাশে হাসল,—অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ তো?...সরি।

—না না, তেমন কিছু নয়। সৌমিক আলগা কাঁধ ঝাঁকাল,—আমিও এই মাত্রই...।

দুজনেই একটুক্ষণ চুপ। সৌমিক দেখছিল দয়িতাকে। একটু মুটিয়েছে দয়িতা, তবে মুখে একটা হালকা কালো ছাপ পড়েছে যেন। বিষণ্ণতার ছাপ? ছি, দয়িতা বিষণ্ণ হবে কেন!

সৌমিক তরল গলায় বলল,—মুখ-চোখ এত শুকনো কেন? শরীরে যত নেই মনে হচ্ছে?

—অফিসে যা ধকল যাচ্ছে সারাদিন! দয়িতা গলা ঝাড়ল,—এদিক ওদিক টইটই করে ছোটা!

—তুমি চাকরি করছ? কবে থেকে?

—এই তো, মাস দেড়েক।

—এতদিন? স্ট্রেঞ্জ!...আমায় কিন্তু তোমার জানানো উচিত ছিল। আফটার অল চাকরির পরামর্শটা তোমায় আমিই প্রথম দিয়েছিলাম। সৌমিক ঝকঝকে দাঁত মেলে হাসল,—কোথায় চাকরি করছ?

—তেমন বলার মতো কিছু নয়। একটা টিভি কোম্পানিতে, সেলসের কাজ। ডিলারদের কাছে যেতে হয়, অর্ডার নিতে হয়...অবশ্য কলকাতার মধ্যেই।

সৌমিক গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেলল। বোধিসত্ত্ব মজুমদারের দুটো ফ্যামিলিই শেষে সেলস লাইনে? এই তো গত সপ্তাহে বাবুয়া এসেছিল অফিসে। সে এখন ঘুরে ঘুরে ওয়াটার পিউরিফায়ার বেচছে। সৌমিকের কাছ থেকেও কিছু রেফারেন্স নিয়ে গেল যদি কাউকে এক-আধটা মাল বেচতে পারে। ছোকরা বহুত জিদ্দি আছে, পড়াশুনো জলাঞ্জলি দিয়ে এই সামান্য কাজে নেমেও মুখের হাসিটি টসকায়নি। কী আয়রনি, বলতে গেলে যার জন্য বাবুয়া আজ সেলসম্যান, সেও কিনা...!

সৌমিক হাসতে হাসতে বলল,—চাকরি করলে তো একটু খাটতে হবেই। এমনি এমনি কেউ মাইনে দেবে?

—সে তো বটেই। দয়িতা কেমন অদ্ভুত স্বরে বলল,—দুনিয়ার কেউই কাউকে এমনি এমনি কিছু দেয় না। কড়ায় গণ্ডায় হিসেব বুঝে নেয়।

কথার সুরটা কানে লাগল সৌমিকের। একটু থমকেছে। জোর করে হাসি ধরে রেখে বলল,—বস খুব ডেঁটেছে বুঝি আজ?...পছন্দ না হলে চাকরিটাকে কুইটস করে দাও। ট্রাই ফর অ্যান অফিস জব। আই মিন ডেস্ক ওয়ার্ক।

দয়িতা আরও অদ্ভুত স্বরে বলল,—তদ্দিন খাব কী?

—মানে? সৌমিকের চোখ গোল গোল,—প্রফেসর সাহেবের কি অন্ন কম পড়িয়াছে? তুমি রোজগার না করলে খাওয়া জুটবে না?

—আমি এখন বোধিসত্ত্ব মজুমদারের সঙ্গে থাকি না।

সৌমিকের মুখ হাঁ হয়ে গেছে। চেষ্টা করেও হাঁ বন্ধ করতে পারছে না।

দয়িতা মৃদু গলায় বলল,—চলো, কোথাও একটা গিয়ে বসি। আমার খুব খিদে

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়েছে।

প্রাণপণ চেষ্টায় সৌমিক ধাতস্থ করল নিজেকে,—হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। কোথায় যাবে? কী খাবে?

—মুড়ি-টুড়ি যা হয় কিছু।...রেস্টুরেন্টে ঢুকব না, বড্ড গরম লাগছে।

দয়িতা আস্তে আস্তে কার্জন পার্ক অভিমুখে হাঁটা শুরু করল। পাশে পাশে সৌমিকও। অজস্র ট্রামলাইনের সমান্তরাল আঁকিবুকি ছেদ করে ভিন্ন এক সমান্তরাল রেখায় হাঁটছে দুজনে। নিঃশব্দে। সন্ধে একটু একটু করে ডানা মেলছে শহরে, আবছায়ামাখা দয়িতার মুখখানা যেন আরও রহস্যময়। যেন পাহাড়ি ঝর্না হঠাৎ গতি হারিয়ে জমাট বেঁধেছে ওই নারীতে।

সৌমিক অপাঙ্গে দয়িতাকে দেখছিল। একটাও প্রশ্ন করতে সাহস হচ্ছে না। কী হল হঠাৎ দয়িতার? কবে এত বদলাল? কেন বদলাল?

কাঁধের ওড়না গুছিয়ে নিয়ে সন্তর্পণে একটা বেঁটে রেলিং পার হল দয়িতা। নিশিতে পাওয়া মানুষের মতো সৌমিকও। ঘাসের ওপর দয়িতার মুখোমুখি বসেছে। কার্জন পার্কে এখন ঝালমুড়িওলাদেরই সময়, না ডাকতেই হাজির একজন। দয়িতার থমথমে মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে দু ঠোঙা মশলামুড়ি কিনল সৌমিক। দয়িতা ঠোঙাটা হাতে নিল বটে, কিন্তু খাচ্ছে না। দুটো চারটে মুড়ি খুঁটছে, মুখে ফেলছে, তার ফাঁকা চোখ এখনও ঘনায়মান অন্ধকারে।

গ্রীষ্মের সন্ধে। পার্কে ভিড় আছে ভালই। দু-চার হাত অন্তরই ছোট ছোট জটলা। কেউ বা অফিসফেরতা, কেউ বা আড্ডাবিলাসী, কেউ একা উদাস। এই ধরনের ভিড়ে অদ্ভুত এক নির্জনতা থাকে, কেউ কারও কথা শোনে না।

তবু সৌমিক নিচু স্বরে বলল,—খাচ্ছ না কেন? খিদে পেয়েছে বলছিলে?

—হ্যাঁ। খাই।

দয়িতার আঙুল একটু বুঝি সপ্রতিভ হল। আকাশে যেভাবে তারা ফোটে, একটু একটু করে ভাষাও ফুটে উঠছে দয়িতার চোখে।

শুকনো গলায় বলল,—খুব অবাক হয়েছ, তাই না?

অবাক শব্দটার ব্যাপ্তি এত কম! বুকের মধ্যে কী যে তুফান চলছে সৌমিকের!

সামান্য গলা ওঠাল সৌমিক,—তুমি কি সত্যিই প্রফেসার মজুমদারের সঙ্গে...?

—যেচে মিথ্যে শোনাব বলে তো ডাকিনি।

—হঠাৎ হলটা কী?

—কী যে হল! দয়িতা হাত ওলটাল। একটা ঘন শ্বাস ফেলে বলল,—আমি নিজেও ভাবতে পারিনি। দুম করে সব ফুরিয়ে গেল।

—বুঝেছি। প্রফেসার সাহেবের সঙ্গে জোর ঝগড়া হয়েছে।

—প্রফেসার সাহেব ঝগড়া করার স্তরের লোকই না।

—তবে? সৌমিক চোখ সরু করল,—ভুল বোঝাবুঝি?

—ভুল বোঝাবুঝি মানুষে মানুষে হয় সৌমিক। বোধিসত্ত্ব মজুমদার কি সাধারণ মানুষ? ও একটা লিভিং আইডিয়া। অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন।

দয়িতার স্বর কী ভীষণ তাপহীন! বিষণ্ণতা ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে এক গাঢ় নিরাসক্তি!

সৌমিক জোর করে হাসার চেষ্টা করল,—গভীর মান অভিমানের পালা চলছে মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে?

—মান অভিমান কখন চলে সৌমিক? যখন মান অভিমানের মূল্য থাকে।

—এ আমি মানতে পারলাম না। এও তোমার অভিমানেরই কথা। তুমি নিজেও জানো প্রফেসার মজুমদার তোমায় কত ভালবাসেন। ভালবাসা শব্দটা উচ্চারণ করতে কষ্ট হচ্ছিল সৌমিকের, তবু বলল,—তোমায় ভালবেসেই না তিনি স্ত্রী ছেড়েছেন, সংসার ছেড়েছেন, সন্তান ছেড়েছেন...

—ভুল। মিথ্যে। বোধিসত্ত্ব কখনও কিচ্ছু ছাড়েনি। স্ত্রী ছেলের ওপর তার টানই ছিল না, ছাড়ার প্রশ্ন আসে কোথথেকে? জানো, যে দিন ওর স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, সেদিনই কী অনায়াসে তাকে ডিভোর্স করার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল বোধিসত্ত্ব...অতদিন এক সঙ্গে ঘর করার পরও।

—কিন্তু সে তো তোমারই জন্যে? তোমাকেই ভালবেসে?

—আমিও তাই ভেবেছিলাম। বোকা বোকা, কী বোকা আমি। দয়িতা অস্থিরভাবে মাথা ঝাঁকাল,—বোধিসত্ত্ব মজুমদার ভালবাসতেই জানে না। সে কোনওদিনই কাউকে ভালবাসেনি। একমাত্র নিজের কাজকে ছাড়া...। দয়িতার নিশ্বাস পড়ছে জোর জোর,—উঁহু, নিজের গবেষণাকেও সে ভালবাসে না। সে শুধু ভালবাসে নিজেকে। সুদ্ধু নিজেকে। নিজের সুখ, নিজের তৃপ্তি, নিজের খ্যাতি যশ...। কাজও তার কাছে আত্মসুখ চরিতার্থ করার একটা টুল।...আত্মসুখ মানে ইগো। বোধিসত্ত্বর আমিত্ব। অহং। আমরা ছিলাম সেই আমিময় মানুষের সুখ সাপ্লাই-এর মেটিরিয়াল। আমি, রাখী...। বোধিসত্ত্ব মজুমদার আত্মরতি ছাড়া আর কিছু বোঝে না সৌমিক।

—হঠাৎ এই রিয়েলাইজেশন?

—হল।

—বুঝলাম। সৌমিক আবার জোর করে হাসল,—তুমি প্রফেসার সাহেবের ওপর খুব চটে আছ।

—না সৌমিক, আমি ওই স্টেজ পার হয়ে এসেছি। এই মুহূর্তে বোধিসত্ত্বর ওপর আমার রাগ ঘৃণা কিচ্ছু নেই। দয়িতা চোখ তুলল,—যেখানে আমি আমি হিসেবে মূল্যহীন, সেখানে আমি থাকব কেন?

—অনেক হয়েছে, এবার ঝেড়ে কাশো তো। সৌমিক ঈষৎ অসহিষ্ণু হল,—লাস্ট যে দিন দেখা হল, সে দিনও তো তুমি বোধিসত্ত্বতে বেশ গদগদ ছিলে?

দয়িতার চোখ নিষ্পলক হয়ে সৌমিককে গেঁথে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর মুখ ঘুরিয়ে চুপ করে বসে আছে।

সৌমিকও আর কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। খোঁচাখুঁচি করতেও আর ইচ্ছে করছে না। দয়িতার সঙ্গে বোধিসত্ত্বর কী হয়েছে জেনেই বা কটা হাত-পা গজাবে সৌমিকের? দুদিন বাদে আমে-দুধে মিশে গেলে সৌমিক তো আবার যে আঁটি সেই আঁটিই।

একটু দূরের এক জটলায় তুমুল হাস্যরোল উঠেছে। জনা কয়েক যুবক নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাশা করছে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। মাতঙ্গিনী হাজরার স্ট্যাচুর সামনে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিল এক রমণী, একটা বেঁটেখাটো লোক গলা নামিয়ে কী যেন বলল তাকে, দুজনে হাঁটতে হাঁটতে আরও অন্ধকারে চলে গেল।

সৌমিক সে দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল। তেতো স্বরে বলল, বাড়িতে তো নেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললে, তা তুমি এখন আছ কোথায়?

দয়িতা ঘাড় ফেরাল,—কটা দিন এক কলেজের বন্ধুর বাড়িতে ছিলাম। দমদমে। পয়লা তারিখ থেকে পাইকপাড়ায় শিফট করেছি। আপাতত ওখানেই পেয়িং গেস্ট।

—ও।...সল্ট লেক ছেড়েছ কদ্দিন?

—তা প্রায় দিন কুড়ি।

—এত দিন? প্রফেসারসাহেব জানেন তুমি কোথায় আছ?

—পরশু গিয়েছিলাম সল্ট লেকে। কিছু জামাকাপড় আনতে। তখন কথা হয়েছে।...বলে এসেছি, আমি আর ফিরছি না।

—তিনি তোমায় আটকালেন না? মিটমাট হল না?

—তোমায় কত বার বলব সৌমিক আমাদের ঝগড়া হয়নি! দয়িতা বিরাট বড় একটা শ্বাস ফেলল,—আমাদের সম্পর্কটা ছিঁড়ে গেছে। পুরোপুরি। ইটস টোটালি ওভার।

কথাটা এত স্পষ্ট, এত গভীরভাবে উচ্চারণ করল দয়িতা, যে সৌমিকের বুকের ভেতরটা শিরশির করে উঠল। আশ্চর্য, যদি সত্যিই ওদের সম্পর্ক ভেঙে গিয়ে থাকে, সৌমিকের তো খুশি হওয়া উচিত, কিন্তু মনে তেমন খুশির লহর উঠছে কই? দয়িতার তীব্র বিষাদ কি ছোঁয়াচে রোগ হয়ে সৌমিককে ধরে ফেলল? নাকি খেয়ালি মেয়েটার নতুন পাগলামিতে সৌমিক সন্ত্রস্ত?

দয়িতা হঠাৎ বলল,—তোমায় কেন ডেকেছি আন্দাজ করতে পারছ?

সৌমিক দ্রুত ঘাড় নাড়ল,—নাহ্।

—আমার একটা উপকার করে দিতে হবে সৌমিক।

—বলো।

—জানি তোমার ওপর জুলুমবাজি করছি...এটা শোভন নয়...

—অত কিন্তু কিন্তু করছ কেন? বলেই ফ্যালো।

—আমি খুব বিপদে পড়ে গেছি সৌমিক। আমার একটা থাকার জায়গা চাই।

—কেন? এখন যেখানে আছ, অসুবিধে হচ্ছে?

—এক্ষুনি এক্ষুনি হচ্ছে না, তবে অসুবিধে হবে।

—বুঝলাম না।

দয়িতা মাথা নামাল,—আমি প্রেগন্যান্ট সৌমিক।

সৌমিক নিমেষে হতবুদ্ধি। মগজে কথাটা পৌঁছুতে বেশ কয়েক সেকেন্ড সময় লেগে গেল। ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে আছে দয়িতার দিকে।

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল,—প্রফেসার মজুমদার জানেন?

—জানে তো বটেই।

—তার পরও তিনি তোমায়...?

—সে বাচ্চাটা চায় না সৌমিক। দয়িতা কথা কেড়ে নিল,—বাচ্চাটা তার কাছে আনওয়ান্টেড।

—কেন?

—ওফ, তুমি এত ছেলেমানুষ সৌমিক! এখনও বুঝিয়ে বলতে হবে? বোধিসত্ত্ব আমাকে শুধু তার নর্মসহচরী হিসেবে চায়। শুধু খিদমত খাটব, সেবা করব, বিছানায় নিয়মিত সুখ দেব, ব্যস। বাচ্চা মানে তো এক্সট্রা ঝক্কি। তা সে পোয়াবে কেন? এমনকী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার চাকরি করাটাও সে মোটেই মেনে নিতে পারে না।

সৌমিকের কাছে রহস্যটা স্বচ্ছ হচ্ছে ক্রমশ। মহৎ মানুষদের মাপার মাপকাঠি আলাদা, তাঁরা স্বভাবতই একটু আত্মকেন্দ্রিক হন, সৌমিক জানে। কিন্তু তা বলে এতটা স্বার্থপর হবে? গা রি রি করে উঠল সৌমিকের। বাবুয়া তা হলে মানুষটাকে চিনতে ভুল করেনি!

নাহ, দয়িতা চলে এসে ভাল করেছে। ওই বোধিসত্ত্ব মজুমদারের ছায়াও মাড়ানো উচিত নয়।

দয়িতা নিচু গলায় বলল,—পারবে একটা ঘর খুঁজে দিতে?

—সে না পারার কী আছে? সৌমিক কাঁধ ঝাঁকাল,—দেখি, দালাল ফালালদের বলি।

—ওয়ানরুম ফ্ল্যাট হলেই চলবে। একা থাকব...

—নো প্রবলেম। ডোন্ট ওরি।

বহুক্ষণ পর দয়িতার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি উঁকি দিয়েছে,—কাজটা কিন্তু যত সহজ ভাবছ, তত সহজ নয়।

—কেন?

—চেষ্টা তো আমিও করছি...দেখছি...কলকাতা শহরে একা মেয়েকে কেউ বাড়ি ভাড়া দিতে চায় না।

—স্ট্রেঞ্জ! পয়সা দিয়ে থাকবে, দেবে না কেন?

—তুমি এখনও সত্যিই ছেলেমানুষ আছ। কথাটা দ্বিতীয়বার বলল দয়িতা,—একা মেয়ে মানেই ধরে নেওয়া হয় খারাপ মেয়ে। তার ওপর পেটে বাচ্চা রয়েছে জানলে তো আরওই দেবে না।

—এ কী অন্যায় কথা? তুমি তা হলে এখন কোথায় যাবে?

—দ্যাখো না, তোমার চেনাজানা কাউকে বলে যদি...

সৌমিক ক্ষণিকের জন্য দিশেহারা। দয়িতা বিপদে পড়ে তার কাছে সাহায্য চাইছে, অথচ সে কিছুই করতে পারবে না, এ কী করে হয়? তবে এও তো সত্যি, তার তেমন চেনাজানা কেউ নেই, যে দয়িতাকে থাকতে দিতে পারে।

সৌমিক ফস করে বলে ফেলল,—তোমার বাবা মার কাছে ফিরে যাচ্ছ না কেন?

—সে আর সম্ভব নয়।

—কেন নয়? আমি জানি, তোমায় তাঁরা মাথায় করে রাখবেন।

—ভুল জানো। তারা হয়তো আমায় সোয়ালো করে নেবে, কিন্তু আমি তাদের সংসারে কাঁটার মতো ফুটব। তা ছাড়া আমি আমার সন্তানকে বোধিসত্ত্বর পরিচয়ে মানুষ করতে চাই না, আমার বাবা-মা সেটা মানতেই পারবে না।

—বোধিসত্ত্বর পরিচয়ে মানুষ করতে চাও না? মানে? তোমার বাচ্চার কোনও বাবা থাকবে না?

—সে টম ডিক হ্যারি যা হোক একটা কিছু নাম দিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু বোধিসত্ত্ব নয়, কক্ষনও না। বাচ্চাটা আমার, শুধু আমার।

নাহ, মেয়েটা একেবারে পাগল হয়ে গেছে। এ যে কী চায়, আর কী চায় না, বোঝা শিবেরও অসাধ্য।

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল সৌমিকের,—আচ্ছা ধরো, আমি যদি একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ি ভাড়া নিই...আমাকে তো নিশ্চয়ই দেবে?

—দিতে পারে। তো?

—তা হলে তো সমাধান হয়েই গেল। আমি একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করছি। আমার নামে। তুমি সেখানে থাকবে।

—কী পরিচয়ে?

—সে একটা কিছু বলে দেওয়া যাবে।

দয়িতা একটুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল,—তা হয় না সৌমিক। আমার তো নিন্দে হবেই, তা হোক, আমি আর নিন্দে টিন্দে নিয়ে ভাবি না। তোমারও বদনাম হবে।

—আমি কেয়ার করি না।

—না। আমার জন্য তুমি একবার চরম হিউমিলিয়েটেড হয়েছ, আর নয়।

দয়িতার স্বর অস্বাভাবিক রকম দৃঢ়। যেন এটা বিচারকের রায়, এর কোনও নড়চড় করা চলবে না।

সৌমিক অসহায় মুখে বলল,—এ ছাড়া তবে আর কী উপায়?

—আমার নাম করেই চেষ্টা করো। দ্যাখো পাও কি না। দুনিয়ায় এক-আধজন সদাশয় বাড়িওয়ালা তো থাকলেও থাকতে পারে। সময় আছে...তাড়াহুড়ো নেই।

সৌমিক ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। কেন তার প্রস্তাবে রাজি হতে চাইছে না দয়িতা? সৌমিককে কি বিশ্বাস করে না? কী ভাবছে? উপকার করার নাম করে সৌমিক দয়িতার ওপর জোর ফলাবে?

শহর এখন আলোর নদী। মাঝে পার্ক যেন অন্ধকারের দ্বীপ। আলোর স্রোত আছড়ে পড়ছে দ্বীপে তবু যেন আঁধার কাটছে না। এ এক বড় প্রতারক মুহূর্ত। হেঁয়ালিমাখা।

তেইশ

বাস থেকে নেমে প্রকাণ্ড ব্যাগটাকে কাঁধে তুলে নিল বাবুয়া। ওফ্, ব্যাগ তো নয়, বস্তা। পাহাড়ের মতো ভারী। দু' দুটো ইয়া ইয়া ওয়াটার পিউরিফায়ার আছে ব্যাগে, কী ওজন! হাক্লান্ত শরীরে বোঝাটা যেন আরও দ্বিগুণ লাগছে। সারাদিন এই নিয়েই ঘুরতে হয়েছে, চিনচিন করছে কাঁধ, একটা রিকশা ধরে নেবে কি?

একটু দোনামোনা করে বাবুয়া শেষ পর্যন্ত রিকশা নিল না। হাঁটছে। দু-চার পা অন্তর অন্তর কাঁধ বদলাচ্ছে। দত্তদা আজ অফিসে বলছিলেন এই লাইনে চাকরি করতে হলে স্পন্ডিলাইটিস বাঁধা, নিদেনপক্ষে ফ্রোজেন শোল্ডার। বাবুয়ারও বোধ হয় কাঁধটা গেল।

হেলাবটতলার মোড়ে উজ্জ্বল আলোকের সমারোহ। ক্যাসেটের দোকানে জোর টেপ চালিয়েছে, হিন্দি গানের কলি উড়ে আসছে উচ্চকিত। বাতাসে সিঙাড়া কচুরির গন্ধ, রোল চাউমিনেরও। থিকথিক করছে মানুষ, জটলা করছে, আড্ডা মারছে, কেনাকাটা সারছে। শেষ জ্যৈষ্ঠের সন্ধ্যায় এখন প্রখর ব্যস্ততা।

জনাকীর্ণ অঞ্চলটা পেরিয়ে এল বাবুয়া। সামনে এখন অপেক্ষাকৃত নির্জন পথ। অন্ধকার অন্ধকার। হাওয়া বইছে মৃদু মৃদু, ঘরে ফেরার টানে বাবুয়ার ক্লান্তি যেন কাটছে ধীরে ধীরে। আজকের দিনটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মনে করার চেষ্টা করল বাবুয়া। রোজকার রোজ দিন কেমন গেল, এটা দিনের শেষে স্মরণ করাটা খুব জরুরি। এতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মৃতিশক্তি তাজা থাকে। আজ সারাদিনে বাবুয়ার পাঁচ জায়গায় ডেমনস্ট্রেশন ছিল। তিনটে অফিস, দুটো শোরুম। খুব তঙ্ করেছে লোকগুলো। কত ভাবেই না খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, মাল নিল না। একটাই লাভ, তৃতীয় অফিস থেকে দু-দুটো ঠিকানা পাওয়া গেছে। কালই ছুটতে হবে, দেরি করা চলবে না, নইলে হয়তো অন্য কোম্পানির লোক পৌঁছে যাবে সেখানে। আগামীকালটা নিশ্চয়ই আজকের মতো বন্ধ্যা যাবে না।

লালজিবাবার আশ্রমের গেটে বিশাল এক হ্যালোজেন বাতি। অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে আলো। ওই আলোতেই বাবুয়া দেখতে পেল মামার বাড়ির গেটে এক সাদা ফিয়াট দাঁড়িয়ে। লেক টেরেসের গাড়িটা না? কাকা এসেছে? হঠাৎ কাকার আগমন?

ভুরু কুঁচকে বাড়ি ঢুকল বাবুয়া। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে ড্রয়িংরুমের সামনে থমকে দাঁড়িয়েছে। কাকা একা নয়, সঙ্গে কাকিমাও। হাত পা নেড়ে কী যেন বলছে কাকিমা, মা ভাবলেশহীন মুখে শুনছে। মামা মামিও আছে ঘরে, মামার চোখ টেরচা, মামির গোল গোল। কাকা সিগারেট ধরাল, অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ছে। এ যে মহাসম্মেলন!

শরীর টানছে, এখন নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেই হয়, তবু বাবুয়া ড্রয়িংরুমেই ঢুকে পড়ল। গোবদা ব্যাগখানা কাঁধে ঝুলিয়ে। সটান গিয়ে বসেছে রাখীর পাশে।

বাবুয়ার আবির্ভাব মাত্রই থেমে গেছে গুঞ্জন। গোটা ঘর জুড়ে নেমে এসেছে এক নৈঃশব্দের গুমোট। যেন এইমাত্র শুরু হল কোনও মৌন সভা।

বাবুয়া চোখ ঘোরাল,—কেস কী? সবাই এমন ফ্রিজশট হয়ে গেলে কেন? আমি কি এখানে অবাঞ্ছিত?

রন্টু তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—ঘরে গিয়ে রেস্ট নে না। সারাদিন খেটেখুটে এলি!

দীপালি বলে উঠল,—খুব পরিশ্রম করিস, না রে? তোর চেহারাটা খুব কাহিল হয়ে গেছে। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গেছে, হনু ঠিকরে উঠেছে...

মিত্রা হাঁ হাঁ করে উঠল,—না না, ওর শরীর তো ঠিকই আছে। কাজ থেকে ফিরল বলে একটু যা...

—হ্যাঁ রে, তোর ওয়াটার পিউরিফায়ারের মার্কেট কেমন? শান্তশীল সোফায় হেলান দিয়েছে,—রেসপন্স পাচ্ছিস?

বাবুয়া মুচকি হাসল,—তোমরা বুঝি বোধিসত্ত্ব মজুমদারের কথা আমার সামনে আলোচনা করতে চাও না? আমি কিন্তু এখন যথেষ্ট অ্যাডাল্ট, আমার কাছে গোপন করার কিছু নেই।

—হ্যাঁ তো। ঠিকই তো। বাবুয়ার সামনে লুকোছাপার কী আছে? দীপালি নড়ে বসল,—ও শুনুক, বুঝুক, বিচারবিবেচনা করুক।

সঙ্গে সঙ্গে রন্টু সায় দিয়েছে,—রাইট। কথাটা বাবুয়ারও জানা দরকার। আফটার অল বাবুয়াও তো অ্যাফেক্টেড পার্টির একজন।

দীপালি রাখীর দিকে ফিরল। প্রসঙ্গ ঘোরানোর ছলনাটুকু ধরা পড়ার জন্য সে এখন আর বিব্রত নয়। অনেকটা স্বচ্ছন্দ স্বরে বলল,—হ্যাঁ, যা বলছিলাম...ফোন পেয়েই তোমার দেওর তো ছুটল সল্ট লেকে। গিয়ে দেখে দাদার ধুম জ্বর, একা ফ্ল্যাটে কাতরাচ্ছেন দাদা। অগত্যা দাদাকে তুলে নিয়ে এল বাড়িতে।

শান্তশীল গলা ঝাড়ল,—এখন অবশ্য জ্বরটা আর নেই। তবে ভাইরাল ফিভার ছিল তো, বড্ড উইক হয়ে পড়েছে। আমি তো মনে করতে পারছি না, লাস্ট কবে দাদাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন দুর্বল হয়ে পড়তে দেখেছি। টলে টলে হাঁটছে, দেওয়াল ধরে ধরে বাথরুমে যাচ্ছে...

—এ সব কথা এখানে শোনাচ্ছেন কেন শান্তদা? রন্টুর গলায় ঝাঁঝ,—দিদির ও সব জেনে কোনও লাভ নেই।

—লাভ লোকসানের কথা ভেবে এখানে আসিনি রন্টু। শুধু বলতে এসেছি, আমাদের ফ্যামিলির দুঃস্বপ্নের ফেজ ইজ ওভার। সেই মহিলাটি...উঁহু, মহিলা বলব কেন, সেই ফ্রিভলাস্ মেয়েটি মানে মানে বিদায় নিয়েছে। শান্তশীলের দৃষ্টি রাখীতে ফিরল,—আমি তোমায় আগেই বলেছিলাম বউদি, ওই সম্পর্ক কক্ষনও টিকতে পারে না। ও সব মেয়ে ঘর ভাঙতে পারে, ঘর গড়া ওদের ধাতুতে নেই। দাদা একটা মোহের বশে...। কী, আমি বলিনি কথাগুলো?

—ব্যস, বলেই দায়িত্ব খতম? রন্টু প্রায় খিঁচিয়ে উঠল,—আপনাদের কোনও মরাল ডিউটি ছিল না? দাদাকে রেজিস্ট করতে পারেননি? বলতে পারেননি, ও সব বেহায়াপনা চলবে না?

মিত্রা স্বামীর হাত ধরে টানল,—আহ্, উত্তেজিত হচ্ছ কেন?

—হব না? আমার দিদিটা তিলে তিলে দগ্ধে মরছে, আর তিনি ওখানে ফূর্তি মারছেন! আর এঁরা ফেন্সের বাইরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন! দাদা ফ্যামিলিকে আলো করে রেখেছেন, তাই তাঁর সব কলঙ্ক মাপ? দিদির চরম অপমানের সময় কোথায় ছিলেন আপনারা? কী করেছেন?

দীপালি মিনমিন করে বলল,—কেন, দিদি বাবুয়াকে তো আমরা অনেক বার ওখানে গিয়ে থাকতে বলেছি!

—সেটা তো আরও বেশি অপমানকর। বর একটা অন্য মেয়েছেলের সঙ্গে লিভ-টুগেদার করছে, আর বউ মুখ বুজে শ্বশুরবাড়িতে পড়ে আছে...সূর্য চৌধুরীর মেয়ে অমন অপমানের ভাত খাওয়ার জন্য জন্মায়নি। দিস্ ম্যান ইজ দেয়ার টু প্রোটেক্ট হিজ দিদিজ্ ইজ্জত। নিজের বুকে আঙুল ঠুকছে রন্টু, গমগমে গলায় বলল,—আমি ভাবতে পারি না শান্তদা, আপনারা সব উচ্চশিক্ষিত লোক...আপনারা এই অপকর্মটি কেন মাথা নিচু করে মেনে নিলেন? একটু স্পাইন নেই আপনাদের? জানেন, অ্যাডাল্টারির মামলা করে আপনাদের গোটা ফ্যামিলির প্রেস্টিজ আমি ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারতাম? আপনারাও অফিসকাছারিতে মুখ দেখাতে পারতেন না...

বাঁধভাঙা বন্যার মতো তোড়ে ঠিকরে আসছে কথাগুলো। রন্টুর অনেকদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ যেন ফেটে ফেটে পড়ছে। অপমানে টকটকে লাল হয়ে গেছে দীপালির মুখ, নাকের পাটা ফুলছে, শ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। মিত্রা চোখ পিটপিট করছে, যেন স্বামীকে আর সামলাতে না পেরে সে হাল ছেড়ে দিয়েছে, এমন একটা মুখভাব তার।

বাবুয়া আড়চোখে মাকে দেখল একবার। রাখী আশ্চর্য রকম নীরব। যেন গোটা ঘটনাটার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্কই নেই। যেন সে কোনও নাটকের অভিনয় দেখছে স্থির চোখে।

মা কি উপভোগ করছে? নাকি কষ্ট পাচ্ছে? মামার এই কড়া কড়া কথায় কি সায় আছে মার?

দীপালি বুঝি কোনও প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, শান্তশীল হাত তুলে থামাল তাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুঁজে বলল,—রন্টুকে বলতে দাও। এই কথাগুলো আমাদের প্রাপ্যই ছিল। সত্যি তো আমরা সেভাবে দাদাকে বোঝানোর চেষ্টা করিনি, এড়িয়ে গেছি...দাদার ব্যক্তিত্বটাই এরকম, আমরা তো কোনওদিন তার ওপর কথা বলতে শিখিনি।

একটুক্ষণ থেমে রইল শান্তশীল। যেন নিজের কথাগুলোর প্রতিক্রিয়া অনুভব করছে। রন্টুও থমকেছে সামান্য, ঘাড় গোঁজ করে আছে।

শান্তশীল ঠাণ্ডা গলায় বলল,—তবে রন্টু...আমরা কিন্তু দাদাকে কক্ষনও মরালি সাপোর্ট করিনি। নিজেদের মধ্যে বার বার আলোচনা করেছি দাদা কাজটা ঠিক করেনি। দীপালি তো রোজ বলত, দাদা চরম অন্যায় করেছে, দাদাকে একদিন খেসারত দিতেই হবে। তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি না রণ্টু... যে বাবা মা বড় ছেলে বলতে পাগল ছিল, তারাও আর বাড়িতে ছেলের নাম করত না! মা নিজে একদিন আমায় বলেছে, বড় বউমার কাছে আমার খুব যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কোন মুখে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই বল?

—সরাসরি হয়তো বলা হয়নি, কিন্তু ইনডাইরেক্ট প্রোটেস্ট তো হয়েছে। দীপালি মাথা ঝাঁকাল,—অন্তত আমি করেছি। দাদা কত বার বলেছেন, তবু তাঁর সল্ট লেকের বাড়িতে আমি একটি দিনের তরেও যাইনি।

—যাক গে যাক, দোষী আমরা হয়ে আছি, হয়ে থাকবও। শান্তশীল ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল।

—দোষ নয় শান্তদা। রন্টুর স্বর একটু নরম হয়েছে,—আপনি আমাদের অ্যাগনিটা ফিল করার চেষ্টা করুন।

—করিনি? বউদি কি আমাদের পর? বাবুয়ার জন্য কি আমাদের বুকটা হু হু করে না? মা তো নাতির নাম শুনলেই চোখ মুছতে শুরু করে।

বাবুয়ার মনটা সামান্য ভারী হয়ে গেল। কতকাল দাদু ঠাকুমার সঙ্গে দেখা হয় না! ওই লোকটার জন্যে। ওই লোকটার জন্যে।

কাজের মেয়েটা বিশাল এক ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল। হেলাবটতলা মোড়ের গরম গরম ফিশফ্রাই আর সন্দেশ। মিত্রা উঠে দাঁড়িয়েছে, একটা একটা করে প্লেট এগিয়ে দিচ্ছে সকলকে।

বাবুয়াকেও দিল,—খেয়ে নে। সেই কোন সকালে দুটি ভাত মুখে গুঁজে বেরিয়েছিস।

দ্বিধাগ্রস্ত মুখে একখানা ফিশফ্রাই হাতে তুলে নিল বাবুয়া। ধরেই আছে, খাচ্ছে না! চুঁই চুঁই করছে পেট, তবুও না। কেন যে চোরা বিবমিষা জাগে!

শান্তশীলরা হাত গুটিয়ে বসে আছে। রণ্টু ভদ্রতা করে বলল,—নিন শান্তদা।

—আবার এ সব আনাতে গেলে কেন?

—আহা, ঝগড়াঝাঁটি যাই করি, কুটুমবাড়ি তো বটে।

—আমি ঠিক এই কথাটাই বলতে চাই। শান্তশীল কথাটাকে যেন লুফে নিল,—অনেক ঝড় বয়ে গেছে, মনোমালিন্যও কম হল না, কিন্তু আমাদের সম্পর্কটা তো এখনও পুরোপুরি ছেঁড়েনি।

—বটেই তো। দিদি জামাইবাবুর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলেও একটা রিলেশান তো থেকেই যায়। যতই যাই হোক, আপনি বাবুয়ার কাকাই থাকবেন, আমি বাবুয়ার মামা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ সম্পর্ক কোনও কোর্ট ছিঁড়তে পারে না।

—তা ঠিক। তবে...শান্তশীল একটু ইতস্তত করে বলল,—দাদা-বউদির সম্পর্কটা যে ছিঁড়ে গেছে, তাই বা কী করে বলি? ...আই মিন, দাদা আর ডিভোর্স কেসটা নিয়ে এগোতে আগ্রহী নয়।

মা একটু কেঁপে উঠল যেন? নাকি বাবুয়ার চোখের ভুল!

রণ্টু ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছে। শান্তশীল ঘাড় হেলাল,—হ্যাঁ, তাই। বিশ্বাস করো, দাদা এখন সত্যিই খুব রিপেন্টেড। মাঝের কটা মাস দাদা সম্পূর্ণ ভুলে যেতে চায়।

মিত্রা চোখ ঘোরাল,—তা কী করে সম্ভব? তিনি যখন যা চাইবেন, তাই হবে?

—মানুষ কি ভুল করে না মিত্রা? দীপালি বলে উঠল।

—মানুষই তো ভুল করে। ভুল করে বলেই তো সে মানুষ। ঈশ্বর নয়। শান্তশীল ফস করে আর একটা সিগারেট বার করে ঠোঁটে গুঁজল,—ভুল করে, শোধরায়, ভুল করে, শোধরায়... দাদা তো জীবনে এই একবারই মাত্র...চিরটা জীবনই তো দাদা পুরোপুরি লয়াল ছিল। তোমরা তো নিজের চোখে দেখেছ, বউদিকে কীভাবে মাথায় করে রাখত দাদা! বউদি ছিল দাদার সংসারের অধীশ্বরী।

রণ্টু গোমড়া মুখে বলল,—আমরা তো কখনও বলিনি, জামাইবাবু দিদিকে কষ্টে রেখেছিল!

—ছোট্ট একটা ভুল ?.... ছোট নয়, ধরে নিচ্ছি খুব বড়সড় একটা ভুল করেছে দাদা। ভুলও নয়, অপরাধ। অন্যায়। তুমি তো কোর্টকাছারি করো, নানারকম আসামি দ্যাখো, তুমিই বলো, গিল্টি প্লিড করলে জজসাহেব আসামির ওপর দয়া দেখান না? দাদা আবার নতুন করে বউদির সঙ্গে জীবন শুরু করতে চাইছে, একটা সুযোগ পাবে না? রাখীর চোখে চোখ রাখল শান্তশীল,—তোমার কাছে দাদা এর মধ্যে একদিন এসেছিল না?

বাবুয়া চমকে তাকাল। মা তো কিছু বলেনি তাকে!

রণ্টু মিত্রাও মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। রণ্টু অস্ফুটে বলল,—কবে?

এতক্ষণে রাখীর ঠোঁট নড়ল,—গত মাসে। একদিন দুপুর নাগাদ। তোরা তখন কেউ ছিলি না।

শান্তশীল বলল,—দাদা সে দিন ওই কথাই বলতে এসেছিল। ঠারে ঠোরে তোমায় বোধ হয় কিছু বলেও ছিল।... অন্তত দাদার কথা শুনে আমার সেরকমই তো মনে হল। চামচ দিয়ে সন্দেশ কাটছে শান্তশীল। ছোট একটা টুকরো মুখে তুলে বলল,—আর একটা কথা তো বলা হয়নি। দাদা খুব শিগগিরই জার্মানি চলে যাচ্ছে। এক দু-মাসের জন্য নয়, হয়তো পার্মানেন্টলি ওদেশে সেটলও করে যেতে পারে।

—তাই নাকি? কবে যাচ্ছেন?

—সেপ্টেম্বরে। হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটির কাজের পরিবেশ খুব ভাল, দাদারও খুব পছন্দ। দাদার ইচ্ছে বউদি দাদার সঙ্গে চলুক। নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ, দুজনে আবার একসঙ্গে...। আরে বাবা, দুজনেরই তো বয়স হয়ে গেছে, নাকি? বুড়ো বয়সে আর মান অভিমান পুষে রাখলে চলে?

রণ্টুকে একটু চিন্তান্বিত দেখাল,—এ ব্যাপারে আমি কোনও কথা বলব না। ওটা পুরোপুরি দিদির ব্যাপার, দিদি যা চাইবে তাই হবে।

—অবশ্যই। বউদির ডিসিশানই ফাইনাল। শান্তশীল আবার ফিরেছে রাখীর দিকে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাদা ভেতর থেকে একদম ক্ষয়ে গেছে বউদি। বোধিসত্ত্ব মজুমদার এখন একজন ভেঙেপড়া মানুষ। হি নিডস ইউ। এই পৃথিবীকে দাদার কিছু দেওয়ার আছে, তুমি পাশে না থাকলে কিছুতেই তা হবে না। ...আমি তোমাকে জোর করছি না, তুমি একটু ভাবো।

—আমার তো মনে হয় একটা মিটমাট করে নেওয়াই ভাল। দুম করে মন্তব্যটা করেই থমকে গেল মিত্রা। ভয়ে ভয়ে স্বামীকে দেখছে। আমতা আমতা করে বলল,—মানে সবাই যেভাবে বলছেন...! জামাইবাবুও তো ঠেকে শিখেছেন, আর কোনও নতুন ভুলভ্রান্তি করবেন বলে মনে হয় না।

দীপালি বলল,—আমি তো বলব শিক্ষাটার প্রয়োজনও ছিল। এতে দাদার সংসারের বনেদটা আরও শক্ত হবে।

—বাবুয়াকে নিয়েও বউদির চিন্তা করার কোনও কারণ নেই। আমরা আছি, ওর মামারবাড়ি আছে...

চা এসে গেল। মাকে একটুক্ষণ একদৃষ্টে জরিপ করে নিয়ে উঠে পড়ল বাবুয়া। কেমন একটা গদগদ পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে, এক মুহূর্তও আর এ ঘরে থাকতে ইচ্ছে করছে না। নাহ্, কাকা কাকিমা মার্ক অ্যান্টনিকেও হার মানাতে পারে। তেরিয়া মামা পর্যন্ত পালটি খেয়ে গেল!

নিঃশব্দে বেরিয়ে যাচ্ছিল বাবুয়া, দরজা পর্যন্ত পৌঁছনোর আগেই শান্তশীল ডাকল,—কী রে, চললি যে বড়?

—টায়ার্ড খুব। গা প্যাচ প্যাচ করছে, চান করব।

—এবার একদিন আয় বাড়িতে। জুলি মিলি সব সময়ে তোর কথা বলে।

—দেখি।

—দেখি না, আয়। দাদু-ঠাকুমা কোন দিন আছে, কোন দিন নেই, দুজনের কারুরই শরীর ভাল যাচ্ছে না...দেখা না হলে পরে কিন্তু আফসোস করবি।

—হুম্।

বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে ঘর থেকে চলে এল বাবুয়া। সোজা নিজের ঘর, প্যান্টশার্ট বদলে বাথরুম। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল, শাওয়ারের জলধারা চেপে চেপে ঘষছে গায়ে। যেন ক্লেদ মুছছে। বাথরুম থেকেই শুনতে পেল কাকা কাকিমা ডাকছে তাকে, যাচ্ছি যাচ্ছি বলছে। বাবুয়া সাড়া করল না, ভাল করে সাবান ডলছে গায়ে। রক্তকণিকার দাপাদাপি প্রশমিত হচ্ছে ক্রমশ। হঠাৎই ফুঁপিয়ে উঠল। কেন যে কান্না আসে? কোথ্থেকে আসে?

বাথরুম থেকে বেরিয়ে বাবুয়া একটু থতমত খেয়ে গেল। মা। তারই খাটে শুয়ে আছে, হাতে চোখ ঢেকে।

বাবুয়া স্নায়ুকে নিয়ন্ত্রণে আনল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। দীর্ঘ মুকুরে আর একবার দেখল মাকে।

যথাসম্ভব স্বাভাবিক স্বরে বলল,—তা হলে জার্মানি চললে?

রাখী উত্তর দিল না। হাতও সরাল না।

প্রাণপণ চেষ্টা করেও গলার ব্যঙ্গটা আটকাতে পারল না বাবুয়া,—ক্ষমাই পরম ধর্ম, কী বলো? মেরেছ কলসির কানা, তা বলে কি প্রেম দেব না?

রাখী এবারও চুপ।

—লেক টেরেস যাচ্ছ কবে? আই মিন, রিইউনিয়ানের ডেট কিছু ফিক্স হল?

স্প্রিং-টেপা পুতুলের মতো উঠে বসল রাখী। গুমগুমে গলায় বলল,—আমি লেক টেরেসে ফিরে গেলে তোর ভাল লাগবে?

—আমার ভাল লাগা না লাগাতে কী আসে যায়! এ তো তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার।

—না। তুইও আছিস। তুই কী চাস?

—আমি চাওয়া না চাওয়ার বাইরে।

—তুই ফিরবি?

—প্রশ্নই ওঠে না।

—কেন?

—কারণ আমার গায়ের চামড়া যথেষ্ট মোটা নয়। ও বাড়ির প্রতিটি ইট আমায় প্রতি সেকেন্ডে মনে করিয়ে দেবে, কী ভয়ানক হিউমিলিয়েশন সহ্য করতে হয়েছে আমাকে।

—তোর আর কী হয়েছে? হয়েছে তো আমার।

—আমার কাছে দুটোয় কোনও তফাত নেই। বাবুয়া রাখীর চোখে চোখ রেখেও সরিয়ে নিল,—তবে তোমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। তোমার বাবার ওপর যথেষ্ট উইকনেস আছে, আমি জানি। আমার জন্য তোমার হেজিটেট করার দরকার নেই।

—আমার একারই উইকনেস আছে? তোর নেই? তুই বাবাকে ভালবাসিস না?

বাবুয়া সহসা জবাব দিতে পারল না। সেই কোন শৈশব থেকে ওই লোকটা তার মনে বিতৃষ্ণার অনুভূতি গড়ে দিয়েছে, পদে পদে তাকে বাধ্য করেছে হীনম্মন্যতাবোধে আক্রান্ত হতে, কখনও লোকটা চোখ তুলে চেয়েও দেখেনি কীভাবে বেড়ে উঠছে বাবুয়া, তবু যেন কী একটা আছে! ইথারের মতো। সর্বব্যাপী, অথচ অস্তিত্বহীন। নইলে কেন শুধু ওই লোকটার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য দাঁতে দাঁত ঘষছে বাবুয়া? কেন তাকে উপেক্ষা করতে পারে না? কেন একদম ভুলে যেতে পারে না? আক্রোশ কি ভালবাসারই কোনও প্রতিশব্দ?

বাবুয়ার স্বর রূঢ় হল,—আমার কথা বাদ দাও। বলছি তো, তোমার ভালবাসা আছে, তুমি চলে যাও।

—ভালবাসি বলেই ফিরে যাব, এ তুই ভাবলি কী করে? ভালবাসা জিনিসটাই বড় জটিল রে বাবুয়া। আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে ভালবাসাকে ভালবাসা বলে না, এ আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। রাখী সামান্য গলা নামাল,—শুনলি তো, তোর বাবা আমার কাছে এসেছিল। মেয়েটা কেন চলে গেছে আমি জানি।

বাবুয়ার মুখ দিয়ে অজান্তেই বেরিয়ে গেল,—কেন?

—সে আমি তোকে বলতে পারব না। তাতে তোর বাবাকে ছোট করা হয়। শুধু জেনে রাখ, তোর কাকা কাকিমা যা বলে গেল, সেটাই ধ্রুব সত্য নয়। ওই মেয়েটা খারাপ, তোর বাবা ভাল, এটা বললে মেয়েটার ওপর অবিচার করা হয়। আবার ওই মেয়েটাই ভাল, তোর বাবা খারাপ, তাও আমি বলছি না। শুধু বলতে পারি, মেয়েটা চলে যাওয়ার জন্যই আমার ডাক পড়েছে। এত বড় অসম্মান আমি কী করে মাথা পেতে নেব?

বাবুয়া বিছানার কোণে এসে বসল। নিষ্পলক চোখে দেখেছে মাকে। তার চেনা মা, সাদাসিধে আটপৌরে মা, কোন জাদুমন্ত্রবলে এক অচেনা নারীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না নারী নয়, মানুষ।

রাখীর কাঁধে হাত রাখল বাবুয়া,—তবু আর একবার ভেবে দ্যাখো মা। আরও ভাবো। সময় নাও। বাবা পার্মানেন্টলি চলে যাচ্ছে, তুমি তার সঙ্গে গেলে হয়তো বাকি জীবনটা সুখেই কাটাতে পারবে।

—তুই আমাকে আর সুখের লোভ দেখাস না তো। আমি যে তার চোখে কী, তা তো আমি জানি। তার চেয়ে বরং সে আরও নাম করুক, গোটা পৃথিবীতে তার যশ ছড়িয়ে পড়ুক, আমরা দূর থেকে খুব খুশি হব। আমাদের ছেড়ে থাকা তার অভ্যাস হয়ে গেছে, বিদেশে সে ভালই থাকবে।

এত অকম্পিত গলায় কথাগুলো কাকে বলছে মা? বাবুয়াকে? না নিজেকেই?

আহা রে মা, বাবুয়ার দুঃখী মা!

চব্বিশ

আজ দিনভর থমথমে গরম ছিল। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ জমে আছে, বাতাস একেবারে নিথর। এমন একটা আবহাওয়া যেন নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়।

প্রবীর আজ অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়িই ফিরেছিল। বছরের এই সময়টায় কাজের চাপ কম থাকে, ছটা সাড়ে ছটার মধ্যেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়া যায়। বাড়ি ফিরেই আর কোনও কথা নেই, ধরাচুড়ো ছেড়ে সোজা বাথরুম। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল শাওয়ারের নিচে। ঘামাচি বেরিয়েছে খুব, জলের ছোঁয়ায় কুটকুটে ভাবটা যদি একটু কমে।

বুম্‌বা ঘরে। পড়ার টেবিলে। গ্রীষ্মাবকাশ প্রায় শেষ হয়ে এল, গোটা ছুটিটায় পড়াশুনোর পাট শিকেয় তুলে রেখেছিল, টো-টো করেছে যত্রতত্র, ইদানীং বইখাতা নিয়ে বসছে একটুআধটু। মণিদীপা রান্নাঘরে, বাপ ছেলের জন্য কফির জল চড়িয়েছে। সন্ধেবেলা বাড়িতে চা হয় না, কফি পানই রেওয়াজ।

স্নান সেরে বেরিয়ে গায়ে ভাল করে পাউডার মাখল প্রবীর। ড্রয়িংরুমে এসে বসল, রিমোটে অন করল টিভি। খেলাধুলোর চ্যানেলে প্রবীরের তেমন আগ্রহ নেই, লারেলাপ্পা নাচাগানাও সে পছন্দ করে না, গুচ্ছের অবৈধ প্রেমের সিরিয়ালও না। বিবিসি-র খবর শুনছে, তন্ময় হয়ে। শ্রীলঙ্কায় আজ আবার মানববোমার বিস্ফোরণ, চোদ্দজন ঘটনাস্থলেই মৃত। ছি ছি, কী হচ্ছে দেশটায়। পরদায় বীভৎস ডেডবডিগুলোর ছবি, গা শিরশির করে উঠল প্রবীরের। দাবি আদায় করতে গিয়ে মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় কেন?

মণিদীপা ডাকছে—টেবিলে এসো, জলখাবার দিয়েছি।

—বুম্‌বা খেয়েছে?

—ওর এসব চিঁড়ে-মুড়ি ভাজা পোষায় না। চাউমিন করে দিয়েছিলাম। বলেই মণিদীপা গলা ওঠাল, বুমবা, তোমার কফি কি ঘরে দিয়ে আসব?

—আসছি মা। এক সেকেন্ড।

— তাড়াতাড়ি আয়। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

প্রবীর টিভিতে চোখ রেখেই ডাইনিং টেবিলে এল। চিঁড়েভাজা থেকে বাদাম বেছে বেছে খুঁটছে। মণিদীপা ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে কাপে, তারও চোখ টিভিতে। হঠাৎই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল—দিদি আজ ফোন করেছিল।

প্রবীর কথাটায় তেমন আমল দিল না। দিদি বোনে তো প্রায়ই ফোনালাপ চলে, এতে আর নতুনত্ব কী আছে!

মণিদীপা আবার বলল,—টুনটুনির বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল।

—তাই? প্রবীর সামান্য নড়েচড়ে বসল,—কবে?

—তেসরা শ্রাবণ।

—সেই ডাক্তার পাত্র?

—হুঁ। খুব ভাল ছেলে পেয়ে গেল দিদি। কার্ডিওলজিতে ডিপ্লোমা করেছে, এখনই তিন তিনটে নার্সিংহোমের সঙ্গে অ্যাটাচড্...

—টুনটুনির ডাক্তার বর পছন্দ হল? গাঁইগুঁই করছিল না? বলছিল, ডাক্তারদের কোনও পার্সোনাল লাইফ থাকে না...?

—সবাই তোমার মেয়ের মতো নাকি? টুনটুনি বাবা মা-র খুব বাধ্য, দিদি জামাইবাবু যাকে ঠিক করে দেবে, তাকেই হাসিমুখে মেনে নেবে।

প্রবীর ঈষৎ ম্লান হয়ে গেল। কেন যে এখনও প্রতিটি সংলাপে ঘুরেফিরে মুনিয়া চলে আসে!

বুম্‌বা হেলেদুলে টেবিলে এসেছে। তার পরনে শর্টস আর হাফ পাঞ্জাবি, মুখভর্তি দাড়ি। কলেজ না খুললে সে দাড়িতে হাত ছোঁয়াবে না পণ করেছে।

কফির দিকে তাকিয়েই মুখ বিকৃত করল বুম্‌বা, অ্যাঃ, দুধ দিয়ে একেবারে সাদা করে দিয়েছ! আর একটু কফি মিশিয়ে দাও।

—বেশি ব্যাপকতামি কোরো না। যেমন দিয়েছি তেমন খেয়ে নাও।

বুম্‌বা কথাটার পরোয়া করল না। কাপ হাতে রান্নাঘরে গিয়ে নিজেই কফি নিয়ে নিল একটু। চামচে গুলতে গুলতে ফিরে এসে বসেছে চেয়ারে।

ছেলেকে একবার কটমট করে দেখে নিয়ে আবার প্রবীরে ফিরল মণিদীপা, টুনটুনিকে বিয়েতে কী দেওয়া যায় বলো তো?

—আমি কী বলব! সে তো তোমার ডিপার্টমেন্ট।

—গয়না একটা তো দিতেই হবে।

—হার ফার কিছু দিয়ে দাও। হাজার দশ বারোর মধ্যে। আফটারঅল টুনটুনি তো প্রায় আমাদের বাড়িরই মেয়ে।

—হুম্।... জড়োয়া দিলে কেমন হয়?

—দিতেই পারো। আজকাল তো খুব হিরের ফ্যাশান হয়েছে।

—অনেক দাম পড়ে যাবে। বাজেটে কুলোবে না।

বুম্‌বা পুট করে বলে উঠল, অত কেনাকিনিতে যাচ্ছ কেন? দিদির জন্য তো অনেক গড়িয়েছিলে, ওর থেকে কিছু একটা চালিয়ে দাও।

প্রবীর মণিদীপা দুজনেই থমকে গেল। শুধু গয়না কেন, মেয়ের জন্য শাড়িও কেনা হয়েছিল একগাদা। আলমারিতে সব তাল করা আছে। মাঝে মাঝেই মণিদীপা সেগুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে, ফুঁপিয়ে ওঠে হঠাৎ হঠাৎ, এখনও। প্রবীর স্বচক্ষে দেখেছে।

প্রবীর গোমড়া মুখে বলল, তা হয় না রে। একজনের নাম করে কেনা হয়েছিল...

—সো হোয়াট? আলমারিতে তুলে রেখে কী হবে? অত দামের জিনিস...ভোগে না লাগলে সবই তো বেকার।

—আঃ বুম্‌বা। যা হয় না তা নিয়ে কথা বলিস না। ছেলেকে মৃদু ধমক দিল প্রবীর। পরিবেশটা হালকা করার জন্য বলল, ওগুলো তোর বউয়ের জন্য তোলা রইল।

—বাহ্‌, আমার বউকে পুরনো মাল গছাবে? বুম্‌বাও ঠাট্টা জুড়েছে, তারপর বউভাতের দিন দেখা যাবে বেনারসিটা ঝুরঝুর করে খসে পড়ছে!

—আলোচনাটা থামাবে তোমরা? মণিদীপা দুম করে রেগে গেল, আমার ভাল লাগছে না।

—যো আজ্ঞা। বুম্‌বা কাঁধ ঝাঁকাল, আমি জাস্ট একটা প্র্যাক্টিকাল সলিউশনের কথা বলছিলাম।...দাও না তোমরা টুনটুনিদিকে যা খুশি।

—হ্যাঁ, তুই চুপই থাক। বেশি ফোপরদালালি মারিস না। কথাটা বলে মণিদীপা গুম হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর ফাঁকা কাপ হাতে উঠে গেল রান্নাঘরে। সিঙ্কে ধুয়ে সাজিয়ে রাখল বাসনের জায়গায়। রান্নাঘর থেকেই গলা ওঠাল, কাল কি তুমি আমার সঙ্গে আশ্রমে যাচ্ছ? না, যাচ্ছ না?

—কাল কী করে হবে? উইক ডে...আমি তো আগেই বলেছিলাম...

—একটা দিন ছুটি নেওয়া যায় না?

—তুমি রোববার চলো।

—আশ্চর্য! মণিদীপা উত্তেজিত মুখে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল, তুমি জানো গুরুদেব শনিবার বেনারস চলে যাচ্ছেন...!

—উপায় নেই গো। কাল একটা জার্মান টিম আসছে, তাদের নিয়ে প্ল্যান্টে যেতে হবে।

—তা হলে এবার আর আমার দর্শন হল না।

আহা, তুমি একাই যাও না। বলতে গিয়েও কথাটা গিলে নিল প্রবীর। ইদানীং লালজিবাবার আশ্রমে যাওয়া অনেক বেড়ে গেছে মণিদীপার এবং প্রতিবারই প্রবীরকে তার সঙ্গী হতে হয়। হিল্লিদিল্লি সর্বত্র একা একা চরে বেড়াতে রাজি মণিদীপা, কিন্তু বারাসতে সে এখন আর কিছুতেই একা যাবে না। কী যে এক ভয় ঢুকেছে, আশ্রমে যদি কবিতাদির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! আরে ছোঃ, কবিতা বসুরায় কি বাঘ-ভাল্লুক নাকি? তবে হ্যাঁ, মহিলা কিছু মুখরা বটে! বাড়ি বয়ে এসে যা ছ্যারছ্যার কথা শুনিয়ে গিয়েছিল। সন্তানের জন্য বাবা-মাকে যে কত সহ্য করতে হয়! ওই বোধিসত্ত্ব লোকটাকেই তো প্রবীরের সে দিন ঘুষি মারা উচিত ছিল। মারতে পেরেছিল কি?

বুম্‌বা টেবিল ছেড়ে উঠে যাচ্ছে। প্রবীর বলল, অ্যাই, তুই কাল মার সঙ্গে যাবি।

—আমি? বুম্‌বা প্রায় আঁতকে উঠল, আমি কেন?

—কেন নয়? মণিদীপা গরগর করে উঠেছে, তোমার কী রাজকার্য আছে শুনি?

—আছে।

—কী কাজ?

বুম্‌বা গা মোচড়াল,—আমার ম্যাটিনি শো'র টিকিট কাটা আছে।

—তুই সিনেমা দেখতে যাবি? তবু গুরুদেবের কাছে যেতে পারবি না?

—কেন? সিনেমা দেখা কি খারাপ কাজ? আমার ও সব গুরুদেব টুরুদেব পোষায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। যত্ত সব ফালতু লোক...।

—গুরুদেব ফালতু? তোর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?

—যা বলেছি ঠিকই বলেছি। ভণ্ড বুজরুক একটা। দিদির নামে তো কত কী ভাল কথা বলেছিল, কী ফলেছে অ্যাঁ? মার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল বুমবা। হাত নেড়ে বলল, বি র‍্যাশনাল মা। ও সব গুরুদেব ফুরুদেব এবার ছাড়ো। ও সব লোকের কাছে গিয়ে মনের শান্তি আসে না।

—চোপ্। দপ করে জ্বলে উঠল মণিদীপা, কী দুটো সন্তানই না গর্ভে ধারণ করেছিলাম। দুটোই সমান অবাধ্য। দুটোই সমান বেপরোয়া।

—দিদির সঙ্গে আমার তুলনা করছ কেন?

—হুঁহুঁ, তুলনা করবে না! সে একভাবে জ্বালিয়েছে, তুমি একভাবে জ্বালাবে।

—এ তো মহা মুশকিল হল। দিদি কী করেছে তার জন্য আমায় সারাজীবন কথা শুনে যেতে হবে?

—এক ঝাড়েরই তো বাঁশ তোমরা। আলাদা হবে কী করে? বড়দের একটা কথাও তোমরা মান্য করতে শিখেছ?

—মা, তুমি আনরিজ্‌নেবল কথা...

—ফের? ফের তর্ক? তোর মুখ আমি ভেঙে দেব।

বলতে বলতে উন্মত্তের মতো ছেলের দিকে ধেয়ে যাচ্ছিল মণিদীপা, প্রবীর কোনওক্রমে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল। মণিদীপা জোর করে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে, তার প্রমত্ত শক্তির সঙ্গে পেরে উঠছে না প্রবীর। এ সময়ে কোথ্‌থেকে যে এত জোর এসে যায় মণিদীপার গায়ে! ডাক্তার বলে অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণ। ফেজ অব টেম্পোরারি ইনস্যানিটি। কস্মিনকালে এ রোগ ছিল না মণিদীপার, মুনিয়া চলে যাওয়ার পর থেকে উপসর্গটা শুরু হয়েছে। ওষুধ চলছে নিয়মিত। এই স্নায়বিক বিকার যে কবে থিতোবে পুরোপুরি?

বুম্‌বাকে চোখের ইশারায় সরিয়ে দিয়ে মণিদীপাকে চেপে ধরে চেয়ারে বসাল প্রবীর। দু চোখের মণি স্থির হয়ে আছে মণিদীপার, আগুনে নিঃশ্বাস পড়ছে বড় বড়, বুকটা হাপরের মতো ফুলে উঠছে, চুপসে যাচ্ছে।

মিনিট পনেরোর মধ্যে মোটামুটি স্বাভাবিক হল মণিদীপা। নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল, আলো নিভিয়ে। প্রবীরের চোখ আবার টিভির পরদায়। মন বসছে না, চেয়েই আছে, দেখছে না কিছু। ভাবছিল কাল ছুটিটা নিয়েই নেবে। শরীর খারাপ টারাপ যা হোক কিছু বলে। বুম্‌বা এখন রাজি হলেও তার সঙ্গে মণিদীপাকে পাঠানো সঙ্গত হবে না।

বাড়ি জুড়ে এখন থমথমে নীরবতা। টিভি চলছে, প্রায় নিঃসাড়ে। বুম্‌বা এ সময়ে ব্যালান্সশিট কষতে কষতে গান শোনে, আজ তার ঘরও শব্দহীন।

তখনই বেল বাজল।

দরজা খুলে সামান্য অবাকই হল প্রবীর। সৌমিক।

—আরে, এসো এসো। কী খবর? অনেকদিন পর...?

—এই...আসাই হয় না...। সৌমিক আলগা হাসল, বুম্‌বা কোথায়? মাসিমা?

—সবাই আছে। ডাকছি। তুমি বোসো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৌমিককে বসিয়ে ঘরে গেল প্রবীর। চুপিসাড়ে ডাকল, মণি, সৌমিক এসেছে।

মণিদীপা ঘুরে শুল, তো?

—এসো একবার।

—আমার ভাল্লাগছে না। তুমি গল্প করো।

—ছি, এমন করে না। প্রবীর হাত রাখল মণিদীপার চুলে, ছেলেটা কদ্দিন পর এল...।

বুঝি একটা বাতাসের শব্দ শোনা গেল,—যাও, আমি আসছি।

ফিরে এসে প্রবীর দেখল বুম্‌বার সঙ্গে কথা বলছে সৌমিক। বুম্‌বার মুখ এখন নির্মেঘ, বেশিক্ষণ মেজাজ খারাপ করে থাকা তার ধাতে নেই।

সোফায় বসে সিগারেট ধরাল প্রবীর। টুকটাক কুশল প্রশ্ন করছে নিয়মমাফিক। মা-বাবার কী খবর, অফিস কেমন চলছে...। মাত্র ক মাসে হাসিখুশি ছেলেটাকে বেশ ভালই বেসে ফেলেছে প্রবীর। ছেলেটার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বললে মন ঝরঝরে হয়ে যায়।

কিন্তু আজ সৌমিক যেন কেমন দূরমনস্ক। মুখটাও কেমন শুকনো শুকনো লাগে। মণিদীপা এসে জিজ্ঞেস করল, সৌমিক নিশ্চয়ই অফিস থেকে আসছে, কিছু খাবেটাবে কি না। এমন প্রশ্নে অবলীলায় ঘাড় নাড়ে সৌমিক, আজ না না করে উঠল। বুম্‌বা শারজা কাপে ইন্ডিয়ার পরাজয় নিয়ে তর্ক জোড়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সৌমিক যেন উদাসীন।

প্রবীরের খটকা লাগছিল। জিজ্ঞেস করল,—তোমার কি শরীরটা ভাল নেই?

—না তো। ঠিকই আছি তো। ফাইন। সৌমিক নার্ভাস মুখে হাসল, ইনফ্যাক্ট, আমি আজ একটা দরকারে এসেছিলাম।

—কী বলো তো?

—একটা খবর দেওয়ার ছিল। সৌমিক আমতা আমতা করল, মানে...রিগার্ডিং দয়িতা।

মণিদীপা সোফায় হেলান দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে টান টান। ফ্যাসফেসে গলায় বলল, কী হয়েছে মুনিয়ার?

—হয়নি কিছু।...মানে... আবার হয়েছেও।

প্রবীরের চোখ সরু হল, বুঝলাম না।

সৌমিক একঝলক দেখে নিল বুম্‌বাকে। মাথা নামিয়ে বলল, কীভাবে বলব বুঝতে পারছি না, দয়িতাও আমায় পইপই করে বলতে বারণ করেছে...দয়িতা এখন আর প্রফেসর মজুমদারের সঙ্গে থাকে না।

—কীই?

—প্রফেসর মজুমদারের সঙ্গে দয়িতার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

—সে কী কথা? প্রবীর আর মণিদীপা কোরাসে ঝনঝন করে উঠেছে, সে তা হলে এখন কোথায়?

—পাইকপাড়ায়। এক বৃদ্ধ-বৃদ্ধার বাড়িতে পেয়িংগেস্ট হয়ে আছে।

সংবাদটা হজম করতে বেশ কয়েক সেকেন্ড সময় লেগে গেল প্রবীরের। হতচকিত স্বরে বলল, কবে থেকে?

—মাস দেড়েক তো বটেই। বেশিও হতে পারে।

সহসা এক তীক্ষ্ণ সূঁচ বিঁধল প্রবীরের হৃৎপিণ্ডে। দেএএড় মাআআস? মুনিয়া তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার জানানোরও প্রয়োজন মনে করল না? এত পর হয়ে গেছে বাবা-মা? না কি এ অভিমান? জেদ?

মণিদীপার দৃষ্টি কেমন অস্বচ্ছ হয়ে গেছে। বিড়বিড় করে বলল, ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল? মাত্র এ ক মাসের ভেতরে? কেন?

সৌমিক উত্তর দিল না। আবার মাথা নিচু করেছে।

প্রবীর মনে মনে হিসেব কষছিল। সে বোধিসত্ত্বর কাছে গিয়েছিল কবে? সেও তো ওই মাস দেড় দুই-ই হবে। সে দিন তো বোধিসত্ত্বর কথায় আঁচ পাওয়া যায়নি তাদের সম্পর্কে চিড় ধরেছে? বোধিসত্ত্ব কি চেপে গিয়েছিল? খুবই সম্ভব। লোকটার যতই নামডাক থাক, প্রবীর কিছুতেই তাকে একজন শঠ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। ভাঙবে কিন্তু মচকাবে না টাইপ। নিশ্চয়ই বাড়ি গিয়ে মুনিয়ার সঙ্গে অশান্তি করেছে। হয়তো শুনিয়েছে বাবা এসে কত অপমান করে গেছে। মুনিয়া হয়তো সেটা সহ্য করতে না পেরেই...!

উঁহুঁ, বাবা মার জন্য যদি অত টান থাকত, তা হলে তো মেয়ে এখানেই ফিরে আসত।

আরও একটা সম্ভাবনার কথাও উঁকি দিয়ে গেল প্রবীরের মাথায়। সম্পর্কটা ভেঙে যাওয়ার পর এখন কি অনুতাপ এসেছে মুনিয়ার? সঙ্কোচ কাটাতে পারছে না তাই সৌমিককে দূত করে পাঠিয়েছে?

প্রবীর ভুরু কুঁচকে তাকাল, তোমার সঙ্গে মুনিয়ার দেখা হল কী করে?

—হঠাৎই। একদিন এসপ্ল্যানেডের মোড়ে...। সৌমিক গলা ঝাড়ল, ও অফিস থেকে ফিরছিল...

—মুনিয়া চাকরি করে?

—করে তো।... মানে ওই নিয়েই তো বোধহয় প্রফেসর মজুমদারের সঙ্গে...

—মুনিয়া বলল তোমায়?

—হ্যাঁ... কথা শুনে তো তাই মনে হল।

এতক্ষণে যেন বোধিসত্ত্বকে আরও একটু চিনতে পারল প্রবীর। লোকটা শুধু শরীরের দিক দিয়েই বুড়ো নয়, ব্যাকডেটেড। রক্ষণশীল। বিজ্ঞানচর্চা ওর ভড়ং। মস্তিষ্ক বৈজ্ঞানিক হলেও হৃদয়টা আধুনিক হয়নি।

প্রবীর প্রশ্ন করল, কোথায় চাকরি করছে মুনিয়া?

—ছোট একটা কোম্পানিতে। সেল্‌সের কাজ।

—হঠাৎ চাকরি শুরু করল?

—বলল, একা একা ঘরে বসে বোর হচ্ছে..

আশ্চর্য, সৌমিককে এত কথা বলেছে, অথচ বাবা-মাকে একবার কিছু জানায়নি মেয়ে!

প্রবীরের ভুরুতে ভাঁজ পড়ল, তোমার সঙ্গে কি মুনিয়ার যোগাযোগ ছিল?

—না মানে...। সৌমিক চোখ তুলেই নামিয়ে নিল। [illegible] ওই একদিনই...

প্রবীরের কেন যেন মনে হল সৌমিক সব সত্যি বলছে না। চকিতে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো একটা প্রশ্ন খেলে গেল মাথায়। উকিলি ঢঙে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, একটা কথা...। তুমি মুনিয়াকে চিনলে কী করে? তোমার সঙ্গে তো তার কখনও পরিচয় হয়নি?

সৌমিক নতমুখেই বলল, ও একদিন আমার অফিসে এসেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কবে?

—অনেকদিন আগে। আমাদের বিয়েটা স্থির হওয়ার ঠিক পর পরই।

—স্ট্রেঞ্জ! বলোনি তো কোনওদিন?

সৌমিক চুপ।

—কেন গেছিল? বিয়ে ভাঙতে?

সৌমিক এবারও চুপ।

প্রবীরের বিস্ময় বাড়ছিল। বিয়ে ভাঙতেই যদি গিয়ে থাকে, সৌমিক সেটা কাউকে জানায়নি কেন? মুনিয়া চলে যাওয়ার পরও কেন এখানে যাতায়াত বজায় রেখেছে? নেহাতই ভদ্রতাবোধ? নাকি প্রবীরদের ভাল লেগে গেছে তাই? নাহ্, কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে।

প্রবীর ফের প্রশ্ন করল, তোমার সঙ্গে কবে দেখা হয়েছিল মুনিয়ার?

—এই তো...ছ-সাত দিন আগে।

—সঙ্গে সঙ্গে জানাওনি কেন?

—বললাম না, দয়িতা ভীষণভাবে মানা করেছিল।

—তা হলে আজই বা বলতে এলে কেন?

মণিদীপা হাঁ হাঁ করে উঠল, তুমি ওকে এত জেরা শুরু করলে কেন?...তা হ্যাঁ বাবা সৌমিক, মুনিয়া এখন আছে কেমন?

এতক্ষণ পর সৌমিক একটা বড় করে শ্বাস ফেলল। দু দিকে মাথা নেড়ে বলল, ভাল নেই মাসিমা। ওর শরীর একদম ঠিক নেই।

—কী হয়েছে?

—দয়িতা প্রেগন্যান্ট। অ্যানিমিয়া মতনও হয়েছে, প্রেশারও খুব লো...

—বাচ্চা হবে মুনিয়ার? তবুও একা একা পড়ে আছে? মণিদীপা ছটফট করে উঠল।

—আমি তো সেইজন্যই এসেছি মাসিমা। আমি চাই আপনারা এ সময়ে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ান। জোর করে ওকে এখানে নিয়ে চলে আসুন।

—সে তো আনতেই হবে। নইলে কি বেঘোরে মরে যাবে...মণিদীপার মুখে-চোখে অস্থিরতা, তুমি আমাকে ঠিকানাটা দাও বাবা, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

সৌমিক পার্স থেকে একটা চিলতে কাগজ বার করে মণিদীপার হাতে দিল। মণিদীপা দেখছে ঠিকানাটা। প্রবীরকে বলল, রাজা মণীন্দ্র রোড...তুমি চেনো?

প্রবীর গম্ভীর স্বরে বলল, দাঁড়াও। আমার সৌমিকের সঙ্গে আরও কিছু কথা আছে।...তোমাকে ঠিকানা দেওয়ার জন্য মানা করেছে মুনিয়া, তাই তো?

—হ্যাঁ।

—তার মানে ও চায় না আমরা ওকে নিয়ে আসি?

—হ্যাঁ।

—তা হলে আমরা যাব কেন? এটা ওর নিজের বাড়ি, ইচ্ছে করলেই ও এখানে ফিরে আসতে পারে। যখন খুশি।

—এটা জেদাজেদির সময় নয় মেসোমশাই। দয়িতার সত্যিই খুব বিপদ। আমাকে বলছে একটা ঘর খুঁজে দিতে, একা একা থাকতে চায়। ওর মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ঘরও খুঁজে দিতে বলেছে?

—বলেছে তো। সৌমিক ঢোক গিলল, কত বোঝালাম একা কোনও মেয়ে ঘরভাড়া পায় না, কিছুতেই কিছু বুঝতে চায় না।

—আমি যাব বোঝাতে। এক্ষুনি। আমি ওর মা, আমি গিয়ে ডাকলে ও কক্ষনও আমায় ফেরাতে পারবে না। মণিদীপা উঠে দাঁড়াল, কী গো, তুমি এখনও বসে আছ? ওঠো। চলো। অ্যাই বুম্‌বা, তুইও চল।

বুম্‌বা হতভম্ব। ফ্যালফ্যাল তাকাচ্ছে।

—না। আমরা কেউ যাব না। প্রবীর জেদি ঘোড়ার মতো ঘাড় বেঁকাল, সে যখন চায় না আমাদের, কেন যাব?

—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? এ কি মান-অভিমান করার সময়?

—নাহ্, অভিমান তো তারই একচেটিয়া।

—প্লিজ মেসোমশাই...

—তুমি অনুনয় করছ কেন? তোমার কিসের দায়?

—আমি দয়িতার ভাল চাই মেসোমশাই। ওকে দেখে সে দিন এত মায়া হল...

—কিসের মায়া? কেন মায়া?

সৌমিক কেমন বিহ্বল চোখে তাকাল। এই মুহূর্তে মেয়ের জন্য উদ্বেগ প্রবীরকে কুরে কুরে খাচ্ছে, সৌমিকের ওই দৃষ্টি যেন ঠাণ্ডা প্রলেপ বুলিয়ে দিল তাতে।

নরম গলায় বলল, আমায় একটা সত্যি জবাব দেবে সৌমিক? মুনিয়াই কি তোমায় পাঠিয়েছে?

—না না, বিশ্বাস করুন...। সৌমিক যেন কেঁপে উঠল, ও এখানে আর ফিরতে চায় না মেসোমশাই। কোন মুখে ফিরবে, বলুন? আমি চাই আপনারা ওকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসুন, ওর কোনও ওজর আপত্তি শুনবেন না। শুধু একটাই রিকোয়েস্ট, কাইন্ডলি ওকে বলবেন না ঠিকানাটা আমার কাছ থেকে পেয়েছেন।

—কেন সৌমিক?

—ও তা হলে আমায় কোনওদিন ক্ষমা করতে পারবে না।

—তাতেই বা তোমার কী আসে যায়?

সৌমিক উত্তর দিল না। প্রবীরের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছে।

প্রবীরের বুকটা টনটন করে উঠল। মেয়ের জন্য নয়, সৌমিকের জন্য। ছেলেটা বড্ড ভাল, একটু বেশি রকমের ভাল। মুনিয়া কখনওই এই ছেলের যোগ্য ছিল না।

পঁচিশ

প্রবীরের ফ্ল্যাটের আবহ বদলে গেছে অনেকটাই।

নিরানন্দ ঝিমন্ত পুরীতে এখন এক আলগা স্বস্তির আমেজ। হঠাৎ বুড়িয়ে যাওয়া প্রবীর যেন বেশ চনমনে হয়ে উঠেছে আবার। অফিস থেকে ফিরে সে আর ধোঁকে না, পুরনো মেজাজে গমগম হাসছে, রসিকতা জুড়ছে, উৎপটাং গল্প আড্ডা চলছে মেয়ের সঙ্গে। মণিদীপাও আর তিরিক্ষে হচ্ছে না কথায় কথায়। কত কী যে রান্না করছে রোজ! এই হয়তো মেয়ের জন্য স্যুপ বানাল, এই মেটেচচ্চড়ি, পিৎজা, কিংবা ভেটকি মাছের

পাতুরি...। মেয়ের শরীর এখন ভারী দুর্বল, প্রোটিনে ভিটামিনে তাকে চাঙ্গা করে তুলতে হবে। বাচ্চা হওয়ার ধকল বলে কথা। যত্নআত্তিও করছে বটে মেয়ের, সামান্য জলটুকুও গড়িয়ে খেতে হচ্ছে না দয়িতাকে। বুম্‌বাও আবার স্বমূর্তিতে বিকশিত। তার কণ্ঠ একেবারেই বেসুরো, তবু আগের মতো যখন তখন গান ধরছে হেঁড়ে গলায়, মোড়ের ফুচকাওলার কাছ থেকে দিদির জন্য আলুকাবলি কিনে আনছে, চুড়মুড় কিনে আনছে...।

নিছক স্বস্তি নয়, বাড়িতে যেন এখন বেশি সুখী সুখী পরিবেশ।

শুধু দয়িতাই যে কেন মন থেকে আহ্লাদিত হতে পারছে না? কেন যেন মনে হয় তাকে ঘিরে একটা সাজানো নাটক অভিনীত হয়ে চলেছে। রাতে খাবার টেবিলে বসে প্রবীর যখন দয়িতার ছোটবেলার কোনও গল্প বলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে, দয়িতার তখন বড় কান্না পায়। বাবা এত চড়া পর্দায় অভিনয় করে কেন? মণিদীপা যখন অনাগত সন্তানের দোহাই দিয়ে দয়িতাকে জোর করে খাওয়ায়, তখন কি তার মুখে একটা চোরা বিষাদ খেলা করে না? দয়িতার মুখ চেয়ে এক অবাঞ্ছিত শিশুর আগমনকে মেনে নিয়েছে মা, দয়িতা জানে। বুম্‌বা যখন হাসতে হাসতে দিদির ঘরে ঢোকে, দয়িতা স্পষ্ট টের পায় দরজার ওপারেও বুম্‌বার মুখ গোমড়া ছিল।

দয়িতা যেখানে নেই, কেন যে সেখানে নিচু গলায় কথা বলে বাড়ির লোক!

রিটার্ন অফ দা প্রডিগাল ডটার! বিপথগামী কন্যার প্রত্যাবর্তনের উৎসবের পরিবেশ বুঝি এরকমই হয়!

কী অসহ্য গ্লানি! যদি বাবা সব সময়ে মুহ্যমান থাকত, মা কথা বলতে বলতে চোখের জল ফেলত, বুম্‌বা টেরচা চোখে তাকাত দিদির দিকে, তা হলে হয়তো দয়িতার এমনটা লাগত না। কেন সবাই এত মধুর ব্যবহার করবে তার সঙ্গে? কোন মহৎ কাজ করে এসেছে সে? বোধিসত্ত্বকে ছেড়ে কেন চলে এল দয়িতা সে প্রশ্নটা পর্যন্ত কেউ করল না একবার!

এরই মাঝে টুকটাক আত্মীয়স্বজনের আনাগোনা। এই তো গত রোববার মাসি আর টুনটুনি, সারাটা দিন এ বাড়িতে কাটিয়ে গেল। নিজের আসন্ন বিয়ে নিয়ে কত অজস্র রকম বকবকম করল টুনটুনি, কিন্তু ভুলেও বোধিসত্ত্বর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করল না। পরশু হঠাৎ পিসি পিসেমশায়ের আবির্ভাব। দুজনেই এমন স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে কথা বলছিল যেন দয়িতা মাস কয়েকের জন্য কোথাও বেড়াতে গিয়েছিল, এই ফিরল। দয়িতার পেটের বাচ্চাটা সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছে, অথচ বাচ্চাটা যে কোথ্‌থেকে এল তা নিয়ে কণামাত্র কৌতূহল নেই!

কী নিষ্ঠুর ঠাট্টা! কী শীতল রসিকতা!

যেদিন তাকে গাইনির কাছে নিয়ে গেল বাবা-মা দয়িতা নিজের নাম দয়িতা মিত্র লিখল, টুঁ শব্দটি করল না বাবা। ভাবটা এমন, যে আসছে সে মিত্র পদবিতেই পরিচিত হবে, এটাই স্বতঃসিদ্ধ।

সবাই মিলে দয়িতার জীবন থেকে মাঝের ছটা মাসকে কি মুছে ফেলতে চায়? মোহ কেটে গেছে দয়িতার, এতেই সবাই উৎফুল্ল?

কিন্তু তা কী হয়?

সময় কি জলের দাগ, এমনি এমনি মিলিয়ে যাবে?

বড় অপমান! বড় অপমান! সে একটা ভুল করেছিল বলে সবাই তাকে দয়া করছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষমাঘেন্না করে নিচ্ছে! তার ভবিষ্যত জীবনটা কেমন হতে চলেছে তাও হয়তো অনুমান করে নিয়েছে সকলে! বাচ্চা হওয়ার পর হয় ঢেঁসকুমড়ো হয়ে বাড়িতে বসে থাকবে দয়িতা, নয়তো একটা চাকরি বাকরি জোটাবে, তারপর বাচ্চা নিয়ে স্বামী পরিত্যক্তা নারীর মতন বাপের বাড়িতে আশ্রিতা আশ্রিতা ভঙ্গিতে কাটিয়ে দেবে বাকিটা জীবন! কিন্তু লোকজনের চোখ থেকে সহানুভূতির ছায়াটা মুছবে না। দুঃখী দুঃখী চোখে তারা দেখবে দয়িতাকে, আর প্রায় দয়িতার সামনেই কানাকানি করবে, আহা রে অত গুণী মেয়েটার জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল!

ভাবতেই বিবমিষা। দয়িতা তো কিছুতেই ফিরতে চায়নি এখানে, কেন তাকে জোর করে আনা হল? সেদিন তার ডেরায় গিয়ে মা অমন হাউমাউ করে সিন ক্রিয়েট করল বলেই না দয়িতা নিজের মান বাঁচাতে...

ভাল্লাগছে না দয়িতার, কিচ্ছু ভাল লাগছে না। ওই শয়তান ছেলেটাই যত নষ্টের মূল। কেন যে দয়িতা বিশ্বাস করেছিল সৌমিককে। মনে রাখা উচিত ছিল এই সেই ট্রেটার যে মেলার মাঠে তাকে কথা দিয়েছিল বিয়েটা ভেঙে দেবে, অথচ পরদিনই ল্যা ল্যা করে...। একটা ঘর খুঁজে দেওয়ার তোর মুরোদ নেই, দয়িতাকে তুই ফাঁসিয়ে দিলি! এখন আবার গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে! মা আবার মাঝে মাঝে তাঁকে ফোন করে অফিসে, দুপুরের দিকে, দয়িতা স্বকর্ণে শুনেছে। আমন্ত্রণ পেয়েও এ বাড়ির ছায়া মাড়াচ্ছে না, এত ভয়!

ভাবলেই দয়িতার গা রি রি করে ওঠে। কী রইল আর তার জীবনে? প্রথম প্রথম এখানে এসে চাকরিতে বেরিয়েছিল কয়েক দিন, বাবা মাও বাধা দেয়নি, কিন্তু শরীরটাই এমন বেইমানি শুরু করল। বিশ্রী জ্বর-সর্দি-কাশি, যখন তখন মাথা টলে চোখ অন্ধকার, এই অবস্থায় বাইরে বেরোনো যে কী দুঃসাধ্য! তার তো আর বসে বসে চাকরি নয়, ছোটাছুটি না করতে পারলে অফিসই বা তাকে ছেড়ে কথা বলবে কেন! পাঁচ মাস পর তার বাচ্চা হবে বলে কোম্পানি তো আর ব্যবসা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। একেই তো অফিসে মেয়েদের দেড়া কাজ করতে হয়, প্রতি পলে পুরুষদের সমকক্ষ বলে প্রতিপন্ন করতে হয় নিজেদের...।

অগত্যা আপাতত চাকরিকেও টা টা। কী বিচ্ছিরি বর্ণহীন দিন যে কাটছে এখন! শুধু বিশ্রাম বিশ্রাম বিশ্রাম, অন্তহীন বিশ্রাম। বাড়িতে জবুথবু হয়ে শুয়ে বসে থাকা। বুকের মধ্যে মেঘ ছেয়ে থাকে সর্বক্ষণ। এ ভাবেই যদি দিন কাটবে, তা হলে বোধিসত্ত্বকে ছেড়ে সে চলে এল কেন? বোধিসত্ত্বও তো এইটুকুই চেয়েছিল, চাকরি বাকরি না করে সে বাড়িতে থাকুক। অবশ্য শুধু তার চাকরি করা নয়, বোধিসত্ত্ব তার বাচ্চাটাকেও চায়নি। ভ্রূণটা নষ্ট করে দিলেই বা কী এমন ক্ষতি বৃদ্ধি হত পৃথিবীর? বোধিসত্ত্ব যে ভাবে চেয়েছিল, সে ভাবে থাকলেই তো সব ল্যাটা চুকে যেত।

সত্যি কি ল্যাটা চুকত? অস্তিত্বহীন আত্মসমর্পণকে কি বেঁচে থাকা বলে? তার যে একটা স্বাধীন সত্তা আছে, সেটাই তো বোধিসত্ত্ব মেনে নিতে পারছিল না। কী নির্দয় মানুষ, কেমন মুখের ওপর বলে দিল এবার কেটে পড়ো। তারপর একবার দয়িতার খোঁজ পর্যন্ত করল না! দয়িতা কোথায় গেল, কেমন আছে, তাও জানতে ইচ্ছে করল না বোধিসত্ত্বর। দয়িতা যেদিন সল্টলেকে জামাকাপড় আনতে গেল, কী ভীষণ পাথরের মতো মুখ করে বসে ছিল। দয়িতার ওপর সামান্যতম টান থাকলেও তো তাকে সেদিন আটকাত বোধিসত্ত্ব, যা হয়েছে সব ভুলে গিয়ে আবার তাকে থেকে যেতে বলত, নয় কি?

দয়িতা বিদেয় হতে বোধিসত্ত্ব যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। এত রিলিভড্ যে সল্টলেকের ফ্ল্যাট ছেড়ে লাফাতে লাফাতে নিজের বাড়ি ফিরে গেল। অথচ ওই লোকটার জন্য হঠাৎ খুব মন কেমন করছিল বলেই না দয়িতা বোকার মতো আবার একদিন অফিসফেরতা ছুটে গিয়েছিল সল্টলেকে! কী দেখল? ইয়া বড় তালা ঝুলছে। নামার সময়ে উলটো ফ্ল্যাটের মিসেস সাহার মুখোমুখি। তিনি রসালো চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শুনিয়ে দিলেন লটবহর সমেত কবেই নাকি স্বগৃহে চলে গেছেন প্রফেসার সাহেব। কে জানে, অ্যাদ্দিনে হয়তো রাখীর সঙ্গে মিলমিশ হয়ে গেছে! স্ত্রী পুত্র নিয়ে আবার সুখে ঘরসংসার করছেন প্রফেসার বোধিসত্ত্ব মজুমদার!

এই মুহূর্তে ওই বোধিসত্ত্বর জন্য দয়িতার হৃদয়ে কী অনুভূতি থাকা উচিত?

বিরাগ? উপেক্ষা? অবিমিশ্র ঘৃণা?

কিন্তু কোনওটাই যে আর আসে না। চোখ বুজলেই ভেসে ওঠে এক ধূসর ছবি। ক্যাম্পাস টাউনের কুয়াশামাখা পথ বেয়ে লম্বা লম্বা পায়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে এক দীর্ঘকায় পুরুষ, লোহার গেট খুলে একটা বাড়িতে ঢুকে গেল, পিছন পিছন নিঃশব্দে আসা একটি তৃষ্ণার্ত মেয়ের দিকে ক্ষণিকের জন্যও ফিরে তাকাল না।...

কী নিষ্ঠুর যে ওই চলে যাওয়া! নিষ্ঠুর? না নিরাসক্ত? কী অবলীলায় দয়িতার মাধ্যাকর্ষণ ছিন্ন করে ঘটনাদিগন্তের ওপারে মিলিয়ে গেল বোধিসত্ত্ব, বুঝি এক কৃষ্ণগহ্বরে। দয়িতার মহাবিশ্বে বোধিসত্ত্বর বিকিরণ আর পৌঁছবে না কোনওদিন।

ওফ্, কেন যে ছবিটা দেখে দয়িতা!

তবে বুঝি ওই ছবিটাই শুধু সত্যি ছিল। বাকি সবটাই স্বপ্ন। কিংবা কাল্পনিক সময়ে ঘটা অলীক ঘটনা!

কেন যে দয়িতা বোধিসত্ত্বর মতো স্মৃতিহীন হতে পারে না।

ছাব্বিশ

মেঘলা বিকেলের মরে আসা আলোয় সৌমিককে দেখতে পেল দয়িতা। জানলা থেকে।

এ বছর আষাঢ় মাসেই জোর কদমে বর্ষা এসে গেছে। মেঘেদের অন্তহীন পল্টন ছেয়ে ফেলেছে শহরের আকাশ। সূর্যদেব প্রায় পাকাপাকিভাবেই ফেরার। জলদগম্ভীর তূর্যধ্বনি বাজছে দিনভর, অস্ত্রের ঝঙ্কারও শোনা যায় ঘন ঘন। রুপোলি বিদ্যুতের আঘাতে আকাশ ফালা ফালা, তার ক্ষতবিক্ষত দেহ থেকে অবিরাম ঝরে যায় অশ্রুকণা। কখনও টিপটিপ, কখনও বা মুষলধারায়।

আজও সকাল থেকে আকাশ একেবারে স্লেটবরণ। বিকেল হতে না হতেই দিনের আলো নিভু নিভু, এই বুঝি আঁধার ঝাঁপিয়ে এল। একটানা অনেকক্ষণ কেঁদে আকাশ চোখ মুছছে এখন, এলোপাথাড়ি ছুটে বেড়াচ্ছে তার ভেজা দীর্ঘশ্বাস।

দয়িতা নিজের ঘরেই ছিল। একা। মণিদীপা টিভি দেখছে, দয়িতা আওয়াজ পাচ্ছিল। টুকরো হাসি, টুকরো গান। দয়িতার হাতে চিকেন স্যুপের বাটি। সঙ্গে দু পিস পাউরুটিও দিয়েছে মণিদীপা, হালকা সেঁকে। পাউরুটি চিবোতে দয়িতার ঘোর অনীহা, তবুও।

চামচে সামান্য একটু স্যুপ তুলে ঠোঁটে ছোঁয়াল দয়িতা। সঙ্গে সঙ্গে মুখ বিকৃত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে। আজকাল বেশ খিদে হয় দয়িতার, কিন্তু জিভে এখনও এতটুকু স্বাদ নেই। বেশি করে নুন গোলমরিচ ছড়িয়ে আনবে? কিংবা সস টস?

বিছানা ছেড়ে নামতে যাবে, পেটে আবার সেই তরঙ্গের ওঠাপড়া। নড়ছে, নড়ছে...। দয়িতা হাত রাখল পেটে। এই তো এখানে নড়ে উঠল, এই তো দুলে দুলে সরে গেল এ পাশে...! কদিন ধরে খুব খলবল করছে। আপনাআপনি চোখ বুজে এল দয়িতার। তারই শরীরের অভ্যন্তরে অঙ্কুরিত হচ্ছে এক প্রাণ, সেই প্রাণ তারই দেহ থেকে সংগ্রহ করছে বেঁচে থাকার রসদ—ভাবনাটাই যে কী অদ্ভুত মাদকতাময়! কী কঠিন মায়ার বাঁধনে যে বেঁধে ফেলেছে দয়িতাকে ওই অদেখা প্রাণ! অনেকক্ষণ না নড়লে চোরা আতঙ্কে বুক কেঁপে ওঠে। একেই কি মাতৃত্ব বলে?

পেটে হাত বোলাল দয়িতা। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল,—কী রে, শুনতে পাচ্ছিস?

স্পষ্ট উত্তর পেল দয়িতা—হুঁউউ।

—কেমন লাগছে ভেতরে?

—দিব্যি আছি।

—দূর বোকা। গুটিয়ে মুটিয়ে জলে ভাসছিস, অন্ধকার, হাওয়া নেই, ওখানে তোর ভাল লাগতেই পারে না।

—উঁহুঁ, আমার বেশ লাগছে। কী সুন্দর জীবন! কোনও চিন্তা নেই, ভাবনা নেই...

—দূর বোকা! বাইরে এলে আরও বেশি ভাল লাগবে।

—কেন?

—কত কী আছে বাইরে। আলো বাতাস পাখি ফুল গাছ...সারাজীবন দেখেও তোর চোখ ভরবে না।

—আর কিছু নেই বুঝি? ঝড় দুর্যোগ দুঃখ যন্ত্রণা কান্না?

—চুপ। আমি আছি না!

আন্দোলন থেমে গেল। ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? ধীরে ধীরে চোখ খুলল দয়িতা। হৃদয়ের প্রতিধ্বনি চিনচিনে কষ্ট হয়ে কোন এক গহীন অন্দরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। মস্তিষ্কের কোষে কোষে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকে পড়ছে এক গাঢ় বিষণ্ণতা। এও কি মাতৃত্ব?

পড়ে থাকা স্যুপের বাটি আর ছুঁয়ে দেখল না দয়িতা। মন্থর পায়ে এসে দাঁড়িয়েছে জানলায়। ওপারে সজল বিকেল, ভিজে রাজপথ বেয়ে সরীসৃপের মতো পিছলে পিছলে যাচ্ছে গাড়িঘোড়া, অতিকায় পোকার মতো নড়াচড়া করছে মানুষ। আকাশ আরও ঘন হয়ে এল। এক্ষুনি আবার বৃষ্টি নামবে কি?

সহসা দয়িতার আনমনা চোখ টানটান। জল কাদা মাখা পথ মাড়িয়ে ছপছপ হেঁটে আসছে কে ও? প্যান্ট হাঁটু পর্যন্ত গুটোনো, হাতে বন্ধ ছাতা। দয়িতাদের বাড়ির সামনে এসে ওপর পানে চাইল একবার। আকাশ দেখল? না জানলায় দাঁড়ানো দয়িতাকে?

দয়িতা স্যাঁত করে সরে এল। মুহূর্তে বিষাদ ছাপিয়ে চাগাড় দিয়েছে ক্রোধ। অ্যাদ্দিনে আসার সাহস হল কেন্নোটার! ঝপাৎ করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল দয়িতা। শুয়ে শুয়েই কানে এল ডোরবেলের আওয়াজ, মার উচ্ছ্বাসধ্বনি। সৌমিক কী যেন বলল মাকে, মার স্বর খাদে নেমে গেল। আর কিছু শোনা যায় না, বাতাসে থমথমে নৈঃশব্দ্য।

ঈষৎ অসহিষ্ণু হয়েই দেয়ালের দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছে দয়িতা, দরজায় সৌমিক।

ভেতরে আসার অনুমতি নিল না, গটগটিয়ে বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল,—ম্যাডামের এখন শরীর কেমন?

দয়িতা মুখ ঘুরিয়ে নিল। আগুন চোখে দেয়াল দেখছে।

সৌমিক ফের গলা ঝাড়ল,—শুনলাম খাওয়াদাওয়া নাকি ঠিক মতো করছ না?

এতদিন পর ছেলেটা কি ফাজলামি করতে এসেছে? নাকি মজা দেখতে? খুব কলজের জোর বেড়েছে তো!

দয়িতার হিংস্র চোখ সৌমিকের দিকে ঘুরল। সৌমিকের তাপ-উত্তাপ নেই, হাসি হাসি মুখ,—আজ ওয়েদারটা কী বিশ্রী। অফিস কেটেও চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম তোমাদের এখানে পৌঁছতে পারব কি না। ভাগ্যিস বৃষ্টিটা ধরল।

দয়িতা দাঁতে দাঁত ঘষল। মেনিমুখো ছেলেটার এত বুকের পাটা হল কবে থেকে?

—কথা বলছ না কেন? সৌমিক মৃদুমৃদু হাসছে,—থ্রোট প্রবলেম?

—তুমি কী এমন হরিদাস পাল যে তোমার সঙ্গে কথা বলতে হবে? দয়িতা আর থাকতে না পেরে ঝাং করে উঠে বসেছে।

—আমি তো হরিদাস পাল নই। সৌমিকের চোখে হাসি খেলা করছে,—আমি সৌমিক বসুরায়।

—লিমিট লিমিট। দেয়ার শুড বি লিমিট। রাগে কাঁপছে দয়িতা। উদ্গত চিৎকার কোনওক্রমে সামলে হিসহিসিয়ে উঠল,—আমাকে আবার মুখ দেখাতে তোমার লজ্জা করল না? কেন এসেছ এ বাড়িতে?

—কীসের লজ্জা? সৌমিক কাঁধ ঝাঁকাল,—আর এ বাড়িতে তো আমি আসিই। তুমি যখন ছিলে না, তখনও আসতাম।

—যাদের কাছে আসতে তাদের কাছে যাও। এ ঘরে পা রেখেছ কেন?... বুঝতে পারছ না, আই কান্ট টলারেট ইয়োর প্রেজেন্স, এনি মোর?

দয়িতাকে তবু পাত্তা দিল না সৌমিক। চেয়ার টেনে বসেছে। মুচকি হেসে বলল,—আজ তো আমি অন্য কারুর কাছে আসিনি, তোমার কাছেই এসেছি। টু মিট ইউ।

—কোন আহ্লাদে?

—সে তো তুমিও জানো, আমিও জানি। তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারি না, তাই।

এত সহজে, এমন অবলীলায় কথাটা উচ্চারণ করল সৌমিক, দয়িতা কয়েক মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গেল। সৌমিকের স্বরভঙ্গি এত অকপট, যেন বাতাস দুলে গেল একটু।

দয়িতার রাগের ফণাও যেন নেতিয়ে পড়ছে হঠাৎ। অজান্তেই। মাথা ঝাঁকিয়ে সমে ফেরাল নিজেকে। চোখের কোণ দিয়ে দেখছে সৌমিককে।

হিম হিম গলায় বলল,—আমাকে একটা কথার জবাব দেবে সৌমিক?

—ও, শিওর।

—আমার সঙ্গে তুমি এত বড় শত্রুতাটা করলে কেন?

—শত্রুতা? আমি? তোমার সঙ্গে?

—ন্যাকামি কোরো না। অ্যান্ড ডোন্ট আটার তুমি আমার ভাল চেয়েছিলে...আমার ফিজিকাল কন্ডিশান দেখে তোমার নার্ভাস লাগছিল... ও সব বুলশিট আমি বিশ্বাস করি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কোরো না।

—তুমি কি আমার ওপর প্রতিশোধ নিলে সৌমিক? আমাকে ঘেঁটি ধরে বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে?

—কিসের প্রতিশোধ?

—তোমাকে রিফিউজ করার।

সৌমিকের উজ্জ্বল মুখ পলকের জন্য ম্লান। পলকে হাসিটা ফিরে এসেছে,—আমাকে কি তোমার খুব প্রতিশোধপিপাসু মনে হয়?

—জানি না। বুঝতে পারি না। রিফিউজ করার পরও তুমি আমায় পছন্দ করে বিয়েতে হ্যাঁ বলে দিলে, ক্যাম্পাস টাউনে ছুটলে, সল্টলেক ধাওয়া করলে...কী যে সব মাথায় ভুজুংভাজুং ঢুকিয়ে দিয়ে এলে, আমার সংসারটা আর গড়েই উঠতে পারল না।

সৌমিকের ভুরু কুঁচকে গেল,—তুমি কি তোমার সংসার ভাঙার জন্যও আমাকে অ্যাকিউজ করছ?

—নাহ্। আমাদের মধ্যে ফাঁক তো ছিলই। সেটাই প্রকট হয়েছে। দয়িতা একটুক্ষণ থমকে রইল। তারপর বলল,—কিন্তু আমার এই ক্ষতিটা তুমিই করেছ। তুমিই।

—তোমাকে নিরাপদ ছাদের নীচে এনে দেওয়াটা তোমার ক্ষতি করা?

—জীবনের সব কিছুই কি এত সরল হিসেবে চলে সৌমিক? দয়িতার গলা ধরে এল,—আমার এখানে এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করে না।

—কেন? মাসিমা মেসোমশাই তোমায় পেয়ে কত খুশি হয়েছেন...

—বাজে কথা। আমি এদের একেবারেই পর হয়ে গেছি। সবাই আমাকে খুব যত্নআত্তি করছে, আদর করছে...কিন্তু আমার সুখদুঃখের কথা কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে না। এ যেন হোটেলের সুইটে বাস করা। বাবা-মা আমাকে ভালবাসে না এ কথা বলছি না, কিন্তু আমাদের মাঝখানে একটা দেয়াল উঠে গেছে। একটা অদৃশ্য দেয়াল।

—একটু সময় যেতে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—কী জানি, হয়তো হবে। আবার বিষণ্ণতা দখল নিচ্ছে দয়িতাকে,—আমার আর বাঁচার স্পৃহাটা পর্যন্ত চলে যাচ্ছে, সৌমিক।

—এ সময়ে ও সব কথা ভাবতে নেই দয়িতা। যে আসছে তার কথা ভেবে মনটাকে অন্তত হাসিখুশি রাখো।

—পারছি না যে।

সৌমিক কী যেন ভাবল একটু। তারপর ঝপ করে বলে উঠল,—তা হলে তুমি আমার সঙ্গে চলো।

—কোথায়?

—বা রে, তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম আলাদা একটা ফ্ল্যাট দেখে নিচ্ছি... তোমাকে আমি এক সেকেন্ডের জন্যও মনখারাপ করে থাকতে দেব না, দেখো। সৌমিক বোকা বোকা মুখ করে হাসল,—তা ছাড়া তুমি তো তোমার বাচ্চাকে বোধিসত্ত্বর পরিচয়ে মানুষ করবে না...

—করব নাই তো।

—বাট হি নিডস এ ফাদার। টম ডিক হ্যারি, এনিওয়ান। দয়িতার কথারই পুনরাবৃত্তি করল সৌমিক,—আমি ডিক হতে পারি। সৌমিক ডিক বসুরায়।

—তুমি? দয়িতার চোখ গোল গোল হয়ে গেল,—তুমি কেন হতে যাবে?

—কারণ...কারণ...কারণ...। সৌমিক তোতলাতে তোতলাতে বলে ফেলল,—কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি।

—কিন্তু আমি তো তোমায় ভালবাসি না।

সরল রূঢ় কথাটার অভিঘাতে ক্ষণিকের জন্য নিস্পন্দ সৌমিক। বড় করে শ্বাস টানছে ফুসফুসে। ঘরে শেষ বিকেলের আবছায়া। সৌমিকের মুখেও।

খানিক পরে সৌমিক বলল,—এ আর নতুন কথা কী! আমি জানি তো। তবে তার জন্য আমার কোনও অসুবিধে হবে না।

—মানে?

—একজন ভালবাসলেই কাজ চলে যাবে। তুমি শুধু আমাকে একটু সহ্য করে নিয়ো।

ছেলেমানুষ। মনে মনে বলল দয়িতা।

মুখে বলল,—আমিও বোধিসত্ত্বকে একতরফা ভালবাসতাম সৌমিক। সে সম্পর্ক কিন্তু টেকেনি।

—তুমি বোধিসত্ত্ব নও দয়িতা। তুমি একজন সাধারণ মেয়ে, আমিও একদম সাধারণ ছেলে। এবং সাধারণ বলেই আমরা কেউ কারুর কাছে নগণ্য নই। এটাই আমাদের সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখবে।

কথাটায় যেন এক গভীর সত্য আছে, মনে হল দয়িতার। বৃহৎ মানুষের সব কিছুই বড় মাপের, সেখানে প্রতি পলে নিজের অস্তিত্বের সঙ্কটে ভুগতে হয়। সে বা রাখী কেউই তার ব্যতিক্রম নয়। ছোট ছোট চাওয়া পাওয়া নিয়ে যে জগৎ গড়ে ওঠে, সেই জগৎটাই তো বোধিসত্ত্বর কাছে মূল্যহীন। মান অভিমান হর্ষ বিষাদ—ছোট ছোট সরু সুতোর ফোঁড়ে সংসারের নকশি কাঁথাটা বোনা হয়। এ সত্য বোধিসত্ত্ব জানেই না।

সৌমিক নিচু স্বরে বলল,—কী ভাবছ দয়িতা?

—কিছু না।

তুমি আমায় ভাল না বাসতে পারো, বন্ধু তো ভাবো। কী, ভাবো না? বন্ধুত্বের সুবাদেও তো আমরা এক ছাদের নীচে বাস করতে পারি। মুখে যাই বলো, তুমি জানো আমি মানুষ হিসেবে তেমন শয়তান নই। তোমার বাচ্চার একেবারে অযোগ্য বাবাও আমি হব না।

—দয়া দেখাচ্ছ?

কে কাকে দয়া দেখায়! সৌমিকের বুকটা বুঝি মুচড়ে উঠল। যার মুখের এক চিলতে হাসি দেখার জন্য সে এভারেস্টের চূড়া থেকে বরফ কুড়িয়ে আনতে পারে, সেই কিনা আজ নিজেকে করুণার পাত্রী ভাবে! আহা রে, ভেতর থেকে না জানি কতটা ভেঙেছে দয়িতা।

সৌমিক মাথা নামিয়ে বলল,—আমি অতি দুর্বল মানুষ। তুমি তো জানো, দয়া যে করে তারও কিছু প্রত্যাশা থাকে। নিদেনপক্ষে কৃতজ্ঞতার। সে দিক দিয়ে ভাবতে গেলে সে নিজেও তো দয়ার পাত্র, নয় কি? কিন্তু তোমার কাছে আমার সেই কৃতজ্ঞতাটুকুও চাওয়ার ক্ষমতা নেই।

দয়িতার চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। সৌমিকের স্বর যেন অচেনা অচেনা ঠেকে! বড় দুঃখী দুঃখী!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৌমিক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল,—কেউ জানে না, নান...। আমার ঘাড়ের কাছে একটা বুলডগ অবিরাম ঘাঁউ ঘাঁউ করছে। আজ নয়, সেই ছোটবেলা থেকে। তারই তাড়া খেয়ে আমি ছুটছি, দিবারাত্র ছুটছি। ঘাড় গুঁজে পড়াশুনো করে গেছি, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিশিনি, ভাল চাকরিতে জুতে গেছি, আর্নিং হেল অব আ লট...যে পৃথিবীতে আমি ঘুরে মরছি তার বাইরেও একটা অন্য ভুবন আছে, আমি জানি, চোখ বুজলেই আমি সেই স্বপ্নের পৃথিবীটাকে দেখতে পাই... কিন্তু আমি সে দিকে এক পা এগোতে পারি না... জাস্ট ফর দ্যাট বুলডগ। ইট নেভার স্পেয়ারস মি ফর আ মোমেন্ট। ঘাড় ফেরালেই তার গর্জন আমার বুক হিম করে দেয়। ডোন্ট মাইন্ড, ওই বুলডগটা তোমার প্রফেসার সাহেবের ঘাড়ের কাছেও আছে। সেও একইভাবে গর্জায়, প্রফেসার সাহেবকে তাড়িয়ে বেড়ায়। তফাত একটাই। আমার বুলডগটা ফিট করে দিয়েছে আমার মা, আর প্রফেসার সাহেব নিজেই বুলডগটাকে পুষেছেন। হয়তো এই জন্যই তিনি অসাধারণ। আত্মধিক্কারে সৌমিকের ঠোঁট পলকের জন্য বেঁকে গিয়েছিল, পরক্ষণে প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলে উঠল—বাট দিস ক্যান নট গো অন ফর এভার। এই কদিন ধরে ওই বুলডগটার সঙ্গে আমার যুদ্ধ চলছে। ওই কুত্তাটাকে আমি এবার ভাগাবই।

সৌমিকের চোখের মণি জ্বলছে দপদপ। চেয়ার ছেড়ে বিছানায় এসে বসল। দয়িতার নিরাভরণ হাত কোলের ওপর জড়ো হয়ে আছে, ঝুঁকে দয়িতার একটা হাত ছুঁল সৌমিক।

অধীর স্বরে বলল,—কিন্তু তুমি না পাশে থাকলে আমি যে কিছুতেই লড়াইটা জিততে পারব না দয়িতা। আই নিড ইউ। আই নিড ইউ ভেরি ব্যাডলি।

পুরুষের কণ্ঠে এমন তীব্র আকুতি দয়িতা আগে কখনও শোনেনি। হঠাৎই কেন যে শীত শীত করছে? বাষ্প জমছে চোখে, অজান্তেই।

হাতে চাপ বাড়ছে ক্রমশ। সৌমিকের স্পর্শ চারিয়ে যেতে চাইছে দয়িতার গভীরে। সামনে কৃতাঞ্জলিপুটে এক প্রার্থী পুরুষ, বাইরের পৃথিবীতে একটা মেঘলা দিন হারিয়ে যাচ্ছে দ্রুত, এলোমেলো নেচে বেড়াচ্ছে আর্দ্র বাতাস—এরা কোন দিকে ঠেলছে দয়িতাকে? গহীন কুয়োর অতলে একটা ঢেউও কি উঠবে না?

সৌমিক গাঢ় স্বরে বলল,—চুপ কেন দয়িতা?

দয়িতা অস্পষ্টভাবে মাথা নাড়ল,—ভাবছি।

—কী ভাবছ?

দয়িতা উত্তর দিল না। আশ্চর্য, এমন মুহূর্তেও বোধিসত্ত্বকে মনে পড়ে! কুয়াশামাখা পথে মিলিয়ে গেল দীর্ঘদেহী পুরুষ, দয়িতার দিকে ফিরেও তাকাল না...।

ওই নিষ্ঠুর লোকটাকে উচিত জবাব একটা দেওয়াই যায়। বোধিসত্ত্ব মজুমদার যে দয়িতার জীবন নষ্ট করতে পারে না, সৌমিককে বিয়ে করে দয়িতা সেটা দেখিয়ে দিতেই পারে। শুধু তাই নয়, বোধিসত্ত্বর সন্তান জীবনভর সৌমিককেই বাবা বলে জানবে, তার জীবনে বোধিসত্ত্বর কোনও অস্তিত্বই থাকবে না, এটা কি বোধিসত্ত্বর অহংকে একটুও আঘাত করবে না? বোধিসত্ত্বর জন্য সৌমিকও কম কষ্ট পায়নি, চাইলে সৌমিকও একটা প্রতিশোধ নিতেই পারে।

ছিঃ, শুধু এইটুকু কারণেই সৌমিকের সঙ্গে জীবন শুরু করবে দয়িতা? ঘর বাঁধবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংসার করবে? এ কি সৌমিককে ঠকানো নয়?

শুধু সৌমিকের জন্য কি তার হৃদয়ে কোনও বিশেষ অনুভূতি নেই? ভালবাসার কি একটাই রং?

সৌমিক ফিসফিস করে বলল,—মুনিয়া, প্লিজ...

দয়িতা চমকে তাকাল। তার চোখের মণি অসম্ভব রকমের নিষ্প্রভ এখন। মুক্তোদানা কখন যেন গড়িয়ে গেছে গাল বেয়ে, চিকচিক করছে জলের রেখা। প্রায় অন্ধকার ঘরে টুকরো আলো এসে পড়েছে একটা, মণিদীপা ড্রয়িংরুমের আলো জ্বেলে দিয়েছে, দয়িতার শ্যামলা মুখে আলো-ছায়ার জাফরি। একটু বুঝি কেঁপেও উঠল দয়িতার ঠোঁট।

ভাঙা ভাঙা গলায় দয়িতা বলল,—আমায় একটু সময় দাও সৌমিক। একটু ভাবি।

—একটু কেন, অনেক ভাবো। সৌমিক নরম করে হাসল,—যত খুশি ভাবো। আমি তো রইলামই।

সৌমিকের শেষ বাক্যটুকু দয়িতার বুকের গভীরে বসে রইল একটুক্ষণ। তারপর ডানা মেলে উড়ে বেড়াতে লাগল ঘরময়। রঙিন প্রজাপতির মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~